বঙ্কিম-সাহিত্য
সমাজ ও সাধনা

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর-ভাষণ]

শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়

ওরিয়েণ্ট লংম্যানস্
বোম্বাই * কলিকাতা * মাদ্রাজ * নয়াদিল্লী

ওরিয়েণ্ট লংম্যানস্ লিমিটেড্
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩|৫ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী-১
নিকল রোড, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই-১
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩
৩৬এ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২
১|২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী-১

প্রথম সংস্করণ ১৯৬৭

দাম—দশ টাকা

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ১৯৬৪ সালের 'বিদ্যাসাগর লেকচারার' নিযুক্ত করিয়া বাংলা সাহিত্যের কোন বিষয় লইয়া পাঁচটি বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। বাংলা সাহিত্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে বংকিম-সাহিত্য, সমাজ ও সাধনা—এই বিষয়টি আমার নিকট একটি বিশেষ কারণে সংগত মনে হয়। সেই কারণটি হইতেছে এই যে, যাঁহারা বংকিম সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত এবং সেই সাহিত্যাদর্শের অনুরাগী, তাঁহারা প্রায় সকলেই জীবনসন্ধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; তাঁহারা কৈশোরে যে-যুগে বংকিমের রচনাবলী পড়িয়াছিলেন তাহার অনুভূতি এখন কেবল ম্লান স্মৃতিমাত্র, তাহার বর্তমান মূল্য হয়ত এখন আর তেমনভাবে তাঁহাদের চোখে পড়ে না। আবার অন্যদিকে যাঁহারা নবীন ও তরুণ, তাঁহাদের নিকট বংকিম সাহিত্য বহুলাংশে অপঠিত ও অপরিচিত। কিন্তু ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশকে জানিতে হইলে বংকিমকে অবশ্যই জানিতে হইবে।

আমার পাঁচটি ভাষণের বিষয় ছিল : সাহিত্যের আলাপ, বংকিম ও বাংলা ভাষা, বংকিম ও বংগসাহিত্য, বংকিমের নারীচরিত্র ও বংকিমের জীবনদর্শন। আমি এই পাঁচটি ভাষণ ১৯৬৫ সনের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৬৬ সনের জানুয়ারী মাস মধ্যে সমাপ্ত করি।

আমি ভাষণের প্রতিটি অধিবেশনে অপ্রত্যাশিত উৎসাহ দেখিতে পাই। শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা এবং অধিবেশনের পূর্বে ও পরে বহু প্রশ্ন ও তাহার আলোচনা আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়াছে যে, বর্তমানে জন-সাধারণের ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বংকিম-সাহিত্য ও বংকিম-জীবন সম্বন্ধে এক নূতন জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। এই জিজ্ঞাসার মূলে আছে দেশের বর্তমান আদর্শ-বিভ্রাট ও আধুনিক জগতের বিভ্রান্তিকারী পরিস্থিতি, যাহার ফলে অসংখ্য নরনারী বিব্রত ও বিপর্যস্ত হইয়া জীবন সম্বন্ধে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম পাঁচটি ভাষণ যখন শেষ হয়, তাহার পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে জানাইলেন যে বহু লোক ও ছাত্র-ছাত্রীরা অনুরোধ করিতেছেন আমি যেন এই বিষয়ের উপর আরও কয়েকটি ভাষণ দিই। আমি স্বীকৃত হইয়া বংকিম সাহিত্য, সমাজ ও সাধনা সম্বন্ধে আরও তিনটি অতিরিক্ত ভাষণ ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে

সমাপ্ত করি। সেই তিনটির বিষয় ছিল—বঙ্কিমের রাজনীতি, বঙ্কিমের সমাজতত্ত্ব এবং বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা।

বর্তমান গ্রন্থ এই সকল ভাষণেরই পরিবর্তিত পরিবর্ধিত রূপ। যাহা ভাষণে বলিবার সময় ছিল না, সেই সব বিষয় পরে ইহাতে আরও বিশদভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 'সাহিত্যের আলাপ' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে এই গ্রন্থ ও গ্রন্থের রচনারীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এই স্থলে ইহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছে—'বিদ্যাসাগর ইন্‌স্টিটিউটের' ট্রাষ্টীদের উৎসাহ ও বদান্যতা, যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিদ্যাসাগর ভাষণ' স্থাপনা সম্ভব করিয়াছে। ইহা দ্বারা তাঁহারা একটি বহুদিনের অভাব মোচন করিয়াছেন। শ্রীসুধীরকুমার বসু মহাশয় ও কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু মহাশয় এই বিদ্যাসাগর ভাষণ প্রবর্তনে অগ্রণী হইয়া সাহিত্য ও শিক্ষাজগতের যথার্থ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ভাষণের বিভিন্ন অধিবেশনে বিশিষ্ট স্বনামধন্য সাহিত্য-রথীরা আসিয়া যোগদান ও সভাপতিত্ব করিয়া আমাকে যে-উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন, তার জন্য তাঁহাদের প্রতি আমি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাই। যাঁহারা এই উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রদ্ধাভাজন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় লোকসভার সভ্য শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় এবং শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী।

আমার আবাল্যসুহৃদ, সাহিত্যরসিক ও বাংলা একাঙ্ক নাটক রচনায় অগ্রগণ্য শ্রীগোপীনাথ নন্দী তাঁহার অমূল্য উপদেশ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়া আমার প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিচয় দিয়াছেন ও আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। স্বর্গত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের সাহিত্য-শিষ্য ও আমার পরম স্নেহাস্পদ সাহিত্যরসিক শ্রীকেশবচন্দ্র সরকার বঙ্কিম সম্বন্ধে আমার সহিত বহু আলোচনা করিয়া এই গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্রের পৌত্র শ্রীযুক্ত চামেলী চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিম-জীবনের বহু দিক নিয়া আমার সহিত আলোচনা করিয়া আমাকে প্রেরণা যোগাইয়াছেন। আমার কর্মসহচর নীরব কর্মী শ্রীঅশোককুমার বসু অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যের সহিত তাঁহার সুন্দর

হস্তাক্ষরে সযত্নে এই গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

যিনি শুধু আমার কথা সাহিত্যের নহে, জীবন সাহিত্যেরও সাথী ও বন্ধু, যিনি তাঁহার এবং আমার জীবনের অদ্বৈত সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, যাহা ভাষার অগোচর সেই আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী গীতা দেবীর নিকট পাইয়াছি ভাব, ভাষা, আদর্শ ও প্রেরণা যাহা আমাকে বঙ্কিম-সাহিত্য ও বঙ্কিমের সাধনা বুঝিবার জন্য নিত্যনূতন উৎসাহ যোগাইয়াছে। তাঁহার বাংলা সাহিত্যে সেবা, অনুরাগ ও নিষ্ঠা আমাকে অনেক সময়ে বিস্মিত করিয়াছে এবং এই গ্রন্থ রচনা ও পরিকল্পনার প্রধান উৎসই তিনি। তিনি অনুগামী, সহগামী ও অগ্রগামী হইয়া আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার কেবলমাত্র ধন্যবাদের সম্পর্ক নহে বলিয়া ইহা ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিব।

যে সকল লেখকের পুস্তক এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে পথ দেখাইয়াছে, এই উপলক্ষে তাঁহাদের সকলের নিকট আমি সবিনয়ে ঋণ স্বীকার করি। গ্রন্থের ভিতর পাদটিকা দিয়া অকারণ গ্রন্থের অবয়ব ভারাক্রান্ত না করিয়া আমার পূর্ববর্তী লেখকগণের ও গ্রন্থসমূহের নাম আধুনিক রীতি অনুযায়ী এই গ্রন্থের শেষে একসঙ্গে দেওয়া হইল। ইতি—

বিনীত
গ্রন্থকার

কলিকাতা
জন্মাষ্ঠমী, ১৩৭৪।

সূচীপত্র

১

॥ সাহিত্যের আলাপ ॥

সাহিত্য উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছি। সে উদ্যানের বিচিত্র পুষ্পের সুরভি ও শোভা উপভোগ করিয়াছি। দেশী বিদেশী অনেক ফুল চোখে পড়িয়াছে। মধুকরের ন্যায় কখন কখন যে মধুপান করি নাই তাহা নহে। তবে সে উদ্যানে যে কোনদিন মালীর কাজ করিতে হইবে তাহা ভাবি নাই। মালীর কাজ শুধু মালাগাঁথা নহে; পুষ্পসৃষ্টি করা। পুষ্পিত কুসুম চয়ন করিয়া মালাগাঁথা একরকম সাহিত্য। আবার ক্ষেত্র ও বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুল ধরান এবং সেই ফুল দিয়া মালাগাঁথা আর একরকম সাহিত্য। ইহাই সত্যিকারের সৃষ্টি ও প্রকৃত সাহিত্য রচনা। ইহা শুধু কথা-সাহিত্য নহে, ভাব-সাহিত্য। সাহিত্য তখন জীবনদর্শন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যখন 'বিদ্যাসাগর ভাষণ' দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন, তখন প্রথমে আমার কর্মব্যস্ততা এবং সময়ের অভাব জানাইলাম। তাহাতে যখন কোন কাজ হইল না, তখন নিজের অক্ষমতার দোহাই দিলাম। কিন্তু তাহাতেও মুক্তি পাইলাম না। আদেশ হইল সাহিত্য সম্বন্ধে বলিতে ও লিখিতে হইবে। সাহিত্য আমার জীবিকা নহে। সাহিত্যের কোন তিলকধারণ করিবার কৃতিত্ব বা সৌভাগ্য আমার হয় নাই। সাহিত্যের কোন যজ্ঞোপবীত আমার কণ্ঠের ভূষণ নহে। সাহিত্য আমার বিশ্রামের শ্রম, শ্রমের বিশ্রাম, সুখের সাথী, দুঃখের ভাগী, সম্পদে ও আপদে আশ্রয়। বঙ্গভারতীর মন্দিরে আমি চিহ্নিত পূজারী নহি। এই অবস্থায়, নিরুপায় হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টিকর্তার শরণাগত হইলাম।

বঙ্কিমের সাহিত্য-মন্দিরে আসিয়া দেখিলাম, দ্বারী অনেক কিন্তু দ্বার নাই। প্রবেশপথ অনেক বন্ধ হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। বঙ্কিমের জন্ম হইতে আজ প্রায় একশত ত্রিশ বৎসর হইতে চলিল। কিন্তু আজো এমন একটি বঙ্কিমস্মৃতি-মন্দির স্থাপিত হইল না যাহাতে বঙ্কিমের সমস্ত গ্রন্থ ও সকল রচনা ও তাহাদের বিভিন্ন সংস্করণ রক্ষিত আছে। বহুবিষয়ে তাঁহার মূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ অপূর্ব পত্রাবলীর আজও কোন ধারাবাহিক ও বিষয়ীভূত সঙ্কলন হইল না। এমন কি যথার্থ নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ ও সমগ্র কোন জীবনী বঙ্কিমের নাই

বলিলেও চলে। যদিও বিচ্ছিন্নভাবে ও ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বঙ্কিমের জীবন, সাহিত্য ও উপন্যাস লইয়া বহুবিধ উল্লেখযোগ্য ও ভাবগ্রাহী আলোচনা হইয়াছে। তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্র-পত্রিকায় বঙ্কিম যে আলোচনা, তর্ক ও বিতর্ক করিয়াছিলেন এবং বঙ্কিম ও বঙ্কিমের সাহিত্য লইয়া যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহারও কোন ধারাবাহিক সংগ্রহ আজিও হয় নাই। বাংলা ও উড়িষ্যার বহুস্থানে বঙ্কিমকে কর্ম উপলক্ষ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। সেই সকল স্থান তাঁহার বহু বিখ্যাত উপন্যাস, রচনা ও সাহিত্য-সমালোচনার স্মৃতির দ্বারা পবিত্র। কিন্তু সেই সকল স্থান ও বাসগৃহকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মৃতি-চিহ্নিত করিবার জন্য আজ অবধি বিশেষ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। কাঁটালপাড়ায় ও দরিয়াপুরে বঙ্কিমের স্মৃতিরক্ষার অল্পবিস্তর আয়োজন হইয়াছে বটে; প্রথমোক্ত স্থানে বাৎসরিক একটি স্মৃতিসভা হয় এবং বঙ্কিমের বাসগৃহটিও রক্ষিত হইয়াছে। দ্বিতীয়োক্ত স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে এবং তথায় প্রতি বৎসর ২৬শে চৈত্র, বঙ্কিমের মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্য করিয়া একটি মেলা হয়। বঙ্কিমের স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান আজ লুপ্ত বা ভগ্ন দেউল। যে বহরমপুরের গঙ্গা দেখিয়া প্রতাপ শৈবালিনীকে বলিয়াছিল 'আয় শৈবালিনী সাঁতার দিই' এবং যে বহরমপুরে বঙ্কিম বঙ্গদর্শন ও প্রথম বঙ্গসাহিত্য সভার সূচনা করিয়া-ছিলেন, বহরমপুরের সেই বঙ্কিম বাসগৃহ আজ লুপ্তপ্রায়। যে গৃহে চুচুড়ার জোড়াঘাটের তীরে বঙ্কিম-ভূদেবের বহু স্মরণীয় বৈঠক হইয়া গিয়াছে এবং যে গৃহে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত মল্লার সুরে গীত হইয়াছিল তাহা আজ কল্যাণরাষ্ট্রের প্রচারগৃহ; সেখানে বর্তমান দিনের রাষ্ট্রনেতাদের কতিপয় চিত্র আছে,—কিন্তু সেই সকল রাষ্ট্রনেতাদের যিনি জনক, জাতীয়তার ও স্বদেশ-প্রেমের যিনি প্রধান ও প্রথম উদ্বোধক সেই ঋষি বঙ্কিমের কোন চিহ্ন, কোন প্রতিকৃতি, কোন নিদর্শনই তথায় নাই। এমন কি সামান্য কোন স্মারক, বা চিত্র পর্যন্ত নাই। যখন এই স্থান পরিদর্শন করিতে যাই তখন মন্তব্য লিখিয়া আসিয়াছিলাম যে, যে-গৃহে ভারতের ও বাংলার ইতিহাস ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন বঙ্কিম রচনা করিয়াছিলেন এবং যে-গৃহে স্বাধীন ভারতের জাতীয় মন্ত্র প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল, সেখানে অন্ততঃ বঙ্কিমের একটি চিত্র থাকা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হইয়াও তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গজননীর ভাষা বাংলার, মর্যাদা, সম্মান, পরিচিতি ও স্বীকৃতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বাংলাভাষা তাহার স্বর্ণসিংহাসন পাইয়াছে, এমন কি সেই বিশ্ববিদ্যালয়েও উল্লেখযোগ্য বঙ্কিমস্মৃতির ব্যবস্থা

নাই। জাতি যখন আজ স্বাধীন ও সচেতন এবং যাঁহারা সেই স্বাধীনতা ও চৈতন্যলাভের জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য যত্নবান, তখন এই আশা অবশ্যই করা যাইতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে যে-বঙ্কিম বর্তমান ভারতের স্রষ্টা, তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির গড়িয়া আমাদের দেশ ও জাতি পূর্বোক্ত কলঙ্ক অপনোদন করিতে যত্নবান হইবে।

যখন জীবন ও ভাষা এক হয়, তখনই জন্ম নেয় প্রকৃত সাহিত্য। সেই সাহিত্যের সূচনা ও স্থাপনা বঙ্কিমের অক্ষয় কীর্তি। সে-সাহিত্য তখন বিশ্ব. প্রকৃতি, ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শন—সকলকে একত্র করে। কিন্তু যখন জীবন ও ভাষায় বিচ্ছেদ আসে, তখন ভাষা হয় শুধু কথা, সে আর সাহিত্য থাকে না। সেই কথা কৃত্রিম। জীবন নৈসর্গিক। জীবনের সহিত ভাষাকে যুক্ত করিয়া, বঙ্কিম শাশ্বত সাহিত্যের রাজপথ খুলিয়া দিয়াছেন, যে রাজপথ দিয়া বর্তমান ভারতের ও বাংলার সমগ্র জীবনধারা ও চিন্তাস্রোত আজ স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রকৃত সাহিত্য যথার্থই জীবনবেদ। সেই বেদের ঋষি হইলেন বঙ্কিম।

সুতরাং বঙ্কিমকে কেবলমাত্র উপন্যাস-লেখক ও কাহিনীকাররূপে আলোচনা করিলে তাঁহার সাহিত্যের মর্ম জানা যাইবে না। আজ দেশের সমগ্র জীবনধারায় ও সমস্ত চিন্তাধরায় বঙ্কিমের প্রভাব বর্তমান। কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি, কি ধর্মনীতি, কি স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তা, কি অর্থনীতি, কি ভারতীয় আদর্শবাদ ও আধ্যাত্মিকতা, সকল ক্ষেত্রে ও সকল স্তরে বঙ্কিমের একচ্ছত্র আধিপত্য। তাই তিনি একাধারে 'ঋষি' ও 'সম্রাট'।

এইসকল কারণে এই গ্রন্থের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র। এই গ্রন্থে বঙ্কিমের পূর্ণ স্বরূপ দর্শনই উদ্দেশ্য। আমার পূর্বগামী বিশিষ্ট স্মরণীয় পথিকবৃন্দ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন এখানে সেই সকল হইতে একটি পৃথক পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, যাহাতে বঙ্কিম-মানসের ও বহুবিধ বিষয়ে বঙ্কিম-সিদ্ধান্তের অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর চিত্র ফুটিয়া ওঠে। ইহা বঙ্কিম জীবনী নহে, যদিও সেই জীবনের ও সময়ের যে সকল বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহার আলোচনা আছে। ইহাতে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যকে মুখ্য করিয়া বঙ্কিমের সহিত সেই ভাষার ও সাহিত্যের সম্বন্ধের বিশ্লেষণ আছে। বহু গ্রন্থে দেখিয়াছি বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্য পদ্ধতি অনুসরণ করা যুক্তিসংগত মনে হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ, কাহিনী গঠন করিবার কৌশল

এবং বঙ্কিমের নারীচরিত্র ও পুরুষচরিত্র পৃথকভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে,—যাহাতে তাহাদের সাদৃশ্য, বৈষম্য ও বৈচিত্র স্পষ্ট হয় তাহাই উদ্দেশ্য। বঙ্কিম-উপন্যাসগুলিকে পৃথক পৃথক উপন্যাসরূপে আলোচনা করিলে, বঙ্কিমের যে-দর্শন, যে-দৃষ্টি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির পশ্চাতে রহিয়াছে তাহার সম্যক রূপ দেখা যায় না। পৃথক পৃথক বৃক্ষের সৌন্দর্য সম্ভার দেখিতে গিয়া অরণ্যের ও বনানীর যে অপূর্ব শোভা তাহা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায়। মানবজীবনের, সমাজের, সংসারের, দেশের, রাষ্ট্রের ও ধর্মের বহুবিধ সমস্যার সিদ্ধান্ত ও সমাধান বঙ্কিমসাহিত্যে পাওয়া যায়। বহু বিদেশী গ্রন্থের ও বিদেশী ভাবধারার ও চিন্তাধারার সহিত বঙ্কিম সুপরিচিত ছিলেন। ভারতীয় প্রতিভা ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি ভাবে সেই ভাব ও চিন্তাধারা দেশের ও সমাজের উপযোগী করিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার পথনির্দেশ বঙ্কিম দিয়া গিয়াছেন। সেই কারণে এই সকল বিবিধ সমস্যার বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ও সমাধানের পৃথকভাবে আলোচনা এই গ্রন্থে হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়সাপেক্ষ ও বিষয়কেন্দ্রিক গবেষণা দ্বারা সাহিত্যের যথার্থ রূপ যেভাবে প্রকাশিত হয় তাহা অনেক সময়ে অন্য উপায়ের দ্বারা সম্ভব হয় না। বঙ্কিম-সাহিত্যের বেলায় এই কথা বিশেষ করিয়া সত্য। বঙ্কিম-সাহিত্যে যে সার্বভৌমিকতা আছে তাহাকে জানিতে হইলে ইহা এক প্রকৃষ্ট উপায়। এই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ে যে বিষয়বস্তুর আলোচনা আছে তাহার প্রত্যেকটির উপর ভবিষ্যতে পৃথক গবেষণা হইতে পারে, ইহা আশা করা যায়। প্রতিটি অধ্যায় এমনভাবে লিখিত যে তাহারা স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও যথা-সম্ভব স্বাধীন।

পথের সঙ্গে পথিকের সম্বন্ধ যেমন নিবিড় তেমনি রহস্যময়। পথ আছে কিন্তু পথিক নাই—ইহা সম্ভব। এমন অনেক পথ আছে যাহার আহবান শুনিয়া কোন পথিক আসে নাই। অথবা যাহারা আসিয়াছে তাহারা বিরল। ইহা হয়ত পথের দোষ নহে, পথিকের অনুভূতির অভাব। মানুষের জীবনে ও সাধনায় এমন অনেক পথ আছে যেখানে পথিক বিরল। সাহিত্যেও সেইরূপ পথ আছে। সাহিত্য-সাধনার এইরকম নির্জন পথিকবিরল পথে বঙ্কিম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে আজ তাহা জনপথে পরিণত হইয়াছে। আজ সেই সকল পথ দিয়া সাহিত্যের বহু শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। তবে পথিক আছে অথচ পথ নাই, ইহা সম্ভব নহে। যথার্থ পথিক কখনও পথের অভাব অনুভব করে না। পথ না থাকিলে সে পথ সৃষ্টি করে। পথিক তখন হয়

পথিকৃৎ। বঙ্কিম ছিলেন সেই পথিকৃৎ। যখন তিনি পথ পান নাই, তখন তিনি নূতন পথ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বঙ্কিম সাহিত্যে এইরূপ বহু নবীন পথ রচনা করিয়াছেন। যখন পথিক ও পথ এক হয় তখন জীবন ও সাহিত্য হয় স্বয়ম্ভূ। বঙ্কিম সাহিত্য সেই স্বয়ম্ভূ-সাহিত্য।

সাহিত্যের মূলমন্ত্র স্বাধীনতা। যে সাহিত্য স্বাধীন নহে, তাহা সাহিত্য পদবাচ্য নয়। সাহিত্যের প্রাণ হইল এই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা মনের, বুদ্ধির, ভাবের ও প্রকাশের অবরোধহীন স্বাচ্ছন্দ্য। সৃষ্টির প্রথম ও শেষ বাণী হইল আনন্দ। সাহিত্যের শ্রুত ও অশ্রুত বাণী এই আনন্দ। তাহা সৃজনের আনন্দ। এই আনন্দ আসে স্বাধীনতা হইতে। তাই সাহিত্যকে তাহার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে তাহাকে স্বাধীন থাকিতে হইবে। সাহিত্য কাহারও দাস নহে। সে সকলের প্রভু। প্রকৃত সাহিত্য ব্যক্তির, সংসারের, সমাজের, আচারের, ব্যবহারের, রাষ্ট্রের, সংহতির কাহারও দাসত্ব করে না। আব্রহ্মস্তম্ভ—পর্যন্ত সমস্তই যথার্থ সাহিত্যের অন্তর্গত অথচ সাহিত্য নিজে সব হইতে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। সূত্র যেমন মণিগণকে ধারণ করিয়া তাহাদের আধার হয়, সেইরূপ সাহিত্য সকলের ও সর্ববিষয়ের আধার হইয়া, স্বয়ং নিরাধার ও নির্লিপ্ত। পদ্মপত্র যেমন অঞ্জলি ভরিয়া জলধারণ করিয়াও নিজে সিক্ত হয় না, সাহিত্য তদ্রূপ সকল বিষয়ের ধারক হইয়া নিজে অনাসক্ত থাকে। বঙ্কিম সাহিত্য এই স্বাধীন, স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ। সাহিত্য-জগতে বঙ্কিম তাই নিত্য-নিরঞ্জন।

সাহিত্য সমুদ্রের ন্যায়। একাধারে রত্নাকর ও বিষধর। মন্থনকারী এবং মন্থনের নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে সাহিত্যের অদৃষ্ট। মন্থনকারী সুর হইলে অমৃতলাভ হয়; অসুর হইলে কেবল হলাহল উঠে। সেই কারণে বঙ্কিম যে প্রসিদ্ধ দ্বাদশটি উপদেশ সাহিত্যিকগণকে দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একটি উপদেশ এই ছিল যে, যে-সাহিত্য অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দাপরায়ণ, পর-পীড়ক ও স্বার্থসাধন প্রণোদিত হয়, তাহা পাপবিদ্ধ ও পরিহার্য। সকল বিষয়ের স্বাক্ষর হইল সাহিত্য। মানুষের আশা নিরাশার, তাহার জীবনমৃত্যুর, তাহার দোষগুণের, তাহার অক্ষমতার ও ব্যর্থতার, তাহার মহত্বের ও দৌরাত্ম্যের সাক্ষী এই সাহিত্য। জীবনের পথে এই সাহিত্যই মনুষ্যত্বের ও মানবতার পূর্ণ বাহক। সাহিত্য অনাদি, স্তব্ধ অতীতের বাহন, মুখর বর্তমানের বাহন, অনাগত মূক ভবিষ্যতেরও বাহন। সাহিত্য নীরবতার কথা, মুখরতার কলধ্বনি, গতির চাপল্য, ধ্যানের স্থৈর্য। নীরবতার একটা বিপুল কোলাহল আছে যাহা প্রচ্ছন্ন

কিন্তু প্রকাশের জন্য ব্যাকুল—সাহিত্য তাহাকে প্রকাশ করে। বিপরীতভাবে, সব কলরবের একটা অপ্রকট নীরবতা আছে যাহা সাহিত্য আত্মস্থ করিয়া লয়। ক্ষর ও অক্ষরের এই যে নিয়ত সংঘর্ষ, সাহিত্য তাহার কষ্ঠি-পাথর। সাহিত্যই প্রকৃত কলা এবং সকল কলার শ্রেষ্ঠ কলা। সঙ্গীত, বাদ্য, অঙ্কন, শিল্প, ভাস্কর্য, মানুষের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক যা কিছু কৃষ্টি ও সম্ভাবনা আছে তাহার সকলই সাহিত্যের যোড়শ কলায় প্রতিবিম্বিত। সর্বাধারভূত এই সাহিত্য ধরিত্রীর ন্যায় সর্বংসহা। সকল অত্যাচার সাহিত্য সহ্য করে এবং প্রয়োজন হইলে সকল অত্যাচারকে শাসন করিতে পারে। বঙ্কিমের সাধনায় আছে সাহিত্যের এই পরিপূর্ণ রূপ।

২

॥ দেশ, কাল ও পাত্র ॥

মানুষকে জানিতে হইলে তাহার জীবন, তাহার সমাজ ও তাহার সময়কে জানিতে হয়। বঙ্কিমকে জানিতে হইলে তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই যুগকে জানা একান্ত প্রয়োজন। বাংলা ১২৪৫ হইতে ১৩০০ সাল, ইংরাজী ১৮৩৮ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ, বঙ্কিমের জীবনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও সমস্যাবহুল যুগ। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাল-মন্দ মিশ্রিত সওদাগরী শাসন অস্তমিত হইতেছে, প্রত্যক্ষ ইংরাজ শাসন ও রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের উদয় হইতেছে। স্বাধীনতা হারাইবার লজ্জা ও অপমান, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে সিপাহী বিদ্রোহের ভিতর দিয়া মুমূর্ষু জাতির শেষ প্রতিরোধ, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ, জাতীয় আত্মবিস্মৃতি, সামাজিক ও ধর্মীয় সঙ্কট, কুসংস্কার ও তমসা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দারিদ্র্য ও অর্থ-নৈতিক অবনতি, সাহিত্যে ও ধর্মজিজ্ঞাসায় আত্মচেতনার পুনরুদ্ধারের সাধনা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের আরম্ভ—এই যুগের বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক ইতিহাসের এই সকল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এবং যুগের সেই আবহাওয়া, বঙ্কিমের জীবন, আদর্শ ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। রাষ্ট্রের, সমাজের ও সংসারের যে ছবি বঙ্কিম-সাহিত্যে ও রচনায় দেখা যায় তাহাতে এই প্রভাব সুস্পষ্ট।

বঙ্কিমের সাধনা বুঝিতে হইলে তাহার সমসাময়িক যাঁহারা, তাঁহাদের কথাও কিছু বলিতে হয়। বঙ্কিম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেয়ে আঠার বৎসরের ছোট ছিলেন। বঙ্কিম যে বৎসর কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সেই বৎসর, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেহত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্কিমের প্রতিভার ও সাহিত্য রচনার অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইহাতে কম তৃপ্তি লাভ করেন নাই। সরল, সহজ, বলিষ্ঠ ও শুদ্ধ বাংলা ভাষা, যাহার ভিত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থাপন করিয়াছিলেন, বঙ্কিম তাহার উপর নব নব বিচিত্র সৌধ নির্মাণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন সেই ভিত্তি কত দৃঢ় এবং তাহার সম্ভাবনা কত সুদূরপ্রসারী। এক কথায় বলিতে গেলে, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের আবির্ভাব ও বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের উত্তরসাধক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, বঙ্কিমের তিরোধান। ইহা স্মরণ স্মরণ রাখিতে হইবে যে বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে গদ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। যাহা ছিল তাহা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় ও লেখায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাংলা গদ্য রচনাকে সংস্কৃত ভাষার দাসত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পরেন নাই যদিও সেই মুক্তি-পথের তিনি ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। সেই ইঙ্গিত তিনি পাইয়াছিলেন তাঁহার পূর্বগামী (১) রাম রাম বসু, (২) রাজা রামমোহন রায় এবং (৩) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রচনায়। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রের' আদর্শে ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের ব্যবহারার্থে আরো প্রায় দ্বাদশখানি পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমের জীবনের প্রথমাবস্থায় বাংলা সাহিত্যকে কাব্যসাহিত্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সে যুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁহার সহজ রচনা অনুপ্রাস-যুক্ত, যমকমুখর; হাস্যরসময় ও বিদ্রূপের কবিতা রচনায় তিনি বাংলার সাহিত্যসমাজে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার সমালোচনাও দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার প্রবর্তিত দুইটি পত্রিকা—সংবাদ প্রভাকর ও সাধুরঞ্জন, লোকশিক্ষার ও সাহিত্যচেতনার নবযুগ-প্রভাতের সূচনা করে। কলিকাতা হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী ঐ পত্রিকায় লিখিতেন। বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থায় প্রাথমিক সাহিত্য প্রচেষ্টাও ঐ পত্রিকায় আরম্ভ হয়। তিনি সংবাদ প্রভাকরে প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বর গুপ্তের এই দুই পত্রিকা বহু নবীন যুবা-লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাহিত্যে এক নব প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিল। বঙ্কিমের যে কবিতা ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার স্বাতন্ত্র্য, নতুনত্ব এবং ভাষা ও ভাবের মৌলিকতা দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বুঝিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে বঙ্কিম সাহিত্য-জগতে বহু কিছু সংস্কার ও সৃষ্টি করিবেন। বঙ্কিম প্রতিভার প্রথম স্বীকৃতি আসে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হইতে এবং বঙ্কিমের প্রতি তাঁহার আদেশ এই ছিল যে, তিনি যেন ভাষাকে সহজ ও সরল রাখেন এবং অভিধান-সিদ্ধ কঠিন কঠিন শব্দ ও বাক্য পরিত্যাগ করেন। বঙ্কিমের প্রতি তাঁহার দ্বিতীয় উপদেশ এই ছিল যে, কবিতা ত্যাগ করিয়া বঙ্কিম যেন গদ্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। বঙ্কিম তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যজীবনে ঈশ্বর গুপ্তের এই দুই উপদেশই পালন করিয়াছিলেন।

তদানীন্তন বাংলা কাব্যসাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিব যে মধুসূদন দত্তকেও বঙ্কিমের সমসাময়িক বলা চলে। মধুসূদন বঙ্কিমের চেয়ে ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন এবং বঙ্কিমের যখন ৩৫ বৎসর বয়স তখন মধুসূদনের তিরোধান হয়। মধুসূদন যখন বাংলা পদ্যে প্রাচীন পয়ার ছন্দ হইতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য আবিষ্কার করিতেছেন, যখন 'শর্মিষ্ঠা' ও 'তিলোত্তমাসম্ভব' বাংলা কাব্যজগত আলোকিত করিতেছে, বঙ্কিম তখন বাংলা গদ্যকে নব নব কলেবর দান করিয়া সাহিত্যের সুবর্ণ রাজসিংহাসনে তাহার অক্ষয় প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন।

বঙ্কিমের উপর ঈশ্বরগুপ্তের ও মধুসূদনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন এক নূতন পথের দিশারী। অনেক সমালোচকের মতে ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে মার্জিতরুচির অভাব। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে তখন বাংলা সমাজে ও সাহিত্যে মার্জিতরুচি বিশেষ কোথাও ছিল না। বরং সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, গ্রাম্যভাষা, গ্রাম্যভাব ও মার্জিতরুচির প্রথম সমাবেশ ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়ই পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যে ও সাহিত্যে তিনিই প্রায় সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও তদানীন্তন জাতীয় সমস্যাগুলিকে আলোচনার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়া সাহিত্যের পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে, বাংলা সাহিত্যে পুরাণ কাহিনীই সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল। ঈশ্বরগুপ্ত যে সম্পূর্ণ পুরাতনপন্থী ছিলেন তাহা নহে। তিনি বঙ্কিমের প্রথম অবস্থার সাহিত্যগুরু ছিলেন এবং বঙ্কিমের নিজের কথায়—'যাহা আছে, ঈশ্বরগুপ্ত তাহারই কবি। তিনি বাংলা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাংলা গ্রাম্যদেশের কবি।' এই বাংলার ও ভারতের জাতীয়তার, সমাজের, জীবনের ও সভ্যতার সর্বগ্রাহী দৃষ্টি ও চিত্র, বঙ্কিম-সাহিত্যে উজ্জ্বলতর হইয়া নব নব ভাব, রূপ ও আয়তন ধারণ করিয়াছে। যদিও ঈশ্বরচন্দ্রকে ভারতচন্দ্রের উত্তর সাধক বলা যাইতে পারে, তথাপি ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্যে, ভাবধারায় ও বিষয়বস্তুতে মৌলিকতা আছে, যাহাকে আগামী কালের বাংলা সাহিত্যের পথনির্দেশক বলিলে ভুল হইবে না। শ্রীমধুসূদন দত্ত আনিলেন পশ্চিমের ভাষাশৈলী, ভাব ও ছন্দ এবং তাহাকে এমনি নিজের ভাবে বাংলাভাষার অন্তর্গত করিলেন যে তাহা হইল বাংলাভাষায় এক নূতন সৃষ্টি ও সম্পদ। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীগণের যে বাংলা, সেই বাংলাকে মধুসূদন তাঁহার কাব্যের দ্বারা আকৃষ্ট করিলেন। সেই আকর্ষণ বাংলাভাষাকে এক অভিনব সমৃদ্ধি ও বিপুল সম্ভাবনায় ঐশ্বর্য-

শালী করিয়াছিল। তিনি যেন বাংলার জন্য সমস্ত জগতের সাহিত্য ভাণ্ডার ও ভাবধারা খুলিয়া দিলেন। বাংলার শব্দসম্পদ ছন্দৈশ্বর্য ও আদর্শ আরও বিরাট হইল। ঈশ্বরগুপ্ত ও মধুসূদন দুইজনেই যাহা পুরাতন ও জীর্ণ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দুইজনেই বাংলা সাহিত্যের পরিসরকে কেবলমাত্র ধর্ম ও পুরাণের বিষয় হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই দুইজনের পার্থক্য এই যে ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্য ও ভাব বাংলার নিজস্ব আর মধুসূদনের ছিল ব্যাপক বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টি। মধুসূদনের মৃত্যুতে, ১২৮০ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন—'যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্যগর্বিত ইউরোপীয় আমাদের জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের ভরসা কি? বাঙ্গালার মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।

ঈশ্বরগুপ্ত, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন, এই ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থল হইল বঙ্কিম-সাহিত্য। এই ত্রিধারায় বঙ্কিম-সাহিত্য ও বঙ্কিম-প্রতিভা জন্মলাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গম সাগরসঙ্গম, দূরাদয়শ্চক্রবেষ্টিত, অনন্ত ও দিগন্তবিস্তৃত। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতন একটি তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্মসংকীর্তন করিবার উপযোগী। বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহা বীণাযন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে স্থানীয় গ্রাম্যসুর বাজিত, আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত, ধ্রুবপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিনী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।' একাধারে ভারতের অন্তরাত্মার কবি ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় বঙ্কিমের বীণাযন্ত্রকে পরিপূর্ণ সার্থকতায় ভরিয়া দিয়াছিলেন।

বঙ্কিমযুগের সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বঙ্কিমের চেয়ে প্রায় ২১ বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম মহর্ষির ১১ বৎসর পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যে মহর্ষির বিশিষ্ট স্থান। মহর্ষি স্থাপিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাংলার ধর্মসাহিত্যে ও গদ্যসাহিত্যে নবারুণোদয়। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

ছিলেন স্বনামধন্য অক্ষয়কুমার দত্ত। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং বাংলার তৎকালীন বহু জ্ঞানী, গুণী ও সাহিত্যিক এই সভার সভ্য ছিলেন। তাঁহারা এই পত্রিকার মাধ্যমে তাঁহাদের চিন্তা ও ভাবধারা প্রকাশ করিতেন। বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্থান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইহাই সমাসবিহীন, অনাড়ম্বর, সহজ, অনুপ্রাস বিরল অথচ তেজস্বী আধুনিক বাংলাগদ্যের আবির্ভাব সূচনা করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বদীপিকায়' 'আত্মচরিতে' এবং 'সেকাল আর একাল' ইত্যাদি গ্রন্থে এই মুক্ত সরল বাংলাভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ডাঃ মনোমোহন ঘোষ তাঁহার 'বাংলাগদ্যের চারযুগ' গ্রন্থে বাংলার দেড়শত বৎসরের ইতিহাসকে চারযুগে ভাগ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম রামমোহন যুগ, ১৮০১-১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ, দ্বিতীয় তত্ত্ববোধিনীর যুগ—১৮৪৩-১৮৭২ খৃষ্টাব্দ, তৃতীয় বঙ্কিম যুগ—১৮৭২-১৮৯২ খৃষ্টাব্দ এবং চতুর্থ রবীন্দ্র যুগ—১৮৯২ খৃঃ হইতে বর্তমানকাল। এই দৃষ্টিতে তিনি রাজা রামমোহন রায়কে বাংলাগদ্যের আদিপ্রবর্তক বলিয়াছেন। তবে বঙ্কিমযুগকে তিনি মাত্র বিশ বৎসর অর্থাৎ ১৮৭২ হইতে ১৮৯২ বলিয়া, সময় সঙ্কীর্ণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহার চেয়ে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'র শ্রাবণ সংখ্যায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার অভিমত আরও বিচার সঙ্গত। সেখানে তিনি লিখিয়াছেন 'বঙ্কিমযুগ আজও শেষ হয় নাই।' বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই কথা বঙ্কিম সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'তিনি যে আমাদের শুধু পথ তৈয়ার করিয়া গেলেন তাহা নয়, চালাবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যের যে রথ তাহা বঙ্কিমেরই রথ। রজ্জু বদলাইয়াছে কালের গতিতে, কিন্তু রথ বদলায় নাই। রথোপবিষ্ট সাহিত্য দেবতারও পরিবর্তন হয় নাই।

এই সময়ে বাংলাদেশে বহুবিধ ভাব ও সভ্যতার ধারা দেখা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীকে বলা যায় বাংলার জাগরণের যুগ। এক যুগ শেষ হওয়ার এবং নূতন যুগ আরম্ভ হওয়ার যে সন্ধিক্ষণ বঙ্কিম সেই মাহেন্দ্রক্ষণের হোতা ও ঋষি। একাধারে তিনি যুগান্তকারী ও যুগপ্রবর্তক। এক যুগের তিনি অন্ত করিয়াছিলেন এবং ভাবী যুগের তিনি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। প্রাচীন, নবীন ও সনাতন, সংস্কার ও সংরক্ষণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য—সর্ব ভাবধারা বঙ্কিম-সাহিত্যে ও মনীষায় সংহত ও একীভূত হইয়াছে। তাই বঙ্কিম-সাহিত্যে একদিকে দেখি বিদ্রোহ, অন্যদিকে দেখি ভারতের সাধনার ও সভ্যতার উপর প্রবল অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও প্রেম। পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতি মোহ আছে, কিন্তু

ভারতের শাশ্বত সাধনার আকর্ষণ প্রবলতর। বহু বিপরীত ধারার একত্র সমন্বয় বঙ্কিম-সাহিত্যে ও বঙ্কিম-জীবনে প্রতিফলিত। এই কারণে, কখনও তাঁহাকে দেখি সমাজসংস্কারক রূপে, কখনও দেখি সংরক্ষণকর্তা রূপে, কখনও দেখি ঐতিহাসিক রূপে, কখনও দেখি ঔপন্যাসিকরূপে, আবার কখনও দেখি সাহিত্যিক ও সমালোচকের বেশে, কখনও দেখি রাষ্ট্রগুরুর আসনে, কখনও দেখি ধর্ম উপদেষ্টার মঞ্চে, আবার কখনও দেখি তাঁহাকে দর্শনের উচ্চশিখরে দার্শনিকরূপে অতীত, বর্তমান ও অনাগত কাল দর্শন করিতেছেন। আবার তাঁহাকে দেখি পত্রিকার সম্পাদকরূপে, সাধারণ গৃহস্থরূপে ও প্রেমিকের বেশে। বহুরূপী বঙ্কিম বহুরূপে প্রতিভাত।

এই বিভিন্নরূপের ভিতর ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত যে বঙ্কিম আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক।

যে-যুগের কথা বলিতেছি সে যুগে বাংলা গদ্যের অবস্থা ছিল শোচনীয়। গদ্যের পুস্তক বাংলায় প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহা সংস্কৃত ভাষার বিলাপ ও প্রলাপ। উপহাস করিয়া তখন বলা হইত যে সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুস্বর ও বিসর্গ বাদ দিয়া যে ভাষা দাঁড়াইত তাহাই ছিল তখন পণ্ডিতী বাংলা গদ্যভাষা। ইহা এত কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিল, যে তাহা পড়িবার জন্য দেশের জনসাধারণের কোন স্পৃহা ও আগ্রহ থাকিত না। এইপ্রকার বাংলা-গদ্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করেন প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়। সেই বিদ্রোহের প্রথম রূপ হইল তখনকার বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। সাধারণ কথোপকথনের ভাষায় যে উপন্যাস লেখা হইতে পারে, ইহাই তাহার প্রথম সার্থক উদাহরণ। প্যারীচাঁদ ছদ্মনামে এই উপন্যাস লিখিয়াছিলেন এবং সেই ছদ্মনাম 'টেকচাঁদ ঠাকুর', বাংলাভাষার ইতিহাসে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। সে বাংলাকে তখন বলা হইত 'টেকচাঁদী ভাষা'। এই টেকচাঁদী ভাষা সাধারণ হালকা লেখা ও হালকা ভাবের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও সাহিত্যের গভীরতা, গাম্ভীর্য ও মাধুর্যের দিক দিয়া তাহা নিতান্ত অপরিণত।

এই সন্ধিক্ষণে বঙ্কিম সৃষ্টি করিলেন এমন এক বাংলা গদ্যসাহিত্য যাহাতে পণ্ডিতী ভাষার প্রাণহীনতা নাই ও যাহাতে টেকচাঁদী ভাষার তরল অমার্জিত রুচিহীনতা নাই। এই অভিনব প্রচেষ্টার জন্য তাঁহাকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্কিমের এই সরল ভাষাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও বঙ্কিমের এই প্রচেষ্টার উপর কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। বঙ্কিম যখন বহরমপুরের অন্যতম হাকিম

তখন শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় অধ্যাপক এবং সেই সময়ে একদিন অপরাহ্নে একত্রে ভ্রমণকালে ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেন যে, বঙ্কিম ভাষাকে সরল ও সহজবোধ্য করিয়া হয়ত ভাষার গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা নষ্ট করিতেছেন। বঙ্কিম তখন তাহার কোন প্রত্যুত্তর করেন নাই। কিন্তু যখন সন্ধ্যা সমাগমে নিজ নিজ বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করিবেন তখন বাজারের কাছে দাঁড়াইয়া বঙ্কিম সহসা তাঁহাকে বলিলেন 'এই বিপণীশ্রেণী আলোকমালায় সুসজ্জিতা হইয়া কি শোভাময়ী হইয়াছে।' গুরুদাসবাবু এই ভাষা প্রয়োগে বিস্মিত হওয়ায় বলিলেন 'এখন বুঝিলেন কিজন্য ভাষা সরল করা প্রয়োজন?'

এই নূতন ভাষায় বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী ১২৭১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়, যাহার শতবার্ষিকী দেশে সম্প্রতি উদযাপিত হইয়াছে। বঙ্কিম তখন ২৬ বৎসরের যুবক, বারুইপুরে হাকিমী করেন। ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া ভারতকে যেমন প্রাণবন্ত করিয়াছিলেন, তেমনি বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী বাংলাভাষাকে নবীন প্রাণসঞ্চার করিয়া তাহাকে সরস, সজীব ও বেগবান করিয়াছিল, যাহার উপতটে আজ বাংলার বহু সম্ভার, সমৃদ্ধি ও সাহিত্যকীর্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ভাষা, ভাব, বিষয় ও কল্পনা বাংলাভাষাকে যে নবরূপ দান করিল তাহার অলোকচ্ছটা আজ এক শতাব্দী পরেও অম্লান। দুর্গেশনন্দিনী যেই বাংলাভাষার রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিল, দেশ সবিস্ময়ে দেখিল কি বিপুল সম্ভাবনা এই ভাষার। দুর্গেশনন্দিনীতে বাংলাভাষা নবযুগের এই নব আদর্শ গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমের হস্তে বাংলা সাহিত্য নবজন্ম লাভ করিল।

বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনার পূর্বে, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। তাঁহার জীবনীলেখার স্থান ইহা নহে। তবে সেই জীবনের ও শিক্ষার প্রধান ধারাগুলি, যাহা তাহার ভাব ও ভাষাকে পুষ্ট করিয়াছিল, তাঁহার সাহিত্যকে জানিতে হইলে তাহা জানা প্রয়োজন। সাহিত্যিকের জীবন ও সেই জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার সাহিত্যের ভিতর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পায়। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে সত্য।

চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত কাঠালপাড়া গ্রামে, বাংলা ১২৪৫ সালে ১৩ই আষাঢ় (ইংরাজী ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ, ২৭শে জুন) রাত্রি নয়টার সময়, মকর-লগ্নে ও সিংহরাশিতে, বঙ্কিমের জন্ম হয়। বাংলা ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র রবিবার (ইংরাজী ৮ই এপ্রিল ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ) অপরাহ্ন তিনটা পঁচিশ মিনিটে

তাঁহার তিরোধান। এই সামান্য ষষ্ঠোত্তর অর্ধশতাব্দী খুবই অল্প আয়ুষ্কাল। কিন্তু ভারতের ও বাংলার জন্যে ইহা অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করিয়াছে। এবং সেই ইতিহাসের প্রধান নায়ক হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমের বংশের আদিপুরুষ 'দক্ষ' ছিলেন অসাধারণ বেদজ্ঞ পণ্ডিত, এবং বঙ্গাধিপতি রাজা আদিশূর আনিত কনৌজের পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম। সেই বংশে দুইজন 'অবসথী' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অবসথী' টোলের বিশিষ্ট অধ্যাপকের উপাধি। এই বংশের রামজীবন ছিলেন পূতচরিত্র, তেজস্বী ও বদান্য। বঙ্কিমের ঊর্ধ্বতন চতুর্থপুরুষ এবং তাঁহারও পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ছিল হুগলী জেলার কোন্নগরের 'দেশমুখো' গ্রামে। বঙ্কিমের প্রপিতামহ রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের সম্পত্তি পাইয়া দেশমুখো হইতে কাটালপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন কাটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে। ইহাই বঙ্কিমের কাটালপাড়ার বসতির ইতিহাস। বঙ্কিম-সাহিত্যে কাটালপাড়ার উল্লেখ ও ইঙ্গিত বহুস্থলে পাওয়া যায়।

যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের পিতা। বঙ্কিম তাঁহার পিতার তৃতীয় পুত্র। বঙ্কিমমাতা দুর্গাদেবী স্বনামধন্য পণ্ডিতপ্রবর ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের কন্যা। বঙ্কিমের মাতামহের হুগলীতে বিরাট চতুষ্পাঠী ছিল, যেখানে তিনি বহু ছাত্রকে ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান করিতেন। পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের সংস্কৃত গ্রন্থের এক বিশাল গ্রন্থাগার ছিল এবং বঙ্কিমের সংস্কৃত ভাষার উপর অনুরাগ দেখিয়া তিনি সেই অমূল্য গ্রন্থসম্পদ বঙ্কিমকে দান করিয়া গিয়াছিলেন।

বঙ্কিমের জন্মবৎসরে, ১৮৩৮ সালে, জানুয়ারী মাসে অল্পবেতনের চাকুরী হইতে, পিতা যাদবচন্দ্র মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের সহিত বঙ্কিমের শৈশবের ও পরবর্তী কর্মজীবনের ঘনিষ্ট পরিচয় হইয়াছিল। এই মেদিনীপুরের ও নিকটবর্তী সমুদ্রের বহু প্রভাব বঙ্কিমের সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

বঙ্কিমের সংসারে ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান ছিল প্রধান অঙ্গ। তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যে, ধর্মসাহিত্যে, সমালোচনায় ও বিভিন্ন রচনায় ইহার চিত্র স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। রাধাবল্লভ ছিলেন বঙ্কিমের গৃহ ও কুলদেবতা। শ্রীশ্রী° বিজয় রাধাবল্লভ জীউ বিগ্রহ রঘুদেব ঘোষাল প্রতিষ্ঠিত করেন। অলৌকিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে আদিষ্ট হইয়া এক সন্ন্যাসী এই বিগ্রহ রঘুদেবের নিকট লইয়া আসেন। এই বিগ্রহ প্রথমে অর্জুনার নিকট এক ক্ষুদ্র চালাঘরে প্রতিষ্ঠিত

হয়। অর্জুনা রঘুদেব ঘোষালের বাড়ীর সংলগ্ন এক বিরাট পুষ্করিনী। তাহার চতুর্দিকস্থ তীর আম্রকাননে সুশোভিত ছিল। অর্জুনার উত্তর দিকে সুন্দর পুষ্পোদ্যান ছিল। বঙ্কিম এই অর্জুনার 'পাড়ে' ও ফুলবাগানে ভিতরে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন। অনেকের মতে ইহারই উল্লেখ আছে বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইলে বারুনী পুষ্করিনী নামে।

এই গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর বঙ্কিমের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। বঙ্কিম বিভিন্ন স্থলে এই রাধাবল্লভের কৃপার কথা ও অলৌকিক ঘটনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ও বিখ্যাত সমালোচক চন্দ্রনাথ বসুকে রাধাবল্লভের উপর তাঁহার বিশ্বাসের বিষয়ে নিম্নলিখিত ভাষায় লিখিয়াছেন—'রাধাবল্লভ আমাদের বংশের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করেন। সমস্ত দুর্গতি নাশ করেন। আমাদের সকল কথা শুনেন, সব আব্দার রক্ষা করেন, রোগে, শোকে, বিপদে আমরা উঁহারই মুখ চাহিয়া থাকি, উঁহাকেই ধরি, উনি আমাদের বড় ভালবাসেন।' বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র সচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'বঙ্কিম জীবনী' গ্রন্থে বঙ্কিম কিভাবে রাধাবল্লভের নিকট সকাতর প্রার্থনা করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যার ও জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রের আরোগ্য সাধন করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। 'নবজীবনের' সম্পাদক চুচুড়ার অক্ষয় সরকারের নিকট বঙ্কিম রাধাবল্লভের অনেক অলৌকিক কাহিনী বলিয়াছিলেন এবং তাহার মধ্যে একটি এই যে বিগ্রহ কখনও কাহারও কাহারও নিকট একই সময়ে দৃশ্য ও অদৃশ্য হইতেন। অক্ষয়বাবু ১৩১৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় বঙ্গ-দর্শনের নবপর্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন।

রাধাবল্লভের প্রভাব শুধু বঙ্কিমের জীবনে নহে, তাঁহার সাহিত্যে দেখা যায়। বিষবৃক্ষের সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র দত্তের ঠাকুর বাড়ীর যে বর্ণনা আছে, নগেন্দ্রের বৈঠকখানা, পূজার দালান ও অন্দর মহলের ছবি, তাহাতে রাধাবল্লভের মন্দিরের ছায়া সুস্পষ্ট। বঙ্কিম রাধাবল্লভের বিভিন্ন সাজ দেখিতে বড় ভালবাসিতেন। এই সমস্ত সাজ ও পরিচ্ছদ তাঁহার মনে এত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে, সত্যভামার তুলাব্রতের সাজের চিত্র তিনি তাঁহার বিষবৃক্ষের নায়িকা সূর্যমুখীর চিত্রগৃহে সন্নিবেশ করিবার লোভ সম্বরন করিতে পারেন নাই। সীতারাম উপন্যাসের লক্ষ্মীনারায়ণ বঙ্কিমের রাধাবল্লভের ছবি। চাঁদশা ফকিরের প্রশ্নের যে উত্তর সীতারাম দিয়াছেন তাহা বঙ্কিমের উত্তর ও বঙ্কিমের রাধাবল্লভে বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয়।

বঙ্কিমের জীবনে ও সংসারে অতীন্দ্রিয় জগতের সহিত পরিচয়ের বহু

সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইন্দ্রিয়াতীত জগতের স্পর্শ বঙ্কিম-সাহিত্যে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার পিতামাতার ও নিজের জীবন এই দিক দিয়া যথার্থই বিস্ময়কর। সে বিস্ময় তাঁহার সাহিত্যেও রেখাপাত করিয়াছে। বঙ্কিমপিতা যাদবচন্দ্র দীর্ঘায়ু ছিলেন। তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়সে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়। যখন যাদবচন্দ্রের ১৮ বৎসর বয়স, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাশীনাথের নিকট যাজপুরে থাকিতেন ও সামান্য চাকুরী করিতেন। সেই সময়ে এক কঠিন কর্ণমূল রোগে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার শবদাহ করিবার জন্য তাঁহাকে বৈতরিণী নদীর তীরস্থিত শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। ঠিক সেই সময়ে অকস্মাৎ এক সাধু কোথা হইতে আসিয়া বলেন যে শবদাহ হইবে না এবং তিনি সেই শবদেহকে প্রাণদান করিবেন। তাহাই হইল। সকলে বিস্মিত। সাধু যাদবচন্দ্রকে দীক্ষা দেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে যাদবচন্দ্রের এক বিখ্যাত প্রথিতযশা পুত্রলাভ হইবে। দীক্ষার সময় সাধুর নিকট হইতে যাদবচন্দ্র দুইটি জিনিস চাহিয়া লইয়াছিলেন—যাহা তিনি তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন; একটি উপবীত ও একজোড়া খড়ম। পুত্রগণ ঐ খড়ম ও উপবীত, চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের তীরের নিকট, যেখানে গঙ্গার জল অতি গভীর, সেখানে পাথর বাঁধিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যাদবচন্দ্র মৃত্যুর পূর্বে সেইরূপ নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে এই মহাপুরুষ যাদবচন্দ্রকে কাটালপাড়ার রাধাবল্লভের মন্দিরের সামনে দর্শন দিয়াছিলেন, প্রথম ঘটনার প্রায় ৭০ বৎসর পরে।

পিতৃজীবনের এই ঘটনার পর, বঙ্কিমের মাতৃজীবনের একটি কাহিনী এই স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহাও এক অলৌকিক ঘটনা। বঙ্কিমের মাতা দুর্গাদেবী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন কাঁটালপাড়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ পূর্ণ শ্রীমণ্ডিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন একদিন সন্ধ্যায় কাঁটালপাড়া গ্রামে এক অপরূপ সুন্দরী নারী ঘাটের কর্মব্যস্ত মহিলাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—যাদবচন্দ্রের বাড়ী কোন পথে। তাহার পরেই তিনি অন্তর্ধান হইলেন। ঘাটের কৌতূহলী মহিলারা যাদববাবুর বাড়ী আসিয়া খোঁজ নিল তিনি আসিয়াছেন কিনা। কিন্তু, বঙ্কিমের মাতা দুর্গাদেবী উত্তর করিলেন যে কোন মহিলাই তাঁহার গৃহে প্রবেশ করেন নাই। গৃহে শঙ্খধ্বনি, ধূপ, ধুনা দেওয়া হইল। আশ্চর্য এই যে, সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার পর হইতে যাদবচন্দ্রের বংশের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল। তাহার ২৫ বৎসর পরে, যখন দুর্গাদেবী স্বর্গলাভ করিলেন, সেইদিন বঙ্কিমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র দেখিলেন যে, এক মহীয়সী

নারী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তখন কেহ বলিতে পারিল না কে সেই মহিলা। ইহার পর সঞ্জীবচন্দ্র স্বপ্ন দেখিলেন ও স্বপ্নে কথা শুনিলেন—'আমি লক্ষ্মী, তোমাদের বাড়ী ত্যাগ করিলাম কারণ এখন তোমাদের বাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়াছে।' যাদবচন্দ্র ইহার তাৎপর্য বুঝিলেন। তিনি লক্ষ্মীর পূজা করিলেন কিন্তু সে গৃহে আর লক্ষ্মী ফিরিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই যাদবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এবং সেই হইতে বংশের সম্মান ও মর্যাদা ক্রমশঃ ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'দি হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে' 'গডেস্ লক্ষ্মী ইন এ হিন্দু হোম'—নাম দিয়া এই কাহিনী জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র শতঞ্জীবের পিতা) লিখিয়াছিলেন।

এইবার বঙ্কিমের নিজের জীবনে অতীন্দ্রিয় জগতের সহিত পরিচয়ের দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করিব। বঙ্কিমের মধ্যমভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র, বর্ধমানে স্পেশাল সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তখন বঙ্কিম প্রায়ই তাঁহার নিকট যাইতেন। সেই সময় বর্ধমানের সব-জজ দিগম্বর বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। এই দিগম্বর বাবুর বাড়ীতে বঙ্কিম স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন এক ব্রাহ্মণের এক অলৌকিক ক্ষমতা, সকল বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করা, উদরস্থ যে কোন জিনিস স্বেচ্ছায় বাহির করা, সন্দেশাদি অলৌকিক ভাবে আনয়ন করা, ইত্যাদি। বঙ্কিমের স্নেহভাজন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বর্ণনা করিয়াছেন যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অল্পবয়সের কন্যাকে এক কর্তাভজা মহিলা কি অলৌকিক ভাবে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তারকেশ্বরের শিবজীর অলৌকিক ক্ষমতায় ও আরোগ্যদানে বিশ্বাসী ছিলেন।

বঙ্কিমজীবনের এই ধারা তাঁহার সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল বলিয়া ইহার আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। বঙ্কিমের নিজের জীবনে বহু ক্ষমতাসম্পন্ন তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধকের সহিত সাক্ষাৎলাভ হয় এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেই অভিজ্ঞতা তাঁহার সাহিত্যের বিষয় ও প্রেরণা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলার কাপালিক ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত।

বঙ্কিম যখন নেগুয়া মহকুমায় কর্ম উপলক্ষ্যে অবস্থিত তখন তাঁহাকে এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই মহকুমা এখন কাঁথী মহকুমা বলিয়া পরিচিত। সেখানে এক সন্ন্যাসী বঙ্কিমের সহিত মধ্যে মধ্যে নিশীথে সাক্ষাৎ করিতে আসিত। যখন তিনি সমুদ্রতীরে 'চাঁদপুরে'র বাংলোতে বাস করিতেছিলেন, তখন আর এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন

গভীর রাত্রে দেখা দিত। চাঁদপুরের অনতিদূরে সমুদ্রতীরে নিবিড় জঙ্গল ছিল। চাঁদপুরে বঙ্কিমের এই কাপালিক দর্শন কপালকুণ্ডলায় রূপ পাইয়াছে।

এই নেগুয়ায় অবস্থিতিকালে বঙ্কিম কাঁথীতে কার্যোপলক্ষে আসিলে নিমকমহলের দেওয়ান জনৈক কৃষ্ণকান্ত রায়ের বাড়ীতে থাকিতেন। সেখানে এক রাত্রে তিনি এক অশরীরী স্ত্রীমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সেই মূর্তি দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ বাড়ীর কৃষ্ণকান্ত নামে দীর্ঘিকার পাড়ে বঙ্কিমকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে নাকি বলিয়াছিল—'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ'—এবং তৎপরে অন্তর্হিত হয়। পরে জানা গিয়াছিল যে ঐ গৃহে এক পুত্রবধূ জলে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। উপরোক্ত কথার প্রতিধ্বনি কপালকুণ্ডলার নবকুমারের প্রতি প্রথম প্রশ্নে পাওয়া যায়। অনেক লেখক এইরূপ মতও প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিমকমহলের দেওয়ান কৃষ্ণকান্তর নাম অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসের নাম 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রাখিয়াছিলেন। তবে, এই শেষোক্ত বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে।

যোগ ও যোগৈশ্বর্য, মন্ত্র ও তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে বঙ্কিম তাঁহার নিজের জীবনে বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে', শ্রীকালীনাথ দত্ত মহাশয়ের যে রচনাটি আছে তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ মিলিবে। বঙ্কিম মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন এবং এমনকি স্বয়ং কয়েকটি বিশিষ্ট মন্ত্রের প্রয়োগ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কালীনাথ বাবু লিখিয়াছেন যে বঙ্কিম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার দুইজন মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তাঁহারা বঙ্কিমের নির্দেশ ও প্রণালীক্রমে ইষ্ট-সাধনা করিতেন। কিন্তু বঙ্কিম স্বয়ং কোন বিশিষ্ট গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত শ্রীঅধরচন্দ্র সেনের শোভাবাজারের বাড়ীতে পরমহংসদেবের সহিত ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে বঙ্কিমের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণ কেন বঙ্কিম? পুরুষ, প্রকৃতি, কামিনী, কাঞ্চন, মুক্তি কি? ভক্তি কি, জ্ঞান কি এবং মানুষের কর্তব্য কি—ইত্যাদি লইয়া বহু আলোচনা ও পরমহংসদেবের সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ বঙ্কিমের হইয়াছিল। পরমহংসদেব বলিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ রাধার জন্য তিন জায়গায় বাঁকা। কোন্ তিন জায়গায় এবং কেন তাহা এই কথোপকথনের ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় নাই। পরমহংসদেব বঙ্কিমকে আরও বলিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুরুষ এবং রাধা তাঁহারই

শক্তি এবং যেমন শক্তি ও শক্তিমান অভেদ, সেইরূপ পুরুষ ও প্রকৃতির যুগল-মূর্তি অভেদ।

পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎ বঙ্কিমের জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা নির্ধারন করা কঠিন, কারণ বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যে ও রচনায় এ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। এই সাক্ষাতের অব্যবহিত পূর্বে, ১২৯১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের 'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হয়। সুতরাং বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্রে' এই কথোপকথনের কোন প্রভাব হয়ত নাই। তবে বঙ্কিমের ১২৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'শ্রীমদ্ভগবতগীতায়' ও ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এই সাক্ষাতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে বলিয়া মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত বঙ্কিমের কথোপকথনের যে ইতিবৃত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রসঙ্গে রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে বঙ্কিম নাকি পরমহংসদেবকে উত্তর দিয়াছিলেন 'আহার নিদ্রা ও মৈথুন'। এই ইতিবৃত্ত কতদূর সঠিক তাহা সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কৃষ্ণচরিত্রের রচয়িতা যে মহাপুরুষকে বলিবেন মানুষের কর্তব্য আহার নিদ্রা ও মৈথুন—তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যে বঙ্কিম ধর্মজিজ্ঞাসায় ও ধর্মসাহিত্যে মানুষের কর্তব্য লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন, তিনি এইরকম উক্তি করিবেন ইহা সম্ভব নহে। গম্ভীর প্রকৃতি বঙ্কিম যে মহাপুরুষের সহিত উপহাসছলে একথা বলিবেন তাহাও যুক্তিসঙ্গত মনে করা ঠিক হইবে না।

বঙ্কিম-সাহিত্যে ও চিন্তাধারায় দৈবে ও দৈবশক্তিতে বিশ্বাস একটি বৈশিষ্ট্য এবং তাহার ভিত্তি বঙ্কিমজীবনের এই সকল ঘটনা ও অভিজ্ঞতা। মৃণালিনীর মাধবাচার্য, দেবী চৌধুরানীর ভবানী পাঠক, দূর্গেশনন্দিনীর অভিরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখরে রামানন্দ স্বামীর শৈবালিনীকে পুনর্জন্মদান, আনন্দমঠের সত্যানন্দ, সীতারামের গঙ্গাধর স্বামী, সন্ন্যাসীর কৃপায় রজনীর অন্ধত্ব মোচন এবং ব্রহ্মচারীর দ্বারা মুমূর্ষু সূর্যমুখীর প্রাণরক্ষা বঙ্কিম-সাহিত্যে এই দৈবশক্তির প্রমাণ ও প্রভাব এবং তাঁহার আধ্যাত্মশক্তির উপর বিশ্বাসের উদাহরণ। বিশেষ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে এই বিরাট অতীন্দ্রিয় শক্তি সমাজে ও সংসারে সক্রিয় এবং তাহা শুধু দার্শনিকের কল্পনামাত্র নহে। এই স্থলে বঙ্কিমের জীবনের আর একটি ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় দুই মাস পূর্বে একদিন রবিবারে সায়াহ্ন ভ্রমণে বহির্গমনে উদ্যত বঙ্কিমের সহিত এক সন্ন্যাসী সহসা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহাকে খুব সম্ভবতঃ তাঁহার

আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন এবং রামপণ্ডিত মহাশয় সমর্থন করিয়াছেন যে এই সন্ন্যাসী যাদবচন্দ্রের গুরুর শিষ্য, এবং যাদবচন্দ্রের গুরু তখনও মানসসরোবরে বর্তমান থাকিয়া তাঁহার শিষ্যকে বিশেষ কিছু বক্তব্য বলিবার জন্য বঙ্কিমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম এই সন্ন্যাসীর সহিত দুই তিন ঘণ্টা রুদ্ধকক্ষে কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর অনুরোধেও তাঁহাকে এই কথার বিষয় প্রকাশ করেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন যে—'আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার পর বলিব।' কিন্তু সেই বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্বেই বঙ্কিম দেহত্যাগ করেন। এই সকল বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রভাব ও অভিজ্ঞতার ফলে বঙ্কিম-সাহিত্যে ও জীবনে এক বিরাট ধর্মজিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল। এইজন্যে ভগবদ্‌বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান, অতীন্দ্রিয় জগৎ, অদৃষ্ট, কর্মফল ও পুরুষকার, এবং ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে তাহার সমন্বয় বঙ্কিমের কথাসাহিত্যের ও ধর্মসাহিত্যের বিষয় হিসাবে গণ্য হইয়াছিল। এমন কি বঙ্কিম নিজে জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহার নিজের জীবনের পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি তাঁহাকে ঐ শাস্ত্রে বিশ্বাসী করিয়াছিল। বিষবৃক্ষের প্রারম্ভে যে স্বপ্নের কথা আছে, তাহাতে যেন কাহিনীর আদ্যোপান্ত ছায়াপাত করিতে দেখা যায়। যেন ঘটনা সব পূর্ব হইতেই ঘটিয়া আছে, মানুষকে তাহার ভিতর দিয়া যাইতে হয় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। চন্দ্রশেখরেও এই অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। রামানন্দ স্বামী জ্যোতিষী ও সাধু ছিলেন এবং তিনি ভবিষ্যত দেখিতেন ও মনুষ্যমনের শাসনকৌশল জানিতেন এবং তাহারই বলে তিনি শৈবলিনীকে বশ করিয়াছিলেন। রজনীর সন্ন্যাসীও সেই একই বার্তা বহন করে।

বঙ্কিমের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে কৈশোর অবস্থা হইতেই তাঁহার সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। কুলপুরোহিত শ্রীবিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের 'হাতে খড়ি' হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমহাশয়, শ্রীরামপ্রাণ সরকারের বাড়ীতে তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১২৫২ বঙ্গাব্দে ইংরাজী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে ইংরাজী স্কুলে বঙ্কিম ভর্তি হন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গে' বঙ্কিমের সহোদর পূর্ণচন্দ্রের উক্তি অনুযায়ী বঙ্কিম পাঠশালায় কখনও পড়েন নাই। ইহা লইয়া মতভেদ আছে। মেদিনীপুর হইতে কাটালপাড়ায় আসিবার পর বঙ্কিম নৈহাটী নিবাসী সদাশিব তর্কপঞ্চাননের নিকট উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই

সহোদর শ্রীনাথ ভট্টাচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতামহ। কাঁটালপাড়ার এক খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট বঙ্কিম পাঠ লইতেন। বাল্যাবস্থায় বঙ্কিম বাংলা কবিতা অতি সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং সেই সকল কবিতা বেশীর ভাগই ঈশ্বরগুপ্ত রচিত। অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাব বঙ্কিমের সাহিত্যে অনুরাগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিয়াছিল। স্বনামধন্য হলধর তর্কচূড়ামণি বঙ্কিমের সংস্কৃত আবৃত্তি শুনিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে মাঝে মাঝে বঙ্কিমের নিকট আসিয়া মহাভারতের কথা, ভারতচন্দ্রের রূপবর্ণনা, ও গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' কবিতা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। হলধর তর্কচূড়ামণি এই সময়ে বঙ্কিমকে বলিয়াছিলেন যে 'শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র'। পরবর্তীকালে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্রে' এই ভাব পরিণতি লাভ করে।

যখন পিতা যাদবচন্দ্র ২৪-পরগনায় বদলি হন, তখন বঙ্কিম ২৮শে অক্টোবর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজে আসিয়া ভর্তি হন। বয়স তখন তাঁহার প্রায় এগার বৎসর। এই এগার বৎসর বয়সে বঙ্কিমের প্রথম বিবাহ হয়, কাঁটালপাড়া হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে নারায়ণপুর গ্রামে, সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বংশের নবকুমার চক্রবর্তীর কন্যা মোহিনীদেবীর সহিত। মোহিনীদেবী তন্বী ও অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশে, এই বালিকা মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমাকে উপলক্ষ্য করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য ও লাবণ্যের যে বর্ণনা বঙ্কিম লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহাতে সেই স্মৃতি সাহিত্যে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। পিতামাতার অনুরোধে ও তাঁহার পরম সুহৃদ দীনবন্ধু মিত্রের চেষ্টায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী, সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। এই সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস বেলাসিক্রী এবং তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন হালিসহরের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে। রাজলক্ষ্মী দেবী দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা ছিলেন এবং তিনি বঙ্কিমের পরবর্তীকালের আজীবন সঙ্গিনী। রাজলক্ষ্মীর চরিত্র বঙ্কিমের সূর্যমুখীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। বঙ্কিমের দাম্পত্যজীবন ও তাহার প্রভাব বঙ্কিম-সাহিত্যে যখন আলোচনা করিব, তখন এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত বর্ণনা দিবার সুযোগ মিলিবে—এই আশা রহিল।

বালক অবস্থায় ছাত্রজীবনেই তিনি সাহিত্যে অনুরাগের পরিচয়

দিয়াছিলেন। প্রথমে বঙ্কিম কবিতা লিখিতেন। ১৩ বৎসর বয়সে সংবাদ প্রভাকরে কবিতা লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় লিখিত কবিতার উদাহরণ তাঁহার পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের কবিতা 'কামিনীর প্রতি উক্তি' 'তোমাতে লো ষড় ঋতু' যাহার জন্য তিনি বিশেষ পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। বঙ্কিম ছাত্রাবস্থায় কবির লড়াইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। 'প্রভাকরে', দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু ও বঙ্কিম পরস্পরকে কবিতায় লেখনীযুদ্ধে আহ্বান করিতেন। ইহা 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' বলিয়া পরিচিত। দ্বারকানাথ দীনবন্ধুকে 'সহুরে কবি' ও বঙ্কিমকে 'চট্টো কবি' বলিতেন, আর দীনবন্ধু দ্বারকানাথকে 'বুনো কবি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বঙ্কিমের জীবন-প্রভাতে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় তাঁহার ইতিহাসে প্রগাঢ় অনুরাগ। এই ইতিহাসে অনুরাগ তাঁহার সাহিত্যে ও রচনায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ছাত্রাবস্থায় ও পরবর্তী জীবনে তিনি ইউরোপীয় ইতিহাস বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় যুগউন্মেষের (Renaissance) ইতিহাস তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। তাঁহার নিজের প্রবল ইচ্ছা ছিল যে বাংলা এবং ভারতের একখন্ড ইতিহাস লেখেন। তাহার নিমিত্ত তিনি একটি সূচীপত্র করিয়াছিলেন এবং নানাবিধ তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এমন কি এই উদ্দেশ্যে তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নাম দিয়া সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি এই ইতিহাস লেখা তাঁহার হইয়া উঠে নাই। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, সীতারাম এবং বিশেষ করিয়া 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয়। এই 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমের পূর্বে, ইতিহাসকে কেহ বাংলা ভাষায় এমনভাবে সাহিত্যের অঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। বঙ্কিমের সহিত ইতিহাসের যে এক স্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল তাহা ইতিপূর্বে বঙ্কিমযুগ বর্ণনায় বলা হইয়াছে। ইংলন্ডের রাজনীতিবিদ্‌গণের পরস্পরের বিরোধ, আফগান যুদ্ধ, শিখ সমর, ফরাসী-প্রাসিয়া যুদ্ধ, ইলবার্ট 'বিল' জাতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁহার জীবদ্দশায় ঘটায় ইহাদের প্রভাবও তাঁহার সাহিত্যে ও রচনায় প্রচ্ছন্ন ও প্রকটভাবে দেখা যায়। বঙ্কিম যখন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। সেই সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে পড়িতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যদ্যপি আনন্দমঠ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত, এবং মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরাজের আগমন ইহাতে উল্লিখিত, তথাপি সিপাহীবিদ্রোহ ও আনন্দমঠে বর্ণিত বিদ্রোহ উভয়েরই লক্ষ্য স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা ও দেশের শৃঙ্খলমোচন।

২৮শে অক্টোবর, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২ই জুলাই, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ অবধি বঙ্কিম হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তথায় অধ্যয়ন করেন। হুগলী কলেজ হইতে তিনি জুনিয়ার ও সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় বৃত্তিসহকারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার অধ্যয়নে নিষ্ঠা ও উদ্দীপনা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বিভিন্ন পুস্তক, গ্রন্থ ও বিষয় পাঠ করিবার তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল এবং বেশীর ভাগ সময়ই তাহাতে কাটাইতেন। তাঁহার এই অধ্যয়নে উৎসাহ ও জ্ঞানপিপাসা তিনি হুগলী কলেজের গ্রন্থাগারে গিয়া মিটাইতেন। ক্রীড়ায় তিনি অনুরক্ত ছিলেন না, ব্যায়ামে তিনি বীতরাগ ছিলেন এবং সন্তরণ জানিতেন না, যাহা তাঁহার সমসাময়িক কাঁটালপাড়ার বালকদের অতি প্রিয় ছিল। ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না। অন্যদিকে আবার তাঁহার অদ্ভূত মানসিক বল ও সাহস ছিল। বঙ্কিম তাঁহার স্বীয় জীবনের অতৃপ্ত বাসনা রচনায় তৃপ্ত করিয়াছিলেন; তাই দেখি তাঁহার সাহিত্যে ও উপন্যাসে ব্যায়ামের ও বাহুবলের প্রশংসা, সন্তরনে উৎসাহ, যেমন, প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরনপটুতা, দুর্গেশ-নন্দিনীতে নিদাঘের ধ্রুবপদ অশ্বারোহীর চিত্র ইত্যাদি।

বঙ্কিমের ছাত্রজীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ। বঙ্কিম ছাত্রাবস্থায় বুঝিয়াছিলেন যে ভারতের বহুযুগের সাধনা, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও অলঙ্কারের ভান্ডার এই সংস্কৃত ভাষা। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য সংস্কার করিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান যে অপরিহার্য তাহা তিনি নিশ্চিত জানিয়া ছাত্রাবস্থা হইতেই নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। হুগলী কলেজে পড়িবার সময় তিনি সংস্কৃত টোলে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে সংস্কৃত পড়েন নাই। ভট্টপল্লীর পন্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে, তিনি কয়েকমাসের মধ্যে ভট্টপল্লীর শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়-বাগীশের টোলে মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি দুরূহ কাব্য-সাহিত্য ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল পন্ডিত প্রবরের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কালীনাথ তর্ক-ভূষণ, ভগবৎচন্দ্র রায় বিশারদ, গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি ও অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন।

বঙ্কিম তাঁহার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাষায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তাঁহার বক্তব্য ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন : 'আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী

কলেজে একটু আধটু শিখেছিলাম ঈশানবাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম না। ক্লাসে কখনও পড়াশুনা ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত।' অথচ ক্লাসে পরীক্ষায় তিনি প্রথম হইতেন। সাহিত্যের দিক দিয়া বঙ্কিমের ছাত্রাবস্থার উল্লেখযোগ্য ঘটনা বঙ্কিমের 'ললিতা তথা মানস'—এই কাব্যরচনা, যাহা প্রথম ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়, যদিও ইহার রচনাকাল তাহারও তিন বৎসর পূর্বে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুলাই হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া বঙ্কিম কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতে ভর্তি হন। তখন তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িবেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে আসার এক বৎসর পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হয় এবং বঙ্কিম প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন বিভাগ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসর তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন উত্তর-পাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, এবং হিন্দু স্কুল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেশচন্দ্র ঘোষ। ইহার পর বৎসর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি.এ পরীক্ষার প্রবর্তন হয় এবং ঐ সালে এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম বি.এ পরীক্ষায় বঙ্কিম ও যদুনাথ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিম প্রথম স্থান এবং যদুনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সংস্কৃত ও বাংলার পরীক্ষক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। ছয়টি বিষয়ের মধ্যে, পাঁচটিতে বঙ্কিম ও যদুনাথ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং তাহার মধ্যে ছিল বাংলা ভাষা। কিন্তু ষষ্ঠ বিষয় ছিল দর্শন, এবং সেই বিষয়ে উভয়ই উত্তীর্ণ হইবার নম্বর হইতে সাত নম্বর কম পাইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাদের উত্তীর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম ও যদুনাথ বি.এ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক। ইতিমধ্যে বি.এ পরীক্ষা দিবার পর, বঙ্কিম পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন এবং ৭ই আগষ্ট ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ অবধি তিনি আইন পড়িয়াছিলেন। যখন তিনি আইনের ছাত্র, তদানীন্তন বাংলার রাজ্যপাল হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমকে ডাকিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম প্রদান করেন। বঙ্কিম পিতার অনুমতি লইয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট ২০ বৎসর বয়সে যশোহর জেলায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া কর্ম আরম্ভ করেন। কর্ম করিতে করিতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বঙ্কিম প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে

আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া বি.এল উপাধি প্রাপ্ত হন। বি.এল পরীক্ষায় বঙ্কিম প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমের সরকারী কর্মজীবন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ ৭ই আগষ্ট হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ অবধি। তাঁহার এই তেত্রিশ বৎসরকাল কর্মজীবনে বঙ্কিম বহু যশ, সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। এই কর্মনিরত অবস্থায়ই বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্য ও উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। কর্ম-জীবনের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যে সুস্পষ্ট। কর্ম উপলক্ষ্যে বহুস্থানের, দেশের ও সমাজের লোকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল। শাসন-বিভাগের নির্দেশে বহু জটিল ও সমস্যাপূর্ণ স্থানে তাঁহাকে কর্মের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। যশোহর হইতে যখন তাঁহাকে কাঁথীতে বদলী করা হয় তখন সেখানে নীলকর ইংরাজদের অত্যাচার চলিতেছে। মনুষ্য হত্যা, গৃহসম্পদ লুণ্ঠন ও অমানুষিক অত্যাচার নীলকরের ইতিহাসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিয়াছে। খুলনায় 'মরেক' ও 'হিলী' নামে দুইজন নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও প্রপীড়ক ইংরাজ নীলকর ব্যবসায়ী বঙ্কিমের নাম শুনিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু সমন জারী করিয়া, তাঁহাদের ধরিয়া আনিয়া, বঙ্কিম তাহাদের কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন। বঙ্কিমের শাসনে খুলনায় নীলকরের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছিল। বাংলা ও উড়িষ্যার বিভিন্ন যে সকল স্থানে কর্ম উপলক্ষে তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—যশোহর (১৮৫৮), নেগুয়া, মেদিনীপুর (১৮৬০ ও ১৮৮৭) খুলনা (১৮৬০), বারুইপুর (১৮৬৪), ডায়মণ্ডহারবার (১৮৬৪, ১৮৬৬), মুর্শিদাবাদ (১৮৬৭), বহরম-পুর (১৮৭১), বারাসত (১৮৭৪), মালদহ (১৮৭৪), হুগলী (১৮৭৪), বর্ধমান (১৮৭৯-৮০), হাবড়া (১৮৮১, ১৮৮৩ ও ১৮৮৬), কলিকাতা (১৮৮১), আলীপুর (১৮৮২ ও ১৮৮৮), জাজপুর, কটক (১৮৮২), ঝিনাইদহ (১৮৮৫) ও ভদ্রক, কটক (১৮৮৬)। এই সকল স্থানের সহিত বঙ্কিমের জীবনের ও সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এই সকল বিভিন্ন স্থানে তিনি তাঁহার উপন্যাস ও রচনাসমূহ একে একে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এই সকল স্থলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি, ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক বিশিষ্টতা তাঁহার উপন্যাসে ও রচনায় রূপায়িত হইয়াছে। প্রাকৃতিক শোভা ও সৌন্দর্য বর্ণনা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে বঙ্কিম-সাহিত্যে ও উপন্যাসে বহরমপুরের বর্ণনা, মেদিনীপুরের বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা, কাঁটালপাড়ার বৈশিষ্ট্য, ডায়মণ্ড-হারবার, মুর্শিদাবাদ এবং অন্যান্য জায়গার আলেখ্য। ইহা আশা করা অসঙ্গত

হইবে না যে ভবিষ্যতে এই বিষয় লইয়া বঙ্গসাহিত্যে গবেষণামূলক আলোচনা হইবে।

বঙ্কিমের কর্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত নাই বলিলেই চলে। তাঁহার বারুইপুর ও আলীপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার সহকর্মী কালীনাথ দত্ত 'প্রদীপ' পত্রিকার সমসাময়িক সংখ্যায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে' বঙ্কিমের কর্মজীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 'আমার দেখা লোক' পুস্তকে বঙ্কিমের কর্মজীবনের কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমের ঊর্ধ্বতন ইংরাজ কর্মচারী সি. ই. বাকল্যাণ্ড তাঁহার পুস্তকে 'বেঙ্গল আণ্ডার লেফটেনেণ্ট গবর্নরস্' ১০৭৪-৭৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :

By 1885 he had risen to the first grade in the Subordinate Executive (now the Provincial) Service and for sometime acted as Secretary to the Government of Bengal. He rendered good service in a number of districts and also acted as the Personal Assistant to the Commissioner of Rajsahi and Burdwan Divisions. In June 1867, he was Secretary to a Commission appointed by the Government for the revision of the Salaries of ministerial officers. While in charge of Khulna Sub-Division he helped very largely in suppressing river dacoities and establishing peace and order in the Eastern Canals.

বঙ্কিম কর্মজীবনে নির্ভীক, ন্যায়নিষ্ঠ ও স্বাধীনচেতা হাকিম ছিলেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে কখনও কোন সরকারী ব্যাপারে অন্যায় প্রশ্রয় দেন নাই। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীও কোন অন্যায় করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। ইহার ফলে কর্মস্থলে অনেক ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত ঘোর বিবাদ হইয়াছিল এবং ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এই বিষয়ে দুই-একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনচিত্ত পরিলক্ষিত হইবে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্কিম হাবড়ায় ছিলেন তখন একটি 'বিচার' লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট বাকল্যাণ্ডের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। পুনরায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী বঙ্কিম হাবড়ায় বদলি হন এবং সেখানে আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েস্টমেক্ট সাহেবের সহিত তাঁহার ঘোরতর মতবিরোধ দেখা

দেয়। এই বিরোধের ফলে হয়ত বঙ্কিমকে তাঁহার চাকুরী ছাড়িতে হইত কিন্তু ওয়েষ্টমেক্ট বদলী হইয়া যাওয়ায়, তাহা হয় নাই। এই সময়ে বঙ্কিম চাকুরীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যখন বঙ্কিম হাবড়ায় কর্ম করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিত' রচনা করেন এবং সেই রচনায় তাঁহার তখনকার মনোভাব ও চাকুরী জীবনের দুঃসহ অভিশাপ জ্বলন্ত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

ইহারও পূর্বে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, বঙ্কিম যখন বহরমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ওখানকার ক্যাণ্টনমেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বহরমপুরে ও সারা দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই ও ১৫ই জানুয়ারী তারিখের "অমৃত-বাজার" পত্রিকায় এই ঘটনার নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল :

We are grieved to learn from Moorshidabad Patrika that Babu Bankim Chandra Chatterjee, the Dy. Magistrate, while returning home from office on the 15th December last, was assulted by one Lt. Col. Duffin of the Berhampore Cantonment and received several violent pushes in his hands. It appears that the Babu was passing in a "Palkee" across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great "Beadabee" on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The Patrika says that the Babu has brought a criminal case against his aggressor, and it has caused, as it ought, a great sensation in Berhampore.

—8th January, 1874.

It appears that the Colonel and the Babu were perfect strangers to each other and he did not know who he was, when he affronted him. On being informed afterwards of the position of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and a desire to apologise. The apology was made in due form in open Court where about a thousand spectators, native and European, were assembled.

—15th January, 1874.

বঙ্কিম কর্মজীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। তিনি বহুবার তাঁহার এই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, চাকুরী তাঁহার জীবনের অভিসম্পাত। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচিত্ত সাহিত্যিকের পক্ষে দাসত্ব অসহ্য মনে হইত। আনন্দমঠের স্রষ্টার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। এই বিরক্তি ও ব্যর্থতার ভাব কমলাকান্তের দপ্তরে ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমের চরিত্রের ও মনের তেজস্বিতার সহিত কর্ম ও চাকুরী জীবনের সংকীর্ণতার পদে-পদে সংঘর্ষ হইত। আলীপুরে কর্ম করিবার সময় সরকারের সহিত তাঁহার গভীর মনোমালিন্য হয় এবং সময়ের দুই বৎসর পূর্বেই বঙ্কিম চাকুরী হইতে ৫৩ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। পুলিশের লোক বঙ্কিমকে এমনই ভয় করিত যে সহজে তাঁহার এজলাসে মামলা মোকদ্দমা চাহিত না। সরকারী মহলে ও কর্মক্ষেত্রে বঙ্কিমের ইংরেজী লেখার খুব সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল। নথী-পত্রে তাঁহার মন্তব্য এমন সুন্দর ইংরেজীতে লিখিত হইত যে তাহার রচনাকৌশল দেখিয়া তাঁহার ঊর্ধ্বতন ইংরাজ কর্মচারীগণও বিস্মিত ও ঈর্ষান্বিত হইত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমকে চাকুরীজীবীদের 'প্রধান অলঙ্কার' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হাবড়া হইতে কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জাজপুর গমন পর্যন্ত বঙ্কিম-বাবুর বাসা ছিল বহুবাজার ষ্ট্রীটে। সেখানে প্রত্যহ সাহিত্যিকদের বৈঠক হইত। সেই বৈঠকে নিয়মিত আসিতেন বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক, যথা, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার কবিরত্ন, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র, বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। যোগেশচন্দ্র ঘোষ 'পজিটিভিজ্‌ম্‌' ও হিন্দুধর্ম লইয়া প্রায়ই আলোচনা করিতে আসিতেন। ১৮৭৫ সালে বঙ্কিম দীর্ঘ নয় মাসের ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করেন। সেই সময়ে তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। এই সময়ে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেল্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় 'কলেজ রিউনিয়ন' নামক এক মিলন সভায় বঙ্কিচন্দ্রের সহিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গবর্নমেণ্টের এসিস্‌টেণ্ট সেক্রেটারীর পদ, যাহাতে বঙ্কিম অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা সহসা লুপ্ত হওয়ায়, কাগজে ও পত্রিকায় বঙ্কিমকে লইয়া বহু আলোচনা হয়। এই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী (১১ই মাঘ) বঙ্কিম ব্লাইদকে এসিসটেণ্ট সেক্রেটারীর চার্জ বুঝাইয়া দেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া

বঙ্কিমকে তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে লইয়া যান।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ বঙ্কিমের ব্যক্তিগত জীবনে স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরে ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হয়। পিতা যাদবচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীব ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ১২৭২ বঙ্গাব্দ ২১ মাঘ তারিখের একটি দানপত্রের দ্বারা ভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও তৃতীয় পুত্র বঙ্কিমকে ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত করেন। সঞ্জীব ও পূর্ণচন্দ্র আর একটি দানপত্রের দ্বারা পিতার এই অন্যায়ের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। বঙ্কিম মনে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া সপরিবারে কাঁঠালপাড়া ত্যাগ করিয়া চুচুড়ার জোড়াঘাটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পিতাকে তিনি লিখিয়াছিলেন যে : 'মেজদাদার দানপত্র যদি আপনি আপনার দানপত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকার করেন, তবেই বাড়ী যাইব, নতুবা নহে।' অনিচ্ছা-সত্ত্বেও পিতা যাদবচন্দ্র আর একটি দলিল করিয়া বঙ্কিমের হস্তে অর্পন করেন। তবে ইহা যে যাদবচন্দ্রের অভিপ্রায় নহে তাহা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর যাদবচন্দ্র একখানি উইল করিয়া রেজিষ্টারী করিতে মনস্থ করিলেন এবং সেই উইলে তাঁহার পূর্বের দানপত্র অনুযায়ীই ব্যবস্থার ইঙ্গিত ছিল। কোন কারণে সেই উইল শেষ অবধি সম্পাদিত হয় নাই। কিন্তু পিতার এই ব্যবহারে মনক্ষুণ্ণ হইয়া বঙ্কিম কাঁঠালপাড়ার পৈতৃক ভিটা চিরতরে ছাড়িয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করিলেন। পিতৃসম্পাদিত দলিল হাতে পাইয়াও, তাহা বঙ্কিম রেজিষ্টারী করিলেন না। জীবনের এই ঘটনা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা বঙ্কিমের উপন্যাস সাহিত্যে প্রকাশ পাইয়াছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শুধু কল্পনামাত্র নহে। ইহা যাদবচন্দ্রের বাড়ীর রূপায়িত কাহিনী। যাদবচন্দ্রের ছবি হইলেন কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্তের পুনঃ পুনঃ উইল পরিবর্তন যাদবচন্দ্রের বিষয় বিভাগের চিত্র। কিন্তু ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে পিতার নিকট অন্যায় অবিচার পাইয়াও, বঙ্কিম পিতার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই বা তাঁহাকে শেষ সময়ে আশ্বাস দানে অবহেলা করেন নাই। পারিবারিক কলহের জন্য বঙ্কিম কাঁঠালপাড়া ছাড়িলেন বটে এবং চুঁচুড়ায় তাঁহার বাস হইল। কিন্তু ইহাতে চুঁচুড়ার সৌভাগ্য হইল এই যে চুঁচুড়া বঙ্কিমের জন্য এক নূতন সাহিত্যতীর্থ হইয়া উঠিল। বঙ্কিমকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্কিমের চুঁচুড়ার জোড়াঘাটের বাড়ীতে ভূদেববাবু, হেমবাবু, যোগেনবাবু, অধ্যাপক গোপাল গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এবং বহু সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণী প্রায়ই দেখা করিতে ও সাহিত্য আলোচনা করিতে আসিতে লাগিলেন।

এই স্থানে বঙ্কিমের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সম্পর্ক এবং এই প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যাহার তিনি প্রথম স্নাতক ছিলেন, সেইখানে তাঁহার কীর্তির ও কর্মের কথা আলোচনা প্রয়োজন। বঙ্কিম-জীবনে ইহা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গলী সিলেক্সনস্' প্রকাশ করেন। স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে বঙ্কিম, সেই সময়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায়ে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সম্মান ও পরিচিতির ইহাই প্রথম চেষ্টা ও অভিযান। সেই যুগে তাহার একমাত্র নায়ক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৯ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'সাধনায়' লিখিয়াছিলেন :

—কিন্তু কেন যে তাঁহার ক্ষীণ স্বর কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হাউসের মহতীসভা 'অসংখ্য বালক বলীদানরূপ মহাপুন্য ফলে' কিরূপ চরম সদগতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যদি কর্ণভেদ করিতে না পারে, তাঁহার তীক্ষ্নবাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

ইহার পর, সেণ্ট্রাল পাঠ্যপুস্তক কমিটিতে (Text Book Committee) ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি সাব-কমিটিতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে দেখা যায়। ইহার তিন বৎসর পূর্বে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হাইয়ার ট্রেনিং'-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে যুবকদের এক সভায় বঙ্কিম উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই ইহার সাহিত্য শাখার স্থায়ী সভাপতি-রূপে বৃত হন। এই সভারই নাম পরবর্তীকালে 'ইয়ুনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্' নামে পরিবর্তিত হয়। এই মঞ্চ হইতে সাহিত্য ও ধর্মবিষয়ে বঙ্কিম বহু বক্তৃতা ও ভাষণ দেন, যাহা বাংলার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার যে চর্চা, গবেষণা, অধ্যায়ন ও অনুশীলন হইতেছে, তাহার ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন বঙ্কিম।

বঙ্কিম চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রথমে কাঁটালপাড়ায় আসেন। কিন্তু রোগাক্রান্ত হওয়ায় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় ৫ নম্বর প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে বাড়ী কিনিয়া সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিল, বাংলা ২৬শে চৈত্র, ১৩০০ সালে, অপরাহ্ন ৩-২৫ মিনিটে, কলিকাতায় স্বগৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে, এবং মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্বে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে, সি-আই-ই উপাধিতে তিনি ভূষিত হন।

বঙ্কিম দেশ-বিদেশ পর্যটন করিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। তবে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ৯ই মার্চ তিনি একবার উত্তর ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তাঁহার সহগামী ছিলেন তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়, শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র। মির্জাপুর, কাশী, আগ্রা, দিল্লী হইয়া বঙ্কিম মথুরা, বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করেন। মথুরায় জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণের সহিত, সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মনোমালিন্য হওয়ায় বঙ্কিম একা জয়পুর চলিয়া যান এবং পরে বঙ্কিম ও সঞ্জীব একত্র হইয়া এলাহাবাদ ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় এলাহাবাদ খসরুবাগে বঙ্কিমকে লইয়া এক বিরাট সাহিত্যসভা হয়; স্বনামধন্য স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায়, সাহিত্যে বঙ্কিমের অবদান ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ লইয়া বহু আলোচনা হয়। এই ভারত ভ্রমণ হইতে বঙ্কিম ২রা এপ্রিল, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করেন।

বঙ্কিমের কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু বঙ্কিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও মুখাগ্নি করেন। বঙ্কিমের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। যদিও বঙ্কিমের পুত্রসন্তান হয় নাই, তাঁহার তিন কন্যা ছিল; শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাঁহাদের মধ্যে কেহই এখন বর্তমান নাই।

বঙ্কিমের সাহিত্য জীবনে একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল যে, তিনি এমন এক লেখক গোষ্ঠী সৃষ্টি করিবেন যাঁহারা বাংলার জাতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহা আশ্চর্যভাবে সফল হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, হেমবাবু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর কর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গিরিজা-

প্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রভৃতি বহু লেখক বঙ্কিমের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলাসাহিত্যে অক্ষয় সম্পদ ও সমৃদ্ধি আনিয়াছেন।

এই অধ্যায়ের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে বঙ্কিমের জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইল, ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ইতিহাস বা জীবনী লেখা নহে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্কিমের জীবনের ও সমাজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য, যাহা তাঁহার সাহিত্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহাকে সুস্পষ্ট করা।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বলিয়াছেন 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বঙ্কিমচন্দ্র'। সেই শ্রেষ্ঠতা জীবনের ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে ও অভিজ্ঞতায় বঙ্কিম কিভাবে অর্জন করিয়াছিলেন, তাহা নির্দেশ করাই এই অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। বঙ্কিমের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের ভিত্তির উপর মনুষ্যত্বের স্থাপন এবং সেই মনুষ্যত্বের গঠন ও বিকাশের জন্য উপযুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি ও জীবনে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে' বলিয়াছেন, "যে রীতির উদ্ভাবনায় গুরুগম্ভীর পদযোজনা এবং সহজ সরল বাক্‌পদ্ধতির সমন্বয়ে একটি অখণ্ড ধ্বনি প্রবাহ সম্ভব হইয়াছে, সে রীতি, 'সাধু'ও নয়, 'কথ্য'ও নয়। তাহার নাম বাংলা গদ্যরীতি। এই রীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, এই তিন প্রভাবশালী লেখকের প্রতিভায়, ক্রমপরিনতি লাভ করিয়াছে, তথাপি ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।" এই প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমের উপর কবিতায় বলিয়াছেন :

সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে, নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ সাহিত্যের উৎস উঠি, মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে; চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে, মিলায়ে তোমার আয়ুগণি
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

এই সব্যসাচী, দন্ডবিধাতা, কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, খড়্গধারী, দর্পহারী, মহারথী বঙ্কিমচন্দ্র মহাদুর্যোগের কালে, মুসলমান রাজত্বের অবসানে ইংরাজ শাসনের মধ্যাহ্নে একাধারে বঙ্গসাহিত্যের সারথী, উপদেষ্টা, সখা, বন্ধু ও তার মধ্যমণি। হতগৌরব জাতিকে তিনি আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, মৃতপ্রায় ভাষাকে তিনি সঞ্জীবনী সুধা ও অমৃত ধারায় পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন বঙ্কিমের ললাটে রাজতিলক। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সহিত 'মরকতকুঞ্জে' প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনায় লিখিয়াছেন :

সেই ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে একজনকে দেখিলাম। তিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র, যাঁহাকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকায় পুরুষের মধ্যে এমন একটা দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম, চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটা নিশ্চিত পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে, ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বন্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁহার কিছুমাত্র গা ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না। এইটাই সর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব ছিল, তাহা নহে। তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।

৩

॥ বঙ্কিম ও বঙ্গভাষা ॥

১লা বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম লিখিয়াছেন, যাহারা বাংলাভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত, তাহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর ধারণা ছিল যে তাঁহাদের পাঠের যোগ্য বিশেষ কিছুই বাংলাভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তিনি এই সমস্যার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, যাহা আজ দেশবাসী ভুলিতে বসিয়াছে। এবিষয়ে বঙ্কিমের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত আজ অনুধাবন করা প্রয়োজন, কারণ বর্তমানে ভাষা লইয়া যে বিভ্রাট সমস্ত ভারতবর্ষে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বহু সমাধান ও সুচিন্তিত এবং যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত বঙ্কিম দিয়া গিয়াছেন। তাহা আজও সত্য ও পথ-প্রদর্শন করিতে সক্ষম।

বঙ্কিমের প্রথম বক্তব্য :

লেখাপড়ার কথা দূরে থাক, এখন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাংলায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজীতে। সাধারণ কার্য্য, মিটিং, লেক্চার, এড্রেস, প্রোসিডিংস্ সমুদায় ইংরাজীতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজী জানেন, তবে কথোপকথন ইংরাজীতে হয়। কখনও ষোল আনা, কখনও বার আনা ইংরাজীতে। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্রলেখা কখনও বাংলায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ কিছু ইংরাজী জানেন, সেখানে বাংলায় পত্রলেখা হইয়াছে। আমাদের এমনও ভরসা আছে যে অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদিও ইংরাজীতে পঠিত হইবে।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় বক্তব্য :

আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিখি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদের মৃতসিংহের চর্ম্মের স্বরূপ হইবে মাত্র। ইংরাজী লেখক, ইংরাজী বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন খাঁটি বাঙালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

বঙ্কিমের তৃতীয় বক্তব্য :

সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায়

না। কস্মিনকালে কোন বিদেশীয় রাজা, দেশীয় ভাষার পরিবর্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই। সুতরাং বাংলাভাষায় যাহা উক্ত হইবে না তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। যে কথা দেশের সকলে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

বঙ্কিমের চতুর্থ বক্তব্য :

আমরা ইংরাজী বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত রত্ন-প্রসূতা ইংরাজী ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল। আরও বলি সমাজের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদেরও এমন কতকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজীতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে, যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিৎ, সে সকল কথা ইংরাজীতে না বলিলে সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতিকে, একমত এক পরামর্শী, একোদ্যম করিতে হইলে তাহা কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়; কেননা এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে, বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলিঙ্গী, পাঞ্জাবী—ইহাদের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এক রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে, অতএব যতদূর ইংরাজী চলা আবশ্যক ততদূর চলুক।

বঙ্কিমের এই চারিটি অভিমত সংযত অথচ প্রাণবন্ত ভাষায় ব্যক্ত ও অকাট্য যুক্তির দ্বারা সমন্বিত। ইহার প্রত্যেকটি যুক্তি বর্তমান সময়েও প্রযোজ্য। বর্তমান ভারতে যাঁহারা ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের বঙ্কিমের এই চারিটি কথা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

বাংলাভাষার, বাংলা দেশের ও বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখার এখনও অনেক বাকী। ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাংলার ইতিহাস নাই। গ্রীনল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতিরও ইতিহাস আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।

বঙ্কিমের মতে ইতিহাস না জানিলে, বাঙ্গালী মানুষ হইবে না। সুতরাং তিনি আবার বলিতেছেন :

বাংলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। বাংলার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালীর ভরসা নাই। কে লিখিবে?

তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর আমাদের সর্ব-সাধারণের মা, জন্মভূমি বাংলা দেশ, ইহার গল্প করিতে আমাদের আনন্দ নাই?

যে দুঃখ বঙ্কিম এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা লাঘব করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ঠ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ অগ্রগামী হইয়াছেন। শ্রীরামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রণীত বিখ্যাত বাংলা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের গ্রন্থের সমালোচনা তৎকালীন যুগের উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, দীনেশ সেন মহাশয়, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, যদুনাথ সরকার মহাশয় ও রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রভৃতি বাংলার ইতিহাস না থাকার এই লজ্জা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থ এবং সেই সকল গ্রন্থে তাঁহারা যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা, বাংলার ইতিহাস লেখার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু এই আবিষ্কার ও ইতিহাস এখনও অসমাপ্ত, পূর্ণাঙ্গ নহে। বঙ্গভাষাবিদ্‌গণের এখনও এই ক্ষেত্রে বহু কাজ বাকী রহিয়া গিয়াছে।

বঙ্কিম কিভাবে বাংলাভাষার উপর ঐতিহাসিক প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া-ছিলেন এবং তাহা কিভাবে দেখাইয়াছিলেন তাহাই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। বঙ্কিমের মতে বাংলাদেশে বিগত এক সহস্র বৎসরের মধ্যে চারিটি বা পাঁচটি বিপ্লব ঘটিয়াছে, যাহার প্রত্যেকটির প্রভাব বাংলাভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সমালোচনায়, এই সকল বিপ্লবের মধ্যে, দুই-তিনটি রাষ্ট্রবিপ্লব এবং দুই-তিনটি ধর্মবিপ্লব। বাংলা ভাষার উপর ইহাদের প্রভাব স্থায়ী ও সুদূর-প্রসারী। রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা বলিতে গেলে, মুসলমান শাসন ও ইংরাজ শাসন উল্লেখযোগ্য। এই দুই রাষ্ট্রবিপ্লবেই বাংলা ভাষা পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার উপরোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সুন্দরবনে যে সনন্দ পত্র-ফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দুইটি সত্য

নির্ণীত হইয়াছে, যথা (১) বাংলাভাষার বয়স সহস্র বৎসরাধিক এবং (২) বাংলা অক্ষর যদিও কালের গতিতে রূপান্তরিত, তথাপি তাহার মিল ও সূত্র আধুনিক অক্ষরে পাওয়া যায়। সেন রাজাগণের বাংলাদেশে আগমন ও শাসন বাংলাভাষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

ধর্মবিপ্লবের ফলে সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে তন্ত্র প্রচার ও ভাগবত প্রচার। বাংলাদেশ তন্ত্রভূমি ও শক্তিপূজার দেশ। তন্ত্রশাস্ত্রে বাংলা বর্ণমালার বিশেষ ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও অনুশীলন আছে। বহু তান্ত্রিক আচারে বাংলা সমাজের আচার ব্যবহার ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের তাৎপর্য লক্ষিত হইয়াছে। তন্ত্রে বাঙ্গালী সমাজের আচার ব্যবহারে ও বাংলা সাহিত্যে কতদূর পরিবর্তন হইয়াছে তাহার উপর গভীর আলোচনা এখনও হয় নাই। যখন কালীকিঙ্কর, সাধকপ্রবর ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গান করিয়াছিলেন—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই রে কুতূহলে
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে মাতাল বলে।"

তখন বোঝা যায় তন্ত্রের কি বিপুল প্রভাব বাংলা সাহিত্যের উপর। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দেওয়ান মহাশয় প্রভৃতির রচনায় এবং তদ্ব্যতীত সহস্রজনের লক্ষ শ্যামাবিষয়ক গানে যে বাংলাভাষার কত রূপান্তর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার সময় আসিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র না থাকিলে বাংলা সাহিত্য এই অপরূপ শব্দসম্পদ ও ভাবসম্পদ হইতে বঞ্চিত হইত। শক্তিপূজার আর এক প্রভাব বাংলাসাহিত্যে আসিয়াছে বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা হইতে। দুর্গাপূজা বাঙ্গালীর জাতীয় পূজা। আগমনীর গান কাহিনী ও রচনা অজস্রধারায় বাংলা সাহিত্যকে এক অপূর্ব রূপলাবণ্য ও ভাবধারায় সমৃদ্ধ করিয়াছে। 'উমা-সাহিত্য' বঙ্গভাষার অতুলনীয় সম্পদ। ডাঃ শশীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের 'ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য' গ্রন্থে ইহার অনেক সমালোচনা আছে।

এই ধর্মবিপ্লবের মাঝে, বাহ্য ইতিহাসের অন্তরালে অতি নিভৃত অনাড়ম্বরে এই বাংলা দেশে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্মের সমন্বয়ের এক অপূর্ব সাধনা বহু শতাব্দী হইতে সক্রিয়। এই মহাসমন্বয়-প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভব হইয়াছে বাউল, আউল ও সন্তসাহিত্য, যাহা বাংলা ভাষাকে সহজ, সরল, সাবলীল ও মরমী করিয়া তুলিয়াছে।

এইসকল ধর্মবিপ্লবের ফলে, বঙ্গসাহিত্য ক্ষেত্রে প্রধান লাভ এই হইয়াছে

যে বাংলাভাষা পাণ্ডিত্য পরিত্যক্ত অথচ সহজ সরল পথে বাঙগালী সমাজের ও সাধারণের ভাবধারার উপযুক্ত বাহন হইতে সক্ষম হইয়াছে। বাংলাভাষা ইহাতে কেবল বুদ্ধি, কল্পনা ও পাণ্ডিত্যের বিলাসভূমি না হইয়া সাধারণ বাঙগালীর সহিত পথে ঘাটে বিচরণ করিতে শিখিয়াছে।

বাংলাভাষার উপর ভাগবত সাহিত্যের প্রভাব বঙ্কিম বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ভাগবত গ্রন্থ কতদিনের তাহার সঠিক ঐতিহাসিক কালনির্ণয় করা কঠিন। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে ভাগবতে অনার্য 'হূন্' জাতির উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীরও দুই তিন শতাব্দী পূর্বের। ইহার দ্বারা ভাগবতের সময় নির্ণীত হয়, দশম শতাব্দী। ভাগবতের সূত্র এই বঙগ-দেশে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে এবং তাহার বহু তরঙগ বঙগসাহিত্যেও আসিয়া মিশিয়াছে। এই প্রসঙেগ বঙ্কিম বিশ্লেষণ ও আলোচনা দ্বারা, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও চৈতন্যমহাপ্রভুর বাংলাভাষার উপর প্রভাব সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যবর্তিনী ভাষা। বিদ্যাপতির পদাবলীতে বাংলা ভাষায় নূতন নূতন শব্দ চয়ন ও বিন্যাস দেখা যায়। ভাগবতের দ্বারা বাংলাভাষার বহু রূপান্তরের প্রমাণ ছন্দে, ভাষায়, পদবিন্যাসে, শব্দচয়নে ও ভাবরসে স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। বঙ্কিমের বিচারে ভাগবতের প্রচারের জন্য বাংলাদেশে 'কথকতা'র সৃষ্টি হয়। কথকগণ বাংলা-ভাষার বহু উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা পুরাণের সংস্কৃত শব্দসকল চলিত ভাষায় যোগ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সকল শব্দ ও ব্যাখ্যা ক্রমে ক্রমে সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তবে বঙ্কিমের মতে কথকতার প্রভাব যে বাংলাভাষাকে সব সময়ে উন্নত করিয়াছে তাহা নহে। তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে কথকতার চারিটি প্রধান অঙগ। সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা, বর্ণনা, পদাবলী ও গান। ব্যাখ্যা তিনি দেখাইয়াছেন বহু ক্ষেত্রে ভাবকে শিথিল করিয়াছে। কিন্তু বর্ণনাভাগ ভাষাকে ক্ষুদ্রাবয়বযুক্ত অথচ জমাট ও ঘনীভূত করিয়া ভাষাকে বলিষ্ঠ করিয়াছে। পদাবলী রীতির অনুবর্তন বাংলাভাষায় শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্য আনিয়াছে। গানের মাধ্যমে এক ছন্দবোধ আনিয়ছে, যে-ছন্দ অনেক সময়ে বাংলা শব্দের ও ভাষার রূপকে পরিবর্তন করিয়াছে। বঙ্কিম আরও বলেন যে কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, শ্রীশচন্দ্র ও দেওয়ান মহাশয়ের কথকতার গানে, কবিওয়ালাদের ঠাকুরণ বিষয়ে ও সখী-সম্বাদে, রাধামোহন সেন এবং ঈশ্বরগুপ্ত, দাশরথী রায় ও আশুতোষ দেবের গানে, দেখা যায় যে সংস্কৃত পদাবলীর রীতির অনেক অনুকরণ বাংলাভাষার

প্রকাশ, ব্যঞ্জনা, গঠনভঙ্গী ও শব্দকৌশল বহুভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছে। শ্রীমধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' এই ভাষায় কথা বলেন এবং বঙ্গসমাজ এই ভাষার সহিত অতি নিবিড় ও একান্তভাবে পরিচিত।

ভাগবত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব বাংলাভাষার উপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বঙ্কিমের এই অভিমত আরও সুস্পষ্ট হইবে। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন মহাশয় তাঁহার 'ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্য দুই শাখায় বিভক্ত, একটি 'চরিত-সাহিত্য' এবং আর একটি 'পদাবলী-সাহিত্য'। মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, রামানন্দ বসু, শিবানন্দ সেন, বলরাম দাস, বৃন্দাবন দাস, উদ্ধবদাস, লোচন দাস, যদুনন্দন চক্রবর্তী, নরোত্তম দাস প্রভৃতি পদকর্তাগণের অবদান এবং জ্ঞান দাস ও গোবিন্দ দাস যথাক্রমে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুগামী হইয়াও বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় নিত্যকালের সম্পদ পরিবেশন করিয়াছেন। রসসাহিত্যের সৃজন এবং অপূর্ব শব্দ-চয়ন কৌশল তাঁহাদের অবিস্মরণীয় অবদান। চরিত সাহিত্যের বিশিষ্ট উদাহরণরূপে উল্লেখযোগ্য লোচন দাস ও মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত, যাহা সাধারণভাবে মুরারি গুপ্তের 'কড়চা' নামে বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ। অধ্যাপক সেনশাস্ত্রী মহাশয় আরও দেখাইয়াছেন যে এই ষোড়শ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম মহাভারতের অনুবাদ প্রচারিত হয়। কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী, রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ প্রভৃতি কবিগণ সর্বপ্রথম 'ভারতকথা' সমগ্র বা আংশিকভাবে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা প্রয়োজন যে, যদিও ষোড়শ শতাব্দীর ভাগবত ও ভক্তি-ধর্মের প্লাবনে বাংলাভাষা ও ভাবের বহু পরিবর্তন লক্ষিত হয়, তথাপি বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সেই সময়ে 'মঙ্গলকাব্য' রচনার ধারা ক্ষীণ হয় নাই। অধ্যাপক সেনশাস্ত্রী মহাশয় পরন্তু বলিয়াছেন যে সেই ধারা তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। চণ্ডী-মঙ্গলের রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মানিক দত্ত, মাধব আচার্য ও মুকুন্দরাম। মুকুন্দরামই 'মঙ্গলকাব্য'কে যথার্থভাবে সাহিত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বাংলাভাষার কথাশিল্পে, চরিত্র চিত্রাঙ্কনে ও বর্ণনাভঙ্গীতে নূতন পথের প্রদর্শক। সাধারণ দরিদ্রের দৈনিক জীবন অঙ্কনে তিনি যে করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। এই ভাগবতধর্মের প্রভাব ও ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের কথা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবে না যদি আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তির উল্লেখ না করি। রবীন্দ্রনাথ

এই বিষয়ে বলিতেছেন :

'বর্ষা ঋতুর মতন মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলা দেশে সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই তখন দেশে যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা ও নূতন ছন্দে, কত প্রাচুর্যে প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।'

এই যে প্রাচুর্য, প্রবলতা ও ভাবপ্রবণতা, তাহার তরঙ্গ আঘাত বঙ্কিম সাহিত্য-তট অবধি প্লাবিত করিয়াছিল। এক কথায় বলিতে গেলে ইহা বলিতে হইবে যে, (১) বৈষ্ণবসাহিত্য, (২) ভারত-পাঁচালি ও (৩) মঙ্গলকাব্য, এই ত্রিধারার ত্রিবেণীতে বাংলাভাষার নবকলেবর লাভ হইয়াছিল। বঙ্কিম-সাহিত্যে সেই নবকলেবরেরই অভিনব রূপ দেখা যায়।

বাংলাভাষার উপর ধর্মবিপ্লবের প্রভাব আলোচনা করিবার পর, বঙ্কিমের চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া, এইবার বিচার্য বিষয় হইবে বাংলাভাষার উপর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রভাব। রাষ্ট্রবিপ্লবে মুসলমান শাসন কিভাবে বাংলাভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বঙ্কিম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে এই বিষয় লইয়া তিনি বহু সমালোচনা করিয়াছেন।

অনেকের মতে বাংলার 'পয়ার' ছন্দ সংস্কৃতে কোন ছন্দের অনুরূপ নহে এবং উহা পারসী 'বয়েৎ' নামক ছন্দের অনুকরণ। বঙ্কিমের সিদ্ধান্তে ইহা ঠিক নহে। তিনি বলেন পয়ারের সহিত বয়েতের কোন সাদৃশ্য নাই, বিশেষ করিয়া ছন্দোগত কোন সাদৃশ্য নাই, বয়েৎ লঘুগুরু ভেদাত্মক ছন্দ। ইহাতে না আছে মাত্রাবৃত্তি না আছে অক্ষরবৃত্তি। বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত এই যে পারসী বয়েৎ প্রায় সংস্কৃত 'ভুজঙ্গ প্রয়াতের' অনুরূপ।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বঙ্গ জয় করেন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা বাংলাভাষার কোন পরিবর্তনই করিতে পারেন নাই। কিন্তু যখন শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর ধর্মবিপ্লবে বাংলাভাষার নূতন দিক্‌দর্শন রচিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে পারসীভাষা ও তাহার শত শত শব্দ ও তাহার কয়েকটি বিশিষ্ট কৌশল ও রীতি বাংলাভাষায় প্রবেশ করে। বঙ্কিমের অভিমত এই যে ১২০৩ অব্দ হইতে সম্রাট আকবরের সময় পর্যন্ত বাংলাভাষাতে পারসিক যোগ বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। এই সাড়ে তিনশত বৎসর পারসী ভাষা কেবলমাত্র রাজদরবারের ভাষা ছিল। আকবরের উদারতা হিন্দু-

মুসলমানকে অনেকভাবে একসূত্রে বন্ধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চেষ্টার একটি ফল, ভাষার দিক দিয়া, উর্দু ভাষার সৃষ্টি।

বিখ্যাত হিন্দু রাজা তোড়রমল্ল সম্রাট আকবরের রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য হিন্দু অমাত্যবর্গ—যথা, মানসিংহ, বীরবল প্রভৃতি চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে হিন্দুর ভিতর পারসীভাষা শিক্ষার প্রচলন হয়। বিশেষ করিয়া শাসনবিভাগে তোড়রমল্ল এই বিধান করেন যে, তাঁহার রাজস্ব বিভাগে ও আকবরের সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রদেশে, হিসাব, বন্দোবস্ত, কাগজপত্র ও অন্যান্য নিরূপণপত্র সবই পারসীভাষায় রাখিতে হইবে। ইহার মূল কারণ এই ছিল যে, পারসীভাষা জানা থাকিলে রাজসভায় পরিচিত ও কাজকর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ ও সুবিধা ঘটিবে। যে কারণে ইংরাজী শাসনে ইংরাজী ভাষা তাহার স্থান করিয়া লইয়াছিল, ইহারও সেই একই কারণ।

ঐতিহাসিক দিক দিয়া বলা যায় ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের পর রাজা তোড়রমল্ল পারসীভাষা প্রচার করেন। তাহার প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যমহাপ্রভুর তিরোধান হয়। সমসাময়িক গ্রন্থকর্তাদের মধ্যে রূপ, সনাতন, জীব, মুরারি ও দামোদরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের মতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যচরিতামৃত লিখিত হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঠিক সময় জানা নাই—তবে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে তখন ভাগীরথী সপ্তগ্রামের নীচ দিয়া তাকনা-মহেশের পাশ দিয়া যাইত। বঙ্কিম বলেন যে কবিকঙ্কণের চণ্ডী সম্ভবতঃ ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের পর এবং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সমাপ্ত হয়। অন্য দিক দিয়া বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু ও জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভের সময় যখন মোগল ও পাঠান দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিবাদে লিপ্ত তখন বা তাহার কিছুকাল পরেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা বৃহদ্‌গ্রন্থ ভাগবত প্রণয়ন করেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডী যখন সমাপ্ত তখন পারসী ভাষার ব্যাপক চলন ও ব্যবহার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্কিম কবিকঙ্কণের চণ্ডী হইতে নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়াছেন :

শুনরে সভার জন, কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যে মতে।
উরিয়া মায়ের দেশ, কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।
সহর সেলিমারাজ, তাহাতে সুজনরাজ
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।

অধর্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে।
উজীর হল রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে হলো আরি।
ডিহিদার আরোজ খোঁজ, টাকা দিলে নাহি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।

এই উদাহরণ দিয়া বঙ্কিম দেখাইতেছেন কিভাবে পারসীভাষা বাংলাভাষায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। বঙ্গদেশ 'তালুকে' বিভক্ত হইতেছে, পারসী নামে গ্রাম ও সহরের নামকরণ হইতেছে, কোটাল, ডিহিদার, জমাদার। রাজকর্মচারীরা কর্ম করিতেছে, পুরস্কারের জায়গায় খিলাৎ পাইতেছে এবং নামে 'খাঁ' উপাধি পর্যন্ত লাগাইতেছে। বখতীয়ার খিলজী ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা জয় করেন বটে কিন্তু পারসীভাষার সংমিশ্রণে বাংলাভাষার যা পরিবর্তন ঘটে, তাহার অধিকাংশই আকবরের যুগে হইয়াছে বলিয়া বঙ্কিম সিদ্ধান্ত করেন।

বঙ্কিম-সাহিত্যে বহু পারসী ভাষা ও শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যথা—'মুনফা', 'বদল', 'কোবালা', 'আমল', 'দেরাজ', 'মসনদ', 'জমাওয়াশীল' (সংগ্রহ-লিপি) 'পাইক', 'বরকন্দাজ', 'আক্কেল', 'এতেলা' (সংবাদ) প্রভৃতি। বঙ্কিমের উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল উদাহরণস্বরূপ দেখিলে বঙ্কিমের বাংলাভাষায় পারসী শব্দ ব্যবহার সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

আকবরের মৃত্যুর পর, বাংলাভাষা একটা নিজস্ব পথ ও গতি বাছিয়া লইয়াছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সংস্কৃত চর্চার প্রাবল্য, কবিরঞ্জন ও রায় গুণাকরের সাহিত্য এবং কৃষ্ণনগরের পণ্ডিতমণ্ডলীর তদানীন্তন একতা, বাংলা ভাষাতে এক নূতন স্রোতের জোয়ার আনিয়াছিল। কিন্তু এই সময় আর এক রাষ্ট্র-বিপ্লব আসিয়া উপস্থিত হইল। বাংলাভাষা এই নূতন বিপ্লবে আবার স্তম্ভিত ও তটস্থ হইল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ সমাপ্ত হয় এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর বিপর্যয়ে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ বাংলাভাষার কোন উন্নতি হয় নাই। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় প্রভৃতির ন্যায় লোক বর্তমান থাকিলেও, বাংলাভাষায় কোন স্পন্দন ছিল না। রাজা রামমোহন রায় আসিয়া বাংলাভাষায় আবার নূতন স্পন্দন আনিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাংলা-ভাষা সংস্কার করিবার পূর্বেই, পারসী ও উর্দুভাষা বাংলাভাষায় তাহাদের

স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

বঙ্কিম বাংলাভাষার উপর ৫৫০ বৎসরের মুসলমান শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের নির্দেশ করিয়াছেন, যথা :

১। বিশেষণ পদ অনেক সময়ে বিশেষ্যের পর বসিয়াছে যেমন 'শ্রীমতী রাইকিশোরী দেবী, নাবালিকা। কাবুম চাহরম্।'

২। সম্বন্ধ পদ সম্বন্ধের পর বসিতেছে যে রকম 'আলিজান রে অমুক— অমুকের পক্ষে কার্যকারক।

৩। 'সাকিম', 'মোকাম', 'বকলম' 'মারফত', 'দরুন', 'বাবদ' প্রভৃতি বহুবিধ ও বহুসংখ্যক যোজক অব্যয় ভাষায় প্রবেশ করিয়া, একটি বিস্তীর্ণ ভাবকে ক্ষুদ্র একটি কথায় প্রকাশ করিতেছে। তাহাতে বাংলাভাষা কিছু দৃঢ়নিবন্ধ হইয়াছে।

৪। 'আক্কেল সেলামী', 'বেগারের দৌলৎ', 'হাকিম ঘোরে, হুকুম ঘোরে না' প্রভৃতি ছোট ছোট বাক্য বাংলাভাষাকে আটপৌরে করিয়াছে।

৫। রাজধর্ম, শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ, ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি বিষয়ে নানা পারসী শব্দ বাংলাভাষাকে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহারোপযোগী ও অর্থকরী রূপ দিয়াছে।

ইংরাজ শাসনে বাংলাভাষার ইতিহাস ও বিবর্তন এখনও লেখা হয় নাই। তবে সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে' কতিপয় ঐতিহাসিক তথ্য দিয়া ইহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন বাংলা গদ্যের ইতিহাসে পর্তুগীস্ প্রভাব। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' ও 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে 'লিসবন্' সহরে রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়, যাহাতে বাংলা অংশের পরিমাণ প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা হইবে। সজনীকান্ত দাস মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠায় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে "বাংলা গদ্যের উহাই মূলধারা। এই ধারাই পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বর-চন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও বঙ্কিম কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান গদ্য সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত।" ইহা বলা হইয়াছে যে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। ইহা বলিবার কারণ এই যে ঐ সালে বাংলাদেশের হুগলী সহরে ছেনিকাঠে বাংলা হরফ মুদ্রণ আরম্ভ হয় এবং ঐ প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে 'হ্যাল-হেডের' (Hal head) 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ'—*'A Grammar of the Bengali language'* ছাপা হয়।

ইংরাজীতে লিখিত এই ব্যাকরণে উদাহরণস্বরূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে অংশবিশেষ বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়। তবে শুধু এই কারণে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দকে বাংলা গদ্য-ইতিহাসের যুগারম্ভ বলা ঠিক হইবে না। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে বাংলা অক্ষর মুদ্রণের আরম্ভ বলা যাইতে পারে। ইহার বহু পূর্ব হইতে বাংলা গদ্যের ইতিহাস সুরু হইয়াছে।

ইংরেজী ভাষার প্রভাব বাংলাভাষার উপর ফারসী ও উর্দুর চেয়ে আরও ব্যাপক; কারণ ইংরেজী ভাষা এক আন্তর্জাতিক ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা শুধু এককালীন শাসকের রাজভাষা বলিয়াই নহে, অন্যান্য বহু কারণে ইংরেজী ভাষার প্রভাব বাংলার উপর স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে এবং সেই প্রভাব এখনও চলিয়াছে, যদিও ইংরাজ শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। ইংরেজী ভাষার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির বহু কারণ আছে। প্রথম, ইংরাজ জাতি পৃথিবীর বহু দেশে মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল যাহার ফলে ইংরেজী ভাষা বহু দেশের ভাষা ও ভাবের দ্বারা সমৃদ্ধ। দ্বিতীয়, এই ইংরাজ জাতি বিজ্ঞান ও শিল্প জাগৃতির (Industrial Revolution) পথপ্রদর্শক, যাহার ফলে ইংরেজী ভাষা বিজ্ঞান ও শিল্পের বার্তাবহ হইবার প্রথম সুযোগ পাইয়া তাহাকে আধুনিক জগতের ব্যবহারোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। তৃতীয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসা ইংরেজী ভাষার প্রসারতা ও পরিচিতি জগতের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। চতুর্থ, রাজনীতি, কূটনীতি, আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান প্রভৃতির ক্ষেত্রে এবং সমাজ, গণতন্ত্র, রাষ্ট্র ও আইন সংগঠনে ইংরেজী ভাষার বহু অবদান আছে। পঞ্চম, সাহিত্যে, কাব্যে, বিজ্ঞাপনে ও প্রচারে, ইংরেজী ভাষা বহুভাবে বহু দেশকে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতের ঐক্য, ভারতের রাজনীতি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও ইংরেজী ভাষা ও ভাবের দ্বারা বহুভাবে অনুপ্রাণিত।

বঙ্কিম নিজে ইংরেজী সাহিত্য ও ভাবধারার সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্য সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের রচনায় তিনি অনেক ইংরেজী শব্দ বাংলাভাষায় গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—'উইল', 'ফোরক্লোজ', 'ফ্রেম', 'প্যাটার্ন', 'হল', 'ডিটেকটিভ' ইত্যাদি। বাংলাভাষায় ইংরেজী ভাষার আর একটি প্রভাব তার ছেদচিহ্ন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম ইংরেজী ভাষার ছেদ-চিহ্নগুলি বাংলাভাষায় প্রয়োগ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত পয়ারের মিলের জন্য এক দাঁড়ি বা দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষায় ইংরেজী ভাষার প্রায় সমস্ত ছেদ-চিহ্নগুলি ব্যবহার করিয়াছেন

যথা—'কমা', 'কোলন', 'সেমিকোলন', 'ড্যাস', 'উদ্ধৃতি-চিহ্ন' (ইনভার্টেড কমা), জিজ্ঞাসা চিহ্ন ও সম্বোধন চিহ্ন। বঙ্কিম-সাহিত্যে ইংরাজী ভাষার আর একটি প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম সর্বনামের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার ন্যায় করিয়াছেন, যথা—'যে তোমাকে দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে।' বঙ্কিমের পূর্বে এইভাবে সর্বনামের ব্যবহার বাংলাভাষায় ছিল না বলিলেই চলে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপর ইংরেজী ভাষা ও সভ্যতার প্রভাব লইয়া বঙ্কিম ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনের ভাদ্র সংখ্যায় 'বঙ্গে উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : 'শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজীতে চিন্তা করিয়া বাংলায় প্রকাশ করেন। ফলত বাংলার বর্তমান সাহিত্য ধুতিচাদরপরা ইংরাজ। ইংরেজী না জানিলে এখনকার বাংলা বুঝিয়া উঠা কঠিন।'

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বঙ্কিম যাহা বলিয়াছেন এক্ষণে তাহা বিচার করিয়া দেখা যাক। তিনি বলিয়াছেন ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি মতবাদ আছে। (১) অপৌরুষেয়বাদ, (২) সম্মতিবাদ এবং (৩) অণুকৃতিবাদ। বঙ্কিমের বিবেচনায় অপৌরুষেয়বাদীরা বলেন, ভাষা মনুষ্য নির্মিত নহে, উহা ঈশ্বর প্রাপ্ত। এই মতবাদ খণ্ডন করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ভাষা মনুষ্য চেষ্টাসঞ্জাত। সম্মতিবাদীরা বলেন যে কতিপয় লোক কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে একত্রিত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে সাধারণ কতিপয় পদার্থের কি নাম হইবে। বঙ্কিম এই মতবাদও খণ্ডন করিয়া বলেন যে ইহা ঐতিহাসিক সম্ভাবনা বহির্ভূত। অনুকৃতিবাদিগণের প্রস্তাব এই যে কোন বস্তু হইতে যে প্রকার শব্দ নির্গত হয়, অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আকস্মিক চিত্তাবেগবশত আমাদের মুখ হইতে যে স্বর স্বভাবত নির্গত হয়, সেইরূপ শব্দ ও স্বরের অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্কিমের সিদ্ধান্তে, যদ্যপি ইহা আপেক্ষিক সত্য এবং কিয়ৎ পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত, তথাপি ইহা ভাষার উৎপত্তির সমগ্র কারণ হইতে পারে না। এই সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া বঙ্কিম ফরাসী দার্শনিক 'অগস্ত কম্‌তে'র যুক্তি অবলম্বন করিয়া আরও বলিয়াছেন যে, এই তিন মতবাদ মানব ইতিহাসে জ্ঞানের তিনটি ক্রমকে নির্দেশ করে। সেই তিন ক্রম হইল, প্রথম প্রাকৃতিক কার্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মানুষ দৈবশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে; দ্বিতীয় অবস্থায় কারণ নির্দেশ করিবার প্রচেষ্টা করে এবং তৃতীয় অবস্থায় তত্ত্বগত নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করে।

ভাষা যে অপৌরুষেয় এই মতবাদ এত সহজে খণ্ডনীয় বলিয়া মনে হয়

না। অপৌরুষেয়—এই কথাটির সম্যক উপলব্ধি অনেক সময় হয় না। অপৌরুষেয় মানে ইহা নহে যে ভাষা ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ করে নাই। মূলত ভাবই ভাষা সৃষ্টি করে। তবে এই ভাব, অন্তঃপ্রকৃতির ভাব ও বহিঃপ্রকৃতির ভাব। মনুষ্য জাতির একটি স্বাভাবিক অন্তঃপ্রকৃতি আছে যাহার জন্য সেই স্বাভাবিক ভাব কতকগুলি স্বাভাবিক শব্দের সৃষ্টি করে যাহা সকল ভাষায়ই মূলত এক। তবে এই অন্তঃপ্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব ভাষার একমাত্র কারণ নহে। বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির যে সংঘর্ষ মানুষের জৈব অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে, তাহাও ভাষার উৎপত্তিকারক। প্রাকৃতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক ভাব সেইজন্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। জগতের কয়েকটি ভাষা মৌলিক ভাষা; যেমন, সংস্কৃত ও হিব্রু। সংস্কৃত ভাষা এমন এক ব্যাকরণ-দর্শন, শাশ্বত স্বর-বিজ্ঞান, বর্ণমালা ও শব্দ-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সে বিজ্ঞান ও দর্শন আজও অপরাজিত ও অপরাজেয়। এই মৌলিক ভাষা হইতে আবার দেশ কাল পাত্র ভেদে অগণিত বহু উপভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। মৌলিক ভাষার মৃত্যু নাই, তাহার জন্মান্তর আছে। ব্যক্ত ও অব্যক্তের, প্রকাশ ও অপ্রকাশের এক সেতু তাহার ভিতরে এক অখণ্ড ও অনবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ইহার এক অংশ জ্ঞাত, কিন্তু আর এক অংশ, যাহা বৃহত্তর অংশ, তাহা অজ্ঞাত ও অলক্ষ্য। ভাষা গোচর ও অগোচর মনের প্রকাশের তাড়নায় ও ভাব-সংঘর্ষে সৃষ্টি হইয়া থাকে। মন ও প্রাণের প্রথম সন্তান হইল বাক্য ও শব্দ এবং পরে ভাষা। ইহা যোগদর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, স্ফোটবাদ ও ন্যায়বৈশেষিকের কথা।

ইহা তো গেল সাধারণভাবে ভাষার উৎপত্তির কথা। এখন প্রশ্ন হইল এই যে বাংলাভাষার উৎপত্তি কোথায় ও কখন? বাংলাভাষার উৎপত্তি যে সংস্কৃত হইতে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সংস্কৃত বাংলাভাষার জননী। জননী ও পুত্রের ভিতর যত বৈষম্যই থাকুক, তাহাদের মধ্যে নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। বঙ্কিম এইদিকেও কিছু চিন্তাধারা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিম মনে করিতেন বাংলা ভাষার প্রাণ সংস্কৃত, যদিও সংস্কৃত হইতে তিনিই তাহার স্বাধীনতা প্রদান করেন। যে ক্ষেত্রে অন্য কোন ভাষা হইতে শব্দ চয়ন করিবার প্রয়োজন হইত, সে ক্ষেত্রে বঙ্কিম সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহার যুক্তিসমন্বিত অভিমত তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন :

প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী। ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও

তাহা পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত শব্দ লইলে বাংলার সহিত মিশে ভাল। বাংলার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃত হইতে গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে অনেকে বুঝিতে পারে। অতএব যেখানে বাংলা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলার বিভিন্ন পরিচ্ছেদের শীর্ষে, রঘুবংশ, শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত নাট্য ও কাব্যসাহিত্য হইতে যে সকল সংক্ষিপ্ত উক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা বঙ্কিমসাহিত্যে শুধু সংস্কৃত অলঙ্কার মাত্র নহে, বিষয়বস্তুর অনুপ্রেরণাও বটে। তাঁহার রাজসিংহ উপন্যাসের দুইটি অধ্যায় 'অরণ্যকাষ্ঠ-উর্বশী', 'অরনিকাষ্ঠ পুরুরবা' বঙ্কিমের সাহিত্য-শিল্পে সংস্কৃতের প্রেরণা ও তাহার প্রতি অনুরাগেরই পরিচয়। কমলাকান্তরূপে বঙ্কিমচন্দ্র এক জায়গায় বলিতেছেন :—

'সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন। বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আর কতকগুলি মনুষ্য লিচু, পেয়ারা, আনারস, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছে—বুঝিলাম ইহা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য।'

বাংলাভাষার উৎপত্তি কখন ও কোথায় এই প্রশ্নের পূর্ণ উত্তর এখনও দেওয়া হয় নাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা সম্ভবপর নহে। তবে তিনি দেখাইয়াছেন, যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গলিপি এক সহস্র বৎসরেরও অধিক পূর্ববর্তী। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তার' গ্রন্থে (The origin and development of the Bengali language) প্রথম পত্রেই লিখিয়াছেন যে বাংলাভাষা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাষারূপে প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া বর্তমান। তিনি আরও বলিয়াছেন যে আর্য ভাষা উত্তর ভারত হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পূর্বে বাংলায় কি ভাষা ছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাহাতে দ্রাবিড় ও আদিবাসীদের প্রভাব ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি কয়েকটি স্থানের নাম দিয়াছেন যথা—'জোড়া-শাঁকো', 'কলিকাতা' (কালীক্ষেত্র), 'নাড়াজোল', 'দোমজুড়' ইত্যাদি। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১০০০ খৃষ্টপূর্ব সময়ে বাঙ্গালীরা খুব সম্ভব আর্যভাষা-ভাষী ছিল না। পালী,

প্রাকৃত ও মাগধী ভাষা সম্বন্ধেও ডঃ চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার পরবর্তীকালে বহু নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার আলোকসম্পাতে বাংলাভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক মত বদলাইয়াছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে 'প্রাচীন সংস্কৃত হইতে প্রথমে পালী এবং প্রাকৃত ও পরে অপভ্রংশ, এই তিন ভাষার উৎপত্তি হয়। অপভ্রংশ হইতে বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।' তিনি দেখাইয়াছেন যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা আবিষ্কৃত নেপালে বৌদ্ধ চর্যাপদই সর্বপ্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন। তাঁহার মতে এই চর্যাপদগুলিই বাংলা সাহিত্য-প্রেরণার আদি উৎস এবং ইহারই প্রভাবে বাংলার সহজিয়া গান, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত ও বাউল গানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

'ললিতবিস্তরে' বুদ্ধদেব বঙ্গলিপি শিখিতেছেন ইহার উল্লেখ আছে। এই প্রমাণে বঙ্গলিপি বৌদ্ধযুগেরও পূর্বের ধরিতে হয়। বঙ্গাক্ষরমালার আদি জননী বলা হইয়াছে বহু প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বঙ্গাক্ষরের প্রাচীনতম রূপ এলাহাবাদ স্তম্ভে উৎকীর্ণ একটি অনুশাসন, যাহাতে হরিষেণ রচিত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের প্রশস্তি বর্ণিত হইয়াছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুশাসন এবং তাম্র ও শিলালিপির প্রমাণে দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ ও সপ্তম শতাব্দীর বঙ্গলিপির মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং তাঁহার উপরোক্ত গ্রন্থে তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরের চিত্র ও আলেখ্য দিয়াছেন। গুপ্ত যুগে উত্তর ভারতের পূর্বাংশে যে লিপি ব্যবহৃত হইত কালক্রমে তাহা নানাভাবে পরিবর্তিত হইয়া বর্তমান বঙ্গাক্ষরে রূপধারণ করিয়াছে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। একই লিপি কালক্রমে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। প্রতীচ্য অক্ষর ক্রমশ নাগরীর সহিত মিশিয়া প্রাদেশিক লিপির সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু প্রাচ্য লিপি ও অক্ষর তাহার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। এই স্থলে উৎকল ও অসমিয়া লিপির সহিত বাংলা লিপির সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন মৈথিলী ও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের প্রভেদ এত সামান্য ছিল যে চতুর্দশ শতাব্দীর লিখিত বাংলা ও মৈথিলী পুঁথির হস্তাক্ষর দেখিয়া সকলে উভয়ের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিতেন না। এমন কি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর নেপালী অক্ষরের সহিত সমসাময়িক বাংলা অক্ষরের বিশেষ সাদৃশ্য বর্তমান।

ললিতবিস্তরের প্রমাণের সাহায্যে ২২০০ বৎসর পূর্বেও যে বঙ্গাক্ষর প্রচলিত ছিল এবং তখন নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই অথবা কোন লিপি নাগরী নামাঙ্কিত হয় নাই—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেই কারণে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে মগধি ও মৈথিলী হইতেও বঙ্গলিপি অধিকতর প্রাচীন। প্রাকৃত ও পালীভাষা আলোচনা করিয়া ইহাই মনে হয় যে ইহাদের বিষয়বস্তু, শব্দপ্রয়োগ, বাক্যসংযোজনা ও ছন্দ বাংলাভাষা হইতে গৃহীত। এই যুক্তি অনুসারে আমার এই অনুমান ও সিদ্ধান্ত যে, প্রাকৃত বা পালীভাষা বাংলাভাষার পূর্ববর্তী নহে, পরবর্তী। বাংলার বহিরাগত লোকেরা সংস্কৃত-বহুল তদানীন্তন বাংলাভাষাকে এইভাবে পরিবর্তিত করিয়া তাহাদের নিজেদের ব্যবহারযোগ্য করিয়া নিয়াছিল। আর একটি যুক্তি যাহা আমার চিত্তাকর্ষণ করে তাহা এই যে, পূর্বভারতে যে বৌদ্ধ প্রভাব সম্ভব হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ তৎকালীন বাংলাভাষার সামর্থ্য ও ভাব বহনে সক্ষমতা। ধর্মবিস্তারে ও প্রচারে স্থানীয় ভাষার সাহায্য অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য। স্থানীয় ভাষা যত সক্ষম ও সবল হইবে ততই নবীন ভাবধারা গ্রহণে কৃতকার্য হইবে। বঙ্গদেশে ইংরাজ শাসনাধীনে ইংরেজী ভাষার প্রতিষ্ঠা—বাংলায় মুসলমান ধর্মের বিস্তার, বৌধ ধর্মের ও বৌদ্ধ তন্ত্রের ব্যাপক ও বিপুল প্রভাব তখনকার কালের বাংলাভাষার অস্তিত্ব, তাহার ঐশ্বর্য, সামর্থ্য ও ব্যবহারোপযোগিতা প্রমাণ করে।

সম্প্রতি ১৯৬২-৬৪ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে যে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবি' আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা শুধু বিস্ময়কর নহে, বাংলাভাষার ইতিহাসের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ইহা নূতন তথ্যের সন্ধান দেয় বলিয়া আমার অভিমত। বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমান্তে অবস্থিত অজয়, কনুর, ও কোপাই নদীর তীরবর্তী উপত্যকায় যে বিস্মৃত সভ্যতার আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করে যে বাংলা সভ্যতা ২০০০ খৃষ্টপূর্ব কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। বঙ্গরাষ্ট্রের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রকাশিত 'পাণ্ডুরাজার ঢিবির আবিষ্কার' পুস্তকে লিখিয়াছেন :

The proto-historic mounds of the Ajay Valley in Burdwan and Birbhum districts are now yielding evidence of a civilisation as early as the 2nd millenium B.C. when further it appears, Bengal had contacts with the Aegean coasts, perhaps, linked up by the

Gulf of Aguaba where Nelson Glueck has done his brilliant explorations revealing more accounts of the port of Ezion Geber wherefrom in the 10th Century B.C. Solomon and his Phoenician allies sent vessels to distant Ophir fascinatingly located in the remote corners of vast areas from Africa to Malay peninsula across the Bay of Bengal.

বাংলার এই সভ্যতা ধান্য কৃষিশিল্পের পরিচয় বহন করে, অর্ণব পোত গঠনের বার্তা বহন করে, আন্তর্জাতিক ব্যবসার অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং তাম্র ও মৃত্তিকার পাত্র ব্যবহারের জ্ঞানের পরিচয় দেয়। এই যে প্রাচীন বঙ্গীয় সভ্যতা, এত ব্যাপক যাহার বিস্তৃতি, সেই বাংলা সভ্যতার একটি ভাষা ছিল তাহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি। সে ভাষা ও তাহার অক্ষর লিপি আধুনিক বাংলাভাষার, অক্ষর লিপি ও শব্দ হইতে ভিন্ন হইলেও, তাহাই যে বাংলাভাষার উৎস ও উৎপত্তি তাহা মনে করা ভুল হইবে না। 'ওল্ড ইংলিশ্' বা 'চসারে'র ইংরাজী আধুনিক ইংরাজী হইতে অনেক পৃথক হইলেও তাহা যেমন এক ভাষা বলিতে আপত্তি নাই, যেমন বৈদিক, পৌরাণিক ও অন্যান্য যুগের সংস্কৃত ভাষার ভিতর শব্দে ও বাক্যযোজনায় বহু পার্থক্য থাকিলেও, তাহাকে সংস্কৃত ভাষা বলিতে কেহ আপত্তি করেন না, সেই রকম অজয় উপত্যকার ২০০০ খৃষ্টপূর্ব যুগের বাংলাভাষাকে বাংলা নামেই অভিহিত করা সমীচীন বলিয়া আমি মনে করি।

শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থে ১৭নং আলেখ্যে একটি প্রস্তর-খণ্ডের বর্ণনা আছে, যাহাতে ক্ষোদিত চিহ্ন ও লিখনাদি রহিয়াছে এবং যাহাকে বলা হইয়াছে 'লিনিয়ার এ লিপি' (Linear A Script)। বিশেষজ্ঞের মত হিসাবে এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে :

While the engraved hieroglyphs represent characters of Linear A script the pictographs are comparable with those of the phaestos Disc both obviously expressing the same proper name Aetea. According to Michael Ridley, the decipherment of the Seal of Aetea has in itself already resulted in the falling into place of a great deal of evidence which points to the possibility that the

inhabitants of Crete found their way to India 3500 years ago and traded with the people of Bengal.

সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে যে-বাংলাদেশ সুদূর ভূমধ্য সাগরতীরস্থিত দেশসমূহের সহিত ব্যবসা করিত, সেই বাংলার একটা ভাষা ছিল, ইহা সিদ্ধান্ত করা কি যুক্তিসংগত হইবে না? সে ভাষা বাংলাভাষা কারণ ইতিহাসে এখনও এমন কোন প্রমাণ নাই যে বাংলাভাষা অন্য কোন ঐতিহাসিক যুগে সহসা সৃষ্টি হইয়াছিল। 'পাণ্ডুরাজার ঢিবির' সর্বাধুনিক আবিষ্কার ইহাই প্রমাণ করে যে বাংলা ভাষা অন্তত ২২০০ বা ৩০০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। ইহা সম্ভব যে বাংলাভাষাই সংস্কৃত-জননীর প্রথম সন্তান।

এই স্থলে ইহা বলা প্রয়োজন যে, অনেকের মতে ভারতীয় যত প্রকারের বর্ণমালা আছে তাহা সবই ব্রাহ্মীলিপির পরিবর্তিত আকার। এই অভিমত নির্ভুল বলিয়া আমি মনে করি না। প্রশ্ন হইল এই যে, ব্রাহ্মীলিপির বর্ণমালাই বা কোথা হইতে আসিল? ইহা কি চিত্রলিপি ও ভাবলিপি হইতে উৎসারিত? কানিংহ্যাম প্রভৃতির মতে ব্রাহ্মীর 'ক' কর্তারিকা চিত্র হইতে, 'ধ' ধনুর চিত্র হইতে, 'র' রজ্জুর চিত্র হইতে, 'ব' বারিবেষ্টিত ভূমণ্ডলের চিত্র হইতে, 'গ' গগন হইতে, 'ত' তালপত্র হইতে, 'চ' চমসের চিত্র হইতে, 'ন' নাসা হইতে, 'ব' বীণা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে 'পাণ্ডুরাজার ঢিবির' আবিষ্কার গ্রন্থে ১৭নং আলেখ্যে প্রস্তর খণ্ডে যে চিহ্ন ও লিখনাদি আছে তাহা বাংলাভাষার দ্যোতক হইবে না কেন, ইহা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, ভাষাতত্ত্বরত্ন, তাঁহার 'ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ' গ্রন্থে ব্রাহ্মীলিপি সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন।

বর্তমান ঐতিহাসিক আবিষ্কার ও উপরোক্ত অন্যান্য যুক্তির আলোকে এ. এ. ম্যাকডনেল (A. A. Macdonell) বাংলাভাষার লিপি ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আধুনিক সময়ে আর সর্ববাদিসম্মত নহে। এই জন্যই বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, 'বাংলার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।' এই ইতিহাসের পথনির্দেশ বঙ্কিম দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথায় :

'যেমন কুলিমজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতিগণ সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমিও সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা

করিতাম।' বঙ্কিমের এই উক্তির একটি বিরাট তাৎপর্য আছে, প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া বঙ্কিমের বঙ্গভাষা সম্বন্ধে আলোচনা ও অবদান বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রত্নতাত্ত্বিক বিবিধ উপায়ে অতীতকে জানিবার চেষ্টা করেন। প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি, পুঁথি-পুস্তক, লিপি, লেখন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও তাহার ভগ্নাবশেষ, ভূগর্ভ হইতে খনিজ পদার্থ, শিলা ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়, উপকরণ ও মাধ্যম অবলম্বন করিয়া অতীতের ইতিহাস আবিষ্কারই হইতেছে প্রত্নতাত্ত্বিকের কর্মপ্রণালী। বঙ্কিম প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রন্থাদি, পুস্তক ও লিপির উপর তাঁহার বিভিন্ন প্রত্ন-তথ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার উদাহরণ বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'দ্রৌপদী', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম-শিল্পী', 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারত কলঙ্ক', 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার' এবং 'বাংলার ইতিহাস'। ইহার একটি বিশেষ উদাহরণ বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র'। ইহাতে তিনি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিয়াছেন। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিয়া বঙ্কিম নিপুণ যুক্তি ও বিচারের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক পুরুষ। বাংলাভাষার যথার্থ ইতিহাস লিখিতে হইলে এই বঙ্কিম প্রদর্শিত প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টি ও উপায় এক অভিনব দিক্‌দর্শন।

৪

॥ বঙ্কিম-সাহিত্য ॥

মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে সাহিত্য সৃষ্টি বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনার মূল উৎস ও আদর্শ হইল দুইটি। প্রথম আদর্শ—স্বদেশ, স্বজাতি ও ভারতীয় সমাজ। দ্বিতীয় আদর্শ হইল ধর্ম ও মানবতা। বঙ্কিম-সাহিত্য জীবনের সহিত সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত। যে-সাহিত্য স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম ও ভগবানকে বাহিরে রাখে, তাহা বঙ্কিম-সাহিত্যের আদর্শ নহে। সাহিত্য শুধু কথার সৌন্দর্য নহে, ইহা জীবনসৌন্দর্য। সেই সৌন্দর্য সাহিত্যে প্রতিফলিত করিতে হইলে জীবনের এক সমগ্র-দৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত সৃজনীশক্তির প্রয়োজন। সেই সমগ্র দৃষ্টি রাখিতে হইলে, যাহা দেশ কাল পাত্র ভেদের অতীত তাহার সহিত সংযোগ রাখিতে হইবে, কারণ সেই সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিবর্তনশীল চরিত্র, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির যথার্থ স্বরূপ ও সার্থকতা প্রকাশ পায়। সেই সার্থকতার নির্দেশ ও অনুশীলনই নিত্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু। সেইজন্য মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিম বরণে' বলিয়াছেন, 'বঙ্কিমের প্রতিভায় আমরা ইহাই লক্ষ্য করি : যাহা সর্বকালাতীত, যাহা নিত্য ও শাশ্বত, তাহাকে তিনি কখনই ভুল করেন নাই. কিন্তু তাহাকে দেশ কালের ইতিহাসের মধ্যে মূর্তি ধরিতে দেখিয়াছিলেন।' সমগ্র মানব-জীবনের ও সমগ্র জাতির পাথেয়, বঙ্কিম-সাহিত্য জগতের নিকট পরিবেশন করিয়াছে। সে-সাহিত্যে যেমন সৌন্দর্য আছে, সুন্দরের উপাসনা আছে, তেমনি তাহা কেবলমাত্র সৌন্দর্যপিপাসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত বা সৃষ্ট হয় নাই। বঙ্কিমের সাধনা ও উপাস্য পূর্ণ মানবজীবন; যাহাতে আদর্শ আছে, আদর্শচ্যুতির ফল আছে, ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান আছে, রস-সৌন্দর্য আছে; আর আছে জীবনের সকল উপকরণ—বিশ্বাস, অবিশ্বাস, ভগবান, প্রকৃতি, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রচিন্তা। রবীন্দ্রনাথের কথায় সাহিত্যের মধ্যে দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়। জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী। বঙ্কিম সাহিত্যের কর্মযোগী।'

রস, সৌন্দর্য ও আদর্শের এই সমন্বয় বঙ্কিম-সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ। একটি উদাহরণ দিলে এই বিষয়ে বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে। উদাহরণটি যৌবন

ও রূপ লইয়া। যৌবন ও রূপ জগতের প্রত্যেক সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই বিষয় বঙ্কিম কিভাবে বর্ণনা করিতেছেন তাহা দেখিলে তাঁহার সাহিত্যের আদর্শ রূপ ও গতি বুঝা যাইবে। 'রজনী' উপন্যাসে বয়ঃসন্ধির বিষয়ে অমরনাথ লবঙ্গের বর্ণনা করিতেছে :

লবঙ্গ কলিকা ফোট ফোট হইয়াছিল, চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল। উচ্চ হাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া রূপ ধরিয়াছিল, দ্রুতগতি মন্থর হইয়া আসিয়াছিল। আমি মনে করিতাম এমন সৌন্দর্য কখনও দেখি নাই; এ সৌন্দর্য যুবতীর অদৃষ্টে কখনও ঘটে নাই। বস্তুতঃ অতীত-শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনের সৌন্দর্য এবং অস্ফুট-বাক্ শিশুর সৌন্দর্য ইহাই মনোহর। যৌবনের সৌন্দর্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসনভূষণের ঘটা, হাসিচাহনির ঘটা, বেণীর দোলানী, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলানি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারী। আর আমরা যে চক্ষে সৌন্দর্য দেখি তাহাও বিকৃতি। যে সৌন্দর্যের উপভোগ ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।

এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে বঙ্কিমের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা যায়—সাহিত্যিকের রসজ্ঞ দৃষ্টি, তীক্ষ্ন ও সর্বদ্রষ্টা, প্রকাশ করিবার অতুলনীয় ভঙ্গী ও কৌশল, ভাষার নিপুণ অথচ অকুণ্ঠ ব্যবহার, অভাবনীয় বাক্যসংযম এবং সর্বোপরি যথার্থ সৌন্দর্য ও রসবোধের শাশ্বত আদর্শ, শান্ত অথচ মনোহর।

বঙ্কিম বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না; কারণ তাঁহার পূর্বেই বাংলা গদ্য সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, বঙ্কিম আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা। সংস্কৃত ভাষার দাসত্ব হইতে তিনি বাংলাকে মুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু সংস্কৃত ভাষার প্রাণের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন করেন নাই। তিনি একাধারে বঙ্গসাহিত্যের সৃষ্টিকর্তা ও সংস্কারক। সেইজন্য বঙ্কিমকে বহু বাধা বিঘ্ন ও সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১১ই বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' সমালোচনায় বলা হইয়াছিল যে, 'বিষবৃক্ষের স্থানে স্থানে গুরুসাহেবী বাংলা ব্যবহৃত হইয়াছে। হাসিতেছে, ছুটিতেছে, নাচিতেছে, ঠেঙ্গাইতেছে পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। এবম্বিধ পদ্ধতি অবলম্বন—মাতৃভাষার হন্তাভিন্ন আর সম্ভব কোথায়?' এই যে ক্রিয়া ব্যবহারে সরলতা ও স্বাধীনতা,

যাহা আধুনিক বাংলার স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অংগ, বংগসাহিত্যে ইহাই বঙ্কিমের একটি শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার আর একটি অবদান, বংগসাহিত্যে এক নূতন শ্লীলতা বোধ। বঙ্কিম পূর্ব যুগে অনেকে বংগসাহিত্যে মার্জিত রুচির অভাব বোধ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমের সাহিত্য নূতন পথ প্রদর্শন করিল। সাহিত্যে শ্লীলতা লইয়া বহু গবেষণা ও সমালোচনা সকল দেশের সাহিত্যেই চলিয়া আসিতেছে। যথার্থ সাহিত্যকে বিরাট হইতে হইবে এবং সকল বিষয়ের দ্রষ্টা হইতে হইবে। শালীনতা ও শ্লীলতার সংকীর্ণ গন্ডী-দিয়া তাহাকে সীমিত করিলে সাহিত্য ও জীবন দুই-ই বিচ্ছিন্ন হইবে। যে-সাহিত্য বাস্তব জীবনের বহু সত্য পরিহার করে, তাহা দুর্বল ও কৃত্রিম হইতে বাধ্য। তবে তাই বলিয়া জীবনকে যাহা নিম্নগামী করে এবং আদর্শ হইতে বিচ্যুত করে, শ্লীলতার সেরূপ বাধাহীন ব্যবহার মার্জনীয় নহে। শ্লীল ও অশ্লীলের মাঝে কোথায় যে সীমারেখা দিতে হইবে তাহা যথার্থ সাহিত্যিক নিজের নিষ্ঠা ও সাধনায় নির্ণয় করিবেন—ইহাই সাহিত্যের স্বাধীনতা। বঙ্কিমচন্দ্র এই সীমা অপূর্বভাবে তাঁহার সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যদিও আজ আর কেহ বলিবে না যে বঙ্কিম-সাহিত্য মার্জিত নহে বা অশ্লীলতাদুষ্ট, কিন্তু তাঁহার সময়ে বঙ্কিমকে এ বিষয়ে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্কিম-সাহিত্য ও ভাষাকে 'আলালীর' ভাষা ও সাহিত্যের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া বলিয়াছেন :

> হুতুম পেঁচা বল, মৃণালিনী বল, পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি কিন্তু পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই এসকল পড়িতে পারি না, বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারার কারণ নহে। ঐ ভাষারই এমন একরকম ভংগী আছে যাহা গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়।

এই সমালোচনার ভ্রম এইখানে যে পিতাপুত্রে একসংগে পড়িতে পারা সাহিত্যের একমাত্র মানদন্ড বা লক্ষ্য নহে। গুরুজন সমক্ষে উচ্চারণ করিতে পারাই সাহিত্যের উৎকর্ষতার একমাত্র প্রমাণ নহে। সাহিত্যের ক্ষেত্র পিতাপুত্র বা গুরুজন সম্বন্ধের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সাহিত্য মানুষের সমগ্র জীবন লইয়া। পিতার সহিত কথা বলিবার ভাষা আর পত্নীর সহিত কথা বলিবার ভাষা পৃথক বলিয়া, একটি সাহিত্য আর অন্যটি সাহিত্য নহে, ইহা বলা সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করা।

বঙ্কিম-সাহিত্যে কথ্য ও লিখিত ভাষার এক বিতর্কমূলক অধ্যায়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কথ্য এবং লিখিত বাংলাভাষার উপর এক সমালোচনায় বলেন যে, বঙ্কিম 'বহুবচন' ইঙ্গিত করিবার জন্য 'গণ' কথার বিরোধী, তিনি বাংলা-সাহিত্যে ও ভাষায় লিঙ্গভেদ মানিতে অসম্মত, তিনি সংস্কৃত সংখ্যাজ্ঞাপক কথা—যথা, একাদশ, চত্বারিংশত ইত্যাদি ব্যবহার অসঙ্গত মনে করিতেন এবং শুদ্ধ কথা—যথা, ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, স্বর্ণ, তাম্র, পত্র ইত্যাদি ব্যবহার না করিয়া ভাই, কাল, কান, সোনা, তামা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্কিম এই বিষয়ে যে সাহিত্যিক উদারতা দেখাইয়াছিলেন তাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নূতন প্রাণ পাইয়াছিল। জোর করিয়া শুদ্ধ কথার প্রয়োগকে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন সাহিত্যে 'দৌরাত্ম্য'।

এই বিষয়ে বঙ্কিমের অভিমত তিনি তাঁহার নিজের কথায় এইভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন :

> এক্ষণে 'বামুন' যেমন প্রচলিত সেইরকম 'ব্রাহ্মণ'ও প্রচলিত। 'পাতা' যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। 'ভাই' যেরূপ প্রচলিত, 'ভ্রাতা' ততদূর না হউক প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই, উচ্ছেদও সম্ভব নহে। কেহ যত্ন করিয়া 'মাতা', 'পিতা', 'ভ্রাতা', 'গৃহ' বা 'তাম্র' ইত্যাদি শব্দ বাংলাভাষা হইতে বহিস্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিস্কৃত করিয়াই বা ফল কি? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্যা হইবে মাত্র। নিষ্কারণে ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।

খাঁটী বাংলা, বঙ্কিমের মতে, যাহা প্রাণে প্রবেশ করে। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে এক জায়গায় বঙ্কিম যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্কিমের বাংলা সাহিত্য কি, এবং সে সাহিত্য কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। বঙ্কিম লিখিয়াছেন :

'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিতেন, এমন খাঁটী বাংলায় বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই। তাহাতে সংস্কৃত-জনিত কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর কোন বিকার নাই, পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই, বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।' বঙ্কিম-সাহিত্যের আদর্শও এই যে তাহা প্রাণ স্পর্শ করে।

বঙ্গসাহিত্যকে বঙ্কিম আর এক চূড়ান্ত সমৃদ্ধি ও সক্রিয়তা দিয়াছিলেন। তাহা এই যে, বিষয় অনুযায়ী ভাষার পরিবর্তন। বঙ্কিমপূর্ব যুগে ইহার নিতান্ত অভাব ছিল। বিষয় যাহাই হউক না কেন, তখন ভাষার তারতম্য হইত না। সাহিত্য তখনই উপযুক্ত হয় যখন ভাব ও ভাষার আলোড়নে সাহিত্য নব নব রূপ ধারণ করে। বৈচিত্র্য যেমন সৃষ্টির প্রাণ, তেমনি বৈচিত্র্য সাহিত্যের প্রাণ। বঙ্কিম নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁহার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন :

বিষয় অনুসারে রচনায় ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য। সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। যদি সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

কিন্তু বঙ্কিম এই বিষয়ে সাহিত্যিকগণকে সাবধানও করিয়াছেন। নিষ্প্রয়োজনে সরল বাংলা ভাষাকে ত্যাগ করার বিপক্ষে বঙ্কিম তাঁহার তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন :

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে তাঁহাদের অতি সুদীর্ঘ-কুসুমসকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলায় কণ্টকময় ধুতুরা। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতুরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতুরা বীচি সাজিয়া দেয়। যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা হয় না, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতুরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধহয় সেই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধ মধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে দুই চারিটি বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতুরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে।

বিষয় অনুযায়ী ভাষার পরিবর্তন বঙ্কিম-সাহিত্যশৈলীর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমই ইহার প্রথম পথপ্রদর্শক। কখনও গুরুগম্ভীর, কখনও চপল, কখনও সরল, কখনও কুটিল, কখনও আনন্দোচ্ছল, কখনও বিষাদ-ভারাক্রান্ত, কখনও হাস্যকৌতুকময়, কখনও বিদ্রূপভঙ্গী, কখনও উপদেষ্টা, কখনও সংস্কৃতবহুল আবার কখনও কথ্য—ইহার দ্বারা বঙ্কিম দেখাইয়াছেন, ভাষার রঙ্ কিভাবে বিষয় ও ভাবের রঙের সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবন্ত

সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে। ইহাতে বাংলাভাষার শিল্পচাতুর্য, কর্মপটুতা ও বৈচিত্র্য এমন বর্ধিত হইয়াছিল যে, বঙ্গসাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি প্রথম বলা যাইতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের অলঙ্কার প্রয়োগের কৌশল অতি অভিনব। বাংলা গদ্য সাহিত্যে অলঙ্কার প্রয়োগের পথ বঙ্কিমই প্রথম খুলিয়া দিয়াছিলেন। উপাখ্যান বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন বিশিষ্ট ভাবকে বাক্য-বৈচিত্র্যের দ্বারা এমন সুন্দর রূপ দান করিতেন যে, এই কৌশল বঙ্কিমের পূর্বে বাংলা-ভাষায় কেহ প্রয়োগ করেন নাই। এ বিষয়ে সাহিত্যে তিনি নূতন পথের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শব্দ চয়নের শিল্প ও বাক্য-বৈচিত্র্যের সমাবেশ—এই উভয় মাধ্যমের দ্বারা বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের রূপ আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে কাহিনী, কথাশিল্প ও উপন্যাসে বঙ্কিম প্রথম সারথি। বিশেষ করিয়া ব্যাপকভাবে সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র ও ইতিহাসের চিত্র অংকনে। বাংলা সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালীর জীবন, ধর্ম ও ইতিহাস এক করিবার পথ-প্রদর্শক বঙ্কিম।

সাহিত্য শুধুই সাহিত্যের জন্য অথবা সাহিত্য উপায় না উপেয়, ইহা লইয়া বহু অনর্থক তর্ক জগতে হইয়া গিয়াছে, আজও হইতেছে। সে তর্কযুদ্ধের ভিতর প্রবেশ না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে বঙ্কিম-সাহিত্য উপায়, উপেয় নহে। বঙ্কিমের নিকট সাহিত্য ও জীবন এক। সুতরাং বঙ্কিম বলিয়াছেন 'যদি মনে বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' কিন্তু, একথা কে বলিতে পারে? শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তিনি, যিনি তাঁহার সাহিত্যের চেয়ে বড়। যখন সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তার চেয়ে বড় হইয়া উঠে, তখন গড়িয়া উঠে এক কৃত্রিম সাহিত্য ও এক বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা। বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্য বা উপন্যাসের চেয়ে বিরাট। প্রকৃত শিল্পী শিল্পের চেয়ে বড়। শিল্পী-বঙ্কিমের চেয়ে বড় ছিলেন বঙ্কিম নিজে, তাঁহার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বে। পৌরুষ ও তেজস্বিতা বঙ্কিম-সাহিত্যের একটি প্রধান পরিচয়।

বঙ্কিম-সাহিত্য বহুমুখী। ইহার ভিতর উপন্যাস-সাহিত্য, রচনা-সাহিত্য, ধর্ম-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্য অন্যতম। বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতিটি বিশেষ সৃষ্টির বিশিষ্ট লক্ষণ আছে। বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যের প্রধান ভাবগ্রন্থি পুরুষ-প্রকৃতির প্রেম। পুরুষ প্রকৃতি জয় করিবে প্রকৃতির সাহায্যে, তাহাকে

অবজ্ঞা বা অবহেলা করিয়া নহে। ইহাকে কোন কোন সাহিত্যিক আখ্যা দিয়াছেন বঙ্কিম-সাহিত্যের 'তন্ত্র' বলিয়া। শৈবলিনীর প্রতাপ সেই কারণে জীবন্মুক্ত সিদ্ধপুরুষ এবং মায়া তাহার নিকট নিরস্ত কিন্তু তাহাকে পরাজিত করিয়া নহে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া।

বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বঙ্কিম কবি। কবি তিনি, যিনি ভাবস্রষ্টা। কবি তিনি, যিনি তাঁহার সৃষ্টির ভিতর আত্মপ্রতিবিম্ব দেখেন। তিনি কি ছন্দে তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছেন, কাব্য ছন্দে না গদ্য ছন্দে—তাহা মুখ্য নহে। এমন অনেক কাব্য আছে যাহা গদ্যের রূপান্তর, আবার এমন অনেক গদ্য আছে যাহা প্রকৃতপক্ষে কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র সেই গদ্যের কবি, বিশেষ করিয়া তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যে। কবিতা লেখার মানদণ্ড দিয়া বঙ্কিমকে কবি বলিতেছি না। অবশ্য বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রথম প্রচেষ্টা কাব্যের ভিতর দিয়া সুরু হইয়াছিল। তবে সে কাব্য তাঁহার অতি অল্পবয়সে কৈশোরে রচিত। সে কবিতা যৌন আকর্ষণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, অলঙ্কার বিড়ম্বিত ও অকালপক্ক। নায়িকারূপে নারীর প্রতি যে আসক্তি, তাহা বঙ্কিমের কিশোরবয়সের কাব্যের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্যশিল্প পরে তাঁহার পরিণত বয়সের উপন্যাস-সাহিত্যের ভিতরেও প্রকাশ পাইয়াছে। বঙ্কিমের এই কাব্যশিল্পের পরিচয় নিম্নলিখিত বঙ্কিম-গদ্যে সুন্দরভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে :

> রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিতনীল বিচিত্র প্রজাপতির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনীশাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি? রূপও মোহের জন্য হইয়াছিল। গোবিন্দলাল প্রথম এইরূপ ভাবিলেন। পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।

বঙ্কিম-সাহিত্যে কাব্য-শিল্পের আলোচনায় তাঁহার বাল্যরচনার কাব্যছন্দের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাঁহার প্রথম কবিতা 'প্রভাকরে' প্রকাশিত, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

স্ত্রী :

হইয়াছে জল, বড়ই শীতল
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়,
আগে যে জীবন, জুড়াত জীবন
সে বন এখন নাহিক সয়।

এখানে জীবন ও বন অর্থে জল।

পতি :

বিবেচনা করি তোরে প্রাণেশ্বরী
বলি ত্রিপুরারি প্রলাপ নয়।
হরের ভূষণ সব বিলক্ষণ
তোমার অঙ্গেতে তুলনা হয়।
হরের ইন্দুর সমান সিন্দুর
শিরে লো তোমার কি শোভা পায়।
সদা শিরোপরি আছ সিঁথিপরি
তিন ধারা ধরি গঙ্গা খেলায়।
স্কন্ধ শিরোপরি হরের বিহরে
সদা ফণিবরে ভীষণ অতি।
সেই মত হরে কণ্ঠে বিষ ধরে
তেমতি গরল তুমিও ধর
কিন্তু কণ্ঠে নয় কিছু আধো রয়
বিশেষিয়া বলি ও পয়োধর।
সে গরল হরে কণ্ঠ দেশে ধরে
কাছে না এলে সে নাশিতে নারে।
কিন্তু পয়োধরে সে গরল ধরে
দূর হইতেই মানব মারে।

বঙ্কিমের এইসকল কাব্য-প্রচেষ্টা ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত। তাঁহার ১৪ বৎসর বয়সের গদ্য রচনাতেও এই কাব্যরস ও কাব্যশিল্পের ইঙ্গিত আছে। যথা :

যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবে। যে নাসিকাস্থলে চন্দনও বন্দনা পায় না, সে নাসিকা দুর্গন্ধ কীটাদি এবং গলিত শব মাংসের ঘ্রাণ গ্রহণে বাধ্য হইবেক। যে শ্রবণ কামিনী কাকলী শ্রবণে সন্তোষ প্রাপ্ত হয়না, সে শ্রবণ শিবাগণের চীৎকার শ্রবণ করিতে বাধ্য হইবেক। দিবাকর কর প্রকাশে মধুকর নিকর যে করে কমলিনী ভ্রমে মকরন্দ লোভে ভ্রমিত, সে কর কদর্য কীট-নিকরে ব্যাপ্ত হইবেক। যে পদ কখনও বিপদগ্রস্ত হয় নাই, এবং যে পদ কখনও সমপদ সংরক্ষণে

ও ধূলিসহ সাক্ষাৎ করে নাই, সে পদ স্বপদ পরিত্যাগ করিয়া পুরঃসর ধূলি হইয়া যাইবেক। অতএব হে মানবগণ, অনিত্য যত্নে ক্ষান্ত হও।

'প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্ত ইহার উপর টিপ্পনী দিয়া বঙ্কিমকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন, 'ইঁহার লিপি নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইলাম কিন্তু অভিধানের উপর যেন অধিক নির্ভর না করেন।'

বঙ্কিমের বাল্যাবস্থায় কবির লড়াইয়ের কথা আগেই বলিয়াছি। চট্টো কবি বঙ্কিম কবির লড়াইয়েতে বলিয়াছেন :

'তাই তাই তাই বটে, অতি সুখময়
এমন কবিতা আর হইবার নহে।'

'জান, কেন অধিকারী কবিতা মাঝারে
মোরে আদি কবি বলে, দ্বিতীয় তোমারে।'

পূর্বেই তাঁহার 'ললিতা' ও 'মানস' কাব্যের উল্লেখ হইয়াছে। ললিতার স্থানে স্থানে বিদেশীভাব আছে কিন্তু মানসে তাহা নাই। ভাষা ও ভাবের জন্য বঙ্কিম তখন মনের সহিত লড়াই করিতেছেন। 'ললিতা'য় ঝড়ের বর্ণনা এইরূপ :

গভীর জলদনাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর
হুঙ্কারে গরজে প্রাণে প্রাণে।

এইকালের রচনার দ্বারা বঙ্কিম-সাহিত্যপ্রতিভার উন্মেষ লক্ষ্য করা সুকঠিন। বঙ্কিমের পয়ার, ত্রিপদী ও চৌপদী কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণা ও প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়, যদিও তাহাকে অনুকরণ বলা ঠিক হইবে না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ললিতা ও মানস প্রকাশিত হইবার পর বঙ্কিম কাব্য লেখা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি ইহার পরেও উপন্যাসে দু-একটি কাব্যছন্দ এবং মাঝে মাঝে বঙ্গদর্শনে রসাত্মক কবিতা তিনি লিখিয়াছেন।

যদিও তিনি কাব্যরচনা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি এ কথা স্মরণ

রাখিতে হইবে যে বঙ্কিমের কবি-প্রকৃতি চিরদিনই অম্লান ছিল এবং পরিণত বয়সে তাঁহার সাহিত্যের ভিতরে ইহার পরিচয় বহুক্ষেত্রেই পাওয়া যাইবে। প্রতাপের সেই বিখ্যাত উক্তি 'কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী, এ ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।' এই আত্মত্যাগ বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রেমের মন্ত্র। রূপ, মোহ, সৌন্দর্যপিপাসা, দাম্পত্যপ্রেম, নারীচরিত্র, পুরুষের প্রকৃতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, স্বদেশপ্রেম, ভগবদ্‌প্রেম, বৃত্তি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থানকে বিষয় করিয়া এক অপরূপ কবিশিল্পীর বহু ভাব ও বহু বর্ণ সংলেপন বঙ্কিম-সাহিত্য ও গদ্যরচনাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময় গ্রহণ করা হয়, যাহা বৈদেশিক সাহিত্য সমালোচনা-রীতির অনুকরণ। বহু সাহিত্যিক অনেক সময় বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া 'ক্লাসিক্যাল' এবং 'রোম্যাণ্টিক' সাহিত্যবিভাগ করিয়া থাকেন। 'ক্ল্যাসিক্যাল' বলিতে যদি বুঝি সেই সাহিত্য যাহা সনাতন শাশ্বত জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুসরণ করে, আর যদি 'রোম্যাণ্টিক' বলিতে বুঝি, সেই সাহিত্য যাহা গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন প্রেরণার প্রকাশ, তাহা হইলে এই বিভাগে কোন আপত্তি নাই। কারণ এই ভেদ সমস্ত মানুষের মনে ও কল্পনায়ই রহিয়াছে, দেশী বা বিদেশী বিভাগ মাত্র নহে। 'ক্ল্যাসিক' তাহাকে বলিব যে-সাহিত্য জীবনের অঙ্গ এবং 'রোম্যাণ্টিক' তাহাকে বলিব যে-সাহিত্য জীবনের অলঙ্কার। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 'রোম্যাণ্টিক' লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার উপন্যাসগুলি এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 'রোম্যাণ্টিক' কাব্য ও 'রোম্যাণ্টিক' কল্পনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এমনকি তিনি বলিয়াছেন যে, বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্য সেক্সপীয়রের 'ট্র্যাজেডির' সহিত তুলনীয়। তবে এই তুলনা সম্পূর্ণ নহে, ইহা তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের মতে পাশ্চাত্য 'ট্র্যাজেডি'তে যে-প্রকৃতির উপাসনা আছে তাহার সম্মুখে শিব নাই, বঙ্কিমের প্রকৃতি মোহিনী হইলেও বরদাত্রী, তিনি শিবানী। সেক্সপীয়রের 'ট্র্যাজেডি'তে প্রকৃতিকে শুধু মোহিনী ও শিবহীন বলা হয়ত পক্ষপাতিত্ব দোষ হইবে। কারণ, কোন মহৎ সাহিত্যে কখনও তাহা আদর্শ হইতে পারে না। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'ক্ল্যাসিক' এবং 'রোম্যাণ্টিক' বিভাগ ভারতীয় সাহিত্যে স্থূলভাবে প্রয়োগ করা চলে না; কারণ ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাব ভারতীয় সাহিত্য হইতে বাদ দেওয়া চলে না, বিশেষ করিয়া বঙ্কিম-সাহিত্যে। ভারতীয় সভ্যতা ও

ভারতীয় ধর্ম নিছক 'ট্র্যাজেডি' বলিয়া কিছু স্বীকার করে না। সেই প্রভাব অল্পবিস্তর ভারতীয় সকল সাহিত্যেই বর্তমান।

প্রত্যেক সাহিত্যিকের এক বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতি, শব্দ ও ভাষাকৌশল ও ছন্দ আছে যাহা তাহার ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে এবং তাহার পরিচয় বহন করে। ভাবদেহ ও ভাষাদেহ প্রতি মানুষের ও প্রতি সাহিত্যিকের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। বঙ্কিম-সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ বঙ্কিমের পৌরুষ। তাহাকে প্রতিভার পৌরুষ বলি, বা চরিত্রের পৌরুষ বলি, তাহার ছাপ বঙ্কিম-সাহিত্যে সর্বদাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে পৌরুষ সমস্ত সাময়িক ও পারিপার্শ্বিক বাধা অতিক্রম করিয়া বঙ্কিম-সাহিত্যকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই কারণে আজও বঙ্কিম-সাহিত্য এত মর্মস্পর্শী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্কিম-সাহিত্যে ও রচনায় বাক্যবাহুল্য নাই, অসংযম নাই, বিশৃঙ্খলা নাই এবং সেইজন্য ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তাঁহার কোন উপন্যাসের বা রচনার কলেবর দীর্ঘ বা দীর্ঘসূত্রী নহে। তাঁহার সাহিত্যে গভীরতা আছে, কিন্তু আতিশয্য নাই, গতি আছে, চপলতা নাই। বহু দিক্-দর্শন আছে কিন্তু কোথাও দিশাহারা ভাব নাই। ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় ইতিহাস এবং ভারতীয় সাধনা বঙ্কিম-সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রস্ফুটিত, সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায়ই হউক, বা মনুষ্যচরিত্র বিশ্লেষণেই হউক, বা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র আলোচনায়ই হউক।

সাহিত্য নীতিমূলক হইবে কি না ইহা লইয়া বহু দেশে, বহু সাহিত্যে ও বহু সময়ে অনেক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং আজও হইতেছে। নীতি ও সাহিত্যের যে অনর্থক বিবাদ বিজাতীয় সাহিত্যে দেখা যায়, সে বিবাদ আধুনিক কালে এই দেশে কিয়দংশে দেখা দিলেও, তাহা ভারতের নিকট গ্রাহ্য হয় নাই এবং বঙ্কিম-সাহিত্য সে বিবাদে অংশ গ্রহণ করে নাই। শুধু তাহাই নহে, নীতিসম্বলিত সাহিত্য যে রসবোধ ও রসকৌশল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে বঙ্কিম-সাহিত্য তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। সাহিত্য শুধু রসাত্মক বলিলে সাহিত্যের সীমা ক্ষুদ্র করা হয়। তবে সে রস যদি বেদ উপনিষদের 'রসঃ বৈ সঃ' হয় তাহা হইলে ইহা তো সর্বব্যাপী, সমগ্র সাহিত্যকে তা অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু, সাধারণ বিতর্কে সাহিত্যকে যাঁহারা শুধু রসাত্মক বলিতে চাহেন তাঁহারা এইভাবে রসের সাধনা করেন না। বঙ্কিম-সাহিত্য যথার্থ 'রসঃ বৈ সঃ'। সেইজন্য বঙ্কিম-সাহিত্য ক্ষুদ্র দৃষ্টির 'বাস্তবতা' নহে।

সে বাস্তবতায় প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ, দুয়েরই স্থান আছে, স্থূল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়, দুইটি জগতই বর্তমান, বাস্তব যেমন আছে তেমনি কল্পনার বাস্তবতাও আছে। ইহার উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ। বাস্তব ও কাল্পনিক সাহিত্য লইয়া যে মতভেদ আছে তাহার বিরাট সমন্বয় বঙ্কিম-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিম-সাহিত্যের এই সমন্বয় অতি অল্প সাহিত্যে দেখা যায় এবং বঙ্কিম যেভাবে সেই সমন্বয়কে সাহিত্যে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও যেমন অতুলনীয় তেমনি অভিনব। এই সমন্বয় একীকরণ নহে। ইহা কেবল বিচ্ছিন্ন ভাবের ও রূপের সমাবেশ নহে। এমন কি ইহা কেবল দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও কাল্পনিক বিলাস নহে। ইহাতে সৃষ্টির লীলাবৈচিত্র্য সাহিত্যে রূপায়িত। এই লীলাবোধ সকল বৈচিত্র্যের ও বৈষম্যের ভিতর বঙ্কিম-সাহিত্যকে চিরকালের জন্য অমরত্ব দান করিয়াছে। সেই জন্য প্রেমের কথা বলিতে গিয়া তিনি "অনাসক্ত" প্রেমের কথা বলেন নাই, কর্মের কথা বলিতে গিয়া শুধু কেবল কল্পনাশ্রিত 'নিষ্কাম' কর্মের কথা বলেন নাই। স্বর্গের কথা বলিতে গিয়া তিনি মর্ত্যের কথা ভুলেন নাই, সংসার ও রাষ্ট্রের কথা বলিতে গিয়া সংসারাতীত ও রাষ্ট্রাতীত মানবতার কথা ভুলেন নাই। মোহিতলাল মজুমদার 'বঙ্কিম প্রতিভার মহত্ত্ব-বিচার' প্রসঙ্গে সেইজন্য বলিয়াছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন—আধুনিক যুগের পুরাণ। তাঁহার সেই নব-মহাভারতও আদি-মহাভারতের মতন একাধারে ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও মানবজীবনের কাব্য। এই মহাভারতের কৃষ্ণ পূর্ণ মানব অবতার। সেই অবতারবাদ দেবতার অবতরণ নয়, মানুষেরই দেবত্বে আরোহণ—প্রকৃতির সাহায্যেই পুরুষ কর্তৃক প্রকৃতি জয়।'

বঙ্কিমের ধর্ম-জিজ্ঞাসা বিশেষ অধ্যায়ে আলোচনা করিব। এইস্থলে কেবল তাঁহার ধর্মসাহিত্যের সাহিত্য-বৈশিষ্ট্যের উল্লেখমাত্র করিব। হিন্দু-ধর্মের মূল কথাগুলি বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। সরল কথায় বঙ্কিম প্রথম প্রকাশ করিলেন যথার্থ ধর্ম কি, তাহার প্রকৃত অনুষ্ঠান কি, আচার কতখানি ধর্মের অঙ্গ এবং মানুষের জীবনের সহিত ধর্ম কিভাবে সার্থকতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার ধর্ম-চিন্তার প্রকৃত রূপ নিম্নলিখিত উদাহরণটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে :

ইন্দ্রিয় সংযম অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ কথা। চিত্তশুদ্ধি তাহা অপেক্ষা গুরুতর লক্ষণ।

ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমার গুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা আমাদের মনে বড় প্রবল। আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই, আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। সেজন্য না করেন এমন কাজ নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষা এই আত্মাদর, এই স্বার্থপরতা চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন।

উক্ত উদাহরণ দিবার উদ্দেশ্য এই যে সরল ভাষায় বঙ্কিমের ধর্মসাহিত্য ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে প্রকৃত ধর্ম কি, ইন্দ্রিয় সংযমের প্রধান উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি এবং সেই চিত্তশুদ্ধি যদি না হয়, তাহা হইলে যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান হইল না এবং তাহাতে ধর্ম হয় না, ধর্মের ভণ্ডামি হয়। এইভাবে ধর্মের বিশ্লেষণ ও আলোচনা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের পূর্বে কেহ করেন নাই। যে অংশ হইতে তাহার বেশীর ভাগ পুরাণের গল্প গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সকল পৌরাণিক কাহিনীর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মে কুসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বঙ্কিমের এই ধর্মচিন্তা ও জিজ্ঞাসা তাঁহার সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইয়াছে।

ইহারই আরও বিস্তৃত প্রসার দেখা যায় বঙ্কিমের সমালোচনা সাহিত্যে। বাংলায় সমালোচনা সাহিত্যের প্রবর্তক বঙ্কিম। সমালোচনার এক বিশিষ্ট ভাষা আছে, এক বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, এক বিশিষ্ট কৌশল আছে—যাহা সাধারণ সাহিত্যের ভাষা, ভঙ্গী এবং কৌশল হইতে পৃথক। এই ভাষা, ভঙ্গী এবং কৌশল যে সব সমালোচনায় এক প্রকার হইবে তাহা নহে, তবে সমালোচনার ভাষা, ভঙ্গী এবং কৌশল অন্য রস-সাহিত্য হইতে ব্যবহারিক দিক দিয়া পৃথক। এই পার্থক্য বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রয়োগ করেন। বঙ্গদর্শনের সমালোচনাসাহিত্য বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, তাহাতে বঙ্কিম তথ্যের অনুসন্ধান, তথ্যে নিষ্ঠা, যুক্তিমূলক ভাষা প্রয়োগ, ভাষার আপেক্ষিক তীক্ষ্ণতা ও সিদ্ধান্তে দৃঢ়তা, কিন্তু বাক্যের আতিশয্যে সর্বদা সংযম দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে জীবনের সমস্ত সমস্যাই যে সমালোচনার বিষয় হইতে পারে তাহাও বঙ্কিম প্রথম বঙ্গসাহিত্যে দেখাইয়াছেন। বঙ্গদর্শনে সমালোচনার বিষয় হইয়াছে সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস ও ভূগোল। সমালোচনা সাহিত্যের এই ব্যাপক ক্ষেত্র বঙ্কিমের সৃষ্টি। এমন কি পুস্তক পরিচয় এবং প্রবন্ধ সাহিত্য যাহা আজ সাধারণ সমালোচনা সাহিত্যের একটি

৫

অঙ্গ, তাহারও পথ প্রদর্শন প্রথম করিয়াছেন বঙ্কিম তাঁহার বঙ্গদর্শনে।

বঙ্কিমসাহিত্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তাঁহার কোন সাহিত্যে, রচনায় বা উপন্যাসে, শিশুচরিত্রের কোন বিকাশ নাই এবং শিশুসুলভ ভাষা বা সাহিত্যের প্রয়োগ নাই। এমন কি আশ্চর্যের বিষয় বঙ্কিমের উপন্যাসে কোন নায়িকার সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত নাই। ভ্রমরের একটি সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু সেও কয়েকদিন মাত্র জীবিত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তাহার মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বঙ্কিম-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন শিশুচরিত্র নাই। কমলমণির কথা না বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। বঙ্কিমসাহিত্যে শৈশব ও কৈশোরের কথা ও স্মৃতি আছে কিন্তু তদ্‌গত চরিত্র নাই। ইহার কারণ কি তাহা নির্ধারণ করা কঠিন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম—সমগ্র জীবন যাঁহার ভূয়োদর্শী সাহিত্যের অন্তর্গত, শিশুচরিত্র কেন তাঁহার অপূর্ব সাহিত্যে স্থান পাইল না, এই প্রশ্নের কেহ মীমাংসা করিয়াছেন কি না জানি না। হয়ত ইহার কারণ ছিল, নয়ত ছিল না। যদি কারণ অন্বেষণ করিতে হয়, তাহা হইলে বলা প্রয়োজন, যে প্রথমতঃ বঙ্কিম তাঁহার নিজের শৈশবকে বড় করিয়া কখনও দেখেন নাই। শৈশবের সুখস্বপ্ন তাঁহার জীবনে কোন দীর্ঘ রেখাপাত করে নাই। হয়ত, বঙ্কিমের শৈশব অনাদৃত ছিল বলিয়া, তাঁহার সাহিত্যে শৈশব অনাদৃত। দ্বিতীয় কারণ হইতে পারে যে বঙ্কিমসাহিত্য পরিণত চরিত্র, জীবনের গাম্ভীর্য-পূর্ণ দিক ও সমস্যাসঙ্কুল সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম লইয়াই ব্যস্ত। তৃতীয় কারণ, ইহাও সম্ভব যে বঙ্কিমযুগে শিশুমনস্তত্ত্বের যথার্থ ও যথেষ্ট অনুশীলন হয় নাই।

বঙ্কিমসাহিত্য প্রসঙ্গে এইস্থলে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিব। তাহা হইল তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যের নাট্য সামর্থ্য। উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে প্রধান ভেদ হইল মাধ্যম লইয়া। কথোপকথন ও উক্তির মাধ্যমে যে কাহিনী সৃষ্টি হয় তাহা নাটক, উপন্যাস নহে। উপন্যাস নির্ভর করে উপন্যাস স্রষ্টার কাহিনী রচনার ও বর্ণনা কৌশলের উপর। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া নাটক ও উপন্যাসে কোন ভেদ নাই, পরিবেশনের মাধ্যমে যা ভেদ। তবে নাটকের ঘটনা পরম্পরার বিকাশের গতি উপন্যাসের চেয়ে দ্রুততর। সুতরাং নাটকে একটি নাটকীয় গতি এবং নাটকীয় অবস্থিতির সৃজন করা হয়, যাহা সাধারণতঃ উপন্যাসে বিশেষ দেখা যায় না। তথাপি অনেক উপন্যাসে নাটকীয় গতি ও নাটকীয় পরিস্থিতির রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়, যাহা সম্পূর্ণ নাটকীয়

না হইলেও প্রায় নাটকীয় বলা যাইতে পারে। বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায় যথাক্রমে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও কপাল-কুণ্ডলায়।

নাটক ও উপন্যাস আলোচনার অবতারণা এই কারণে করিলাম যে বঙ্কিমের অনেক উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। ইহার দ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে বঙ্কিম উপন্যাস-সাহিত্য, কাহিনীর দিক দিয়া, বর্ণনার দিক দিয়া, ঘটনা সমাবেশের দিক দিয়া এবং মর্মস্পর্শী আকর্ষণের দিক দিয়া, এত সর্বাঙ্গসুন্দর যে তাহা কুশলী নাট্য-কারের নাটকে পরিণত করা শক্ত ছিল না। গিরীশচন্দ্র ঘোষ নিজে নাট্যকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, বঙ্কিমের উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করার বিরাট সম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম গিরীশ-চন্দ্র বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা'কে নাটকের রূপ দিয়া 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে'র জন্য লিখিয়া দেন। কথিত আছে, নাটকের পাণ্ডুলিপি অভিনয়ের সময় পাওয়া না যাওয়ায়, গিরীশবাবু নিজে উপন্যাস দেখিয়া 'প্রম্পট' (prompt) করিয়া যান। ইহার পর বৎসরেই ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র বঙ্কিমের 'মৃণালিণী'কে নাটকে পরিণত করিয়া নিজে 'পশুপতি'র ভূমিকা লইয়া 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' অভিনয় করেন। পুনরায় তিন বৎসর পরে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গিরীশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'কে নাটকের রূপ দিয়া, স্বয়ং জগৎসিংহ সাজিয়া 'ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' অভিনয় করেন যদিও দুর্গেশনন্দিনী প্রথম অভিনীত হয় 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল থিয়েটারে' ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে। বঙ্কিম গিরীশবাবুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন "আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আমার বিশ্বাস আপনার হাতে আমার উপন্যাসের নাট্যরূপ ভাল হইবে।"

অতুলকৃষ্ণ মিত্র, 'এমারেল্ডে'র জন্য ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকান্তের উইল এবং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে দেবী চৌধুরাণী নাটকে রূপান্তরিত করেন। নাট্যাচার্য ও রসরাজ অমৃতলাল বসুও বঙ্কিমের উপন্যাসকে নাটকরূপ দিয়া অভিনয় করা বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'চন্দ্রশেখর' এবং তাহার পরবর্তী বৎসরে 'রাজসিংহ' নাটকে রূপান্তরিত করেন। অন্যান্য নাট্যকারগণও এই পথ অনুসরণ করিয়াছেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় 'রজনী'কে নাটকে পরিণত করেন এবং 'ক্লাসিক'-এর অধিনায়ক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দিরা'র এবং ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'ভ্রমরের' নাট্যরূপ দান করেন।

এই শতাব্দীর আরম্ভে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মিনার্ভা থিয়েটারে গিরীশচন্দ্র 'সীতারাম'কে উৎকৃষ্ট ও অতি চিত্তাকর্ষক নাটকে পরিণত করিয়া নিজে সীতারাম এবং বিখ্যাত 'দানী'বাবু গঙ্গারাম সাজিয়া কলিকাতার দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। জনসাধারণের এই আগ্রহ দেখিয়া গিরীশবাবু পুনরায় ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনীকে আবার নূতন নাট্যরূপ দান করেন এবং সেই নাট্য অভিনয়ে দানীবাবু সাজিয়াছিলেন 'ওসমান' এবং তারাসুন্দরী 'আয়েষা'র অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে অভাবিত দর্শক সমাগম দেখিয়া গিরীশবাবু বিশেষ উৎসাহিত হন ও ১৯১০ খৃষ্টাব্দে 'চন্দ্রশেখর' পুনরায় নূতন করিয়া নাট্যে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং 'চন্দ্রশেখরে'র অংশে অভিনয় করেন।

বঙ্কিমের উপন্যাসকে নাটকে পরিণত করার পথ গিরীশবাবুই দেখাইয়াছিলেন এবং বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির এই নাটকসামর্থ্য জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে বহু বিখ্যাত নাট্যকার সেই পথ কৃতিত্বের সহিত অবলম্বন করিয়াছেন।

বঙ্কিম-সাহিত্যের আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম, তিনি প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক বৈচিত্র্যের ভিতর এক অনবচ্ছিন্ন ঐক্যের আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সমন্বয় তাঁহার সাহিত্যের একটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তৃতীয়তঃ, দৈব ও পুরষাকারের একটি সামঞ্জস্য প্রকাশ তাঁহার সাহিত্যের একটি পরিচয়।

অনেক সাহিত্যিক বঙ্কিমের সহিত গ্রীক বিচ্ছেদাত্মক নাট্যকারদের এবং টমাস হার্ডি'র ও সেক্সপীয়রের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রীক বিচ্ছেদাত্মক নাটকে মানুষ এক নির্মম নিয়তির জালে আবদ্ধ, কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্যে তাহা নহে। সেক্সপীয়ারের দৈববল শক্তিশালী হইলেও মানব চরিত্র ও পুরুষকারও সবল। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই দুয়ের পশ্চাতে যে এক অজ্ঞেয় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ যোগাযোগ আছে তাহার নির্দেশ পাওয়া যায়। টমাস হার্ডি'র উপন্যাসে মানুষের দুঃখ, নিরাশা, ব্যর্থতা অনেকস্থলে দৈবের কৌতুকের বিষয়। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই কৌতুক রস এক অভিনব সার্থকতা ও আনন্দ রসে রূপায়িত।

বঙ্কিমসাহিত্যে 'স্কটে'র প্রভাব লইয়া বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ স্কটের 'আই-ভ্যান-হো'র সঙ্গে বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্যের কথা বলা হয়। বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন যে দুর্গেশনন্দিনী

লিখিবার পূর্বে তিনি 'আইভ্যান-হো' পড়েন নাই। স্কট ও বঙ্কিমের চিন্তাধারার একদিক দিয়া মিল আছে, কেন না উভয়েই অতীতের গৌরবোজ্জ্বল সমাজ ও আদর্শকে কিয়দংশে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু সাদৃশ্য থাকা অসম্ভব নহে, কারণ কতকগুলি সাহিত্যিক ভাব সার্বভৌমিক। 'আইভ্যান-হো'র সহিত দুর্গেশনন্দিনীর কতদূর সাদৃশ্য ও কতদূর বৈষম্য আছে তাহা লইয়া বিভিন্ন অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, এবং যাঁহারা তাহা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা সেই সকল অভিমত পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন; আমাদের এই স্থলে এ আলোচনা বাড়াইলে বঙ্কিমসাহিত্য-বোধে আর কোন সাহায্য করিবে না।

ইংরাজ সাহিত্যিকদের কি প্রভাব বঙ্কিমসাহিত্যে পড়িয়াছে তাহাই বিচার্য বিষয়। এই ইংরাজ সাহিত্যিকগণের মধ্যে স্যার ওয়াল্টার স্কট, লর্ড লিটন, উইলকি কলিন্স্, ডিকেন্স, থ্যাকারে, ইলিয়ট প্রভৃতির গল্প, উপন্যাস ও কথাসাহিত্যের সহিত বঙ্কিমের পরিচয় ছিল গভীর। তবে তাঁহাদের প্রভাব বঙ্কিমসাহিত্যে ছিল কিনা বা কতদূর ছিল তাহা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। বঙ্কিম ইংরেজী-সাহিত্যের কথা ও কাহিনী কোনস্থলেই ঠিক অনুকরণ করিয়াছেন বলা সম্পূর্ণ ভুল হইবে। তবে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপন্যাসের গঠনশৈলী ও রচনাকৌশলের প্রভাব বঙ্কিমসাহিত্যে দেখা যায়। বিভিন্ন বিষয়কে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা ইহার মধ্যে অন্যতম। বঙ্কিমসাহিত্যে গোয়েন্দা ও দৌত্যকর্মের ও দৌত্যকাহিনীর প্রয়োগ ইহার দ্বিতীয় নিদর্শন। রহস্যের সৃষ্টি ও তাহার উদ্ঘাটনের রীতি বঙ্কিমের এক সাহিত্যকৌশল, যাহাতে পাশ্চাত্য প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। অনেকে আবার সেইজন্য দুর্গেশনন্দিনীকে 'ডিটেক্টিভ্' উপন্যাস পর্যন্ত বলিয়া থাকেন। তবে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক বলিয়াছেন যে, কমলাকান্তের দপ্তরে 'পিকউইক পেপারস'-এর "গন্ধ" আছে, এরূপ বলা বোধহয় খুব সঠিক ও সংগত আলোচনা হইবে না।

বঙ্কিমসাহিত্যকে বিভিন্ন কালের ও যুগের পর্যায়ে ফেলিবার অনেক প্রচেষ্টা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা যে বেশী সার্থক বা যুক্তিসংগত হইয়াছে, তাহা মনে হয় না। কালের ক্রমে ও বয়সের পরিণতি ও অভিজ্ঞতার ফলে সকল সাহিত্যেই পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে এবং বঙ্কিমসাহিত্য যে তাহার ব্যতিক্রম তাহা বলা যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস মহাশয়েরা বঙ্কিমের ৪২ বৎসরের সাহিত্য সেবাকে চারি পর্বে ভাগ করিয়াছেন। এই

বেয়াল্লিশ বৎসর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে, যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৩ বৎসর ৮ মাস, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস অবধি, অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর এক মাস পূর্বাবধি। বঙ্কিমের সাহিত্যজীবন তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র কর্মজীবন ব্যাপিয়া প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ৪২ বৎসর সময়কে চারি যুগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম তের বৎসর 'আদিপর্ব' : ১৮৫২ সালে সংবাদ প্রভাকরে রচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ অবধি। দ্বিতীয় সাত বৎসর 'উদ্যোগপর্ব' : ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল অবধি। তৃতীয় সতের বৎসর 'যুদ্ধপর্ব' : ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—'প্রচার' পত্রিকার বিদায়কাল অবধি। চতুর্থ, শেষ ৫ বৎসর—'শান্তি-পর্ব' : ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু অবধি। মহাভারতের এই পর্ব বিভাগের সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রথম দুই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্বে তিনি সম্পাদক ও সমালোচক এবং চতুর্থ পর্বে তিনি পিতামহ ভীষ্মের মতন উপদেষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র এক পর্বে কেবল লেখক, এক পর্বে তিনি সমালোচক এবং আর এক পর্বে তিনি উপদেষ্টা এইরূপ বিভাগ সম্ভব কিনা সন্দেহ। বরং বঙ্কিমসাহিত্য গভীরভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে তাঁহার প্রত্যেক রচনায় ও সাহিত্যে তাঁহাকে লেখক, সমালোচক, সাহিত্যিক উপদেষ্টা ও কথক—সকল রূপেই পাওয়া যায়। তাঁহার সাহিত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রবেশ করিয়াছিল। রূপ ও রসের, মনীষার ও ঈষার, ঈক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের এমন সমাবেশ অন্য কোন সাহিত্যে এত ব্যাপক ও ওতপ্রোতভাবে আছে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিম সেইজন্য নিজেই পাঠককে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন :

> কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যামাত্র। একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্তৃত হইয়া, কেবল গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হই।

এই অধ্যায়ের উপসংহারে বঙ্কিম বাংলার নব্যলেখকদের প্রতি যে দ্বাদশটি বিখ্যাত উপদেশ 'নিবেদন' করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করা প্রয়োজন। বঙ্কিম এই উপদেশগুলি নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন :

(১) যশের জন্য লিখিবেন না। তাহা হইলে যশও হইবে না, লেখাও ভাল হইবে না। লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।

(২) টাকার জন্য লিখিবেন না। ইউরোপে এখন অনেক লোক টাকার জন্যই লেখে, এবং টাকাও পায়, লেখাও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের এখনও সেদিন হয় নাই। এখন অর্থের উদ্দেশ্যে লিখিতে গেলে, লোকরঞ্জন প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পড়ে। এখন আমাদের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।

(৩) যদি মনে বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল-সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৪) যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা ও পরপীড়ক বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না। সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।

(৫) যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছুকাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছুকাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই-এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তাহার পর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্যে ব্রতী তাঁহাদের এ নিয়ম-পালন ঘটিয়া উঠিবে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য লেখকদিগের পক্ষে অবনতিকর।

(৬) যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, সে বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপণ অকর্তব্য। এটি সোজা কথা, কিন্তু সাময়িক সাহিত্যে এ নিয়মটি রক্ষিত হয় না।

(৭) বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা করিবেন না। বিদ্যা থাকিলে তাহা আপনিই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিতে হয় না। বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা পাঠকের অতিশয় বিরক্তিকর, এবং রচনার পারিপাট্যের বিশেষ হানিজনক। এখনকার প্রবন্ধে, ইংরাজী, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্মান কোটেশান বড় বেশী দেখিতে পাই। যে ভাষা আপনি জানেন না, পরের গ্রন্থের সাহায্যে সে ভাষা হইতে কদাচ উদ্ধৃত করিবেন না।

(৮) অলঙ্কার প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে, প্রয়োজনমত আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে। ভাণ্ডারে না থাকিলে, মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য আর কিছুই নাই।

(৯) যে স্থলে অলঙ্কার বা ব্যঙ্গ বড় সুন্দর বলিয়া বোধ হইবে, সেই স্থানটি

কাটিয়া দিবে, এটি প্রাচীন বিধি। আমি সে কথা বলি না। কিন্তু আমার পরামর্শ এই যে, স্থানটি বন্ধুবর্গকে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া শুনাইবে। যদি ভাল না হইয়া থাকে তবে দুই-চারিবার পড়িলে লেখকের নিজেরই আর উহা ভাল লাগিবে না; বন্ধুবর্গের নিকট পড়িতে লজ্জা করিবে। তখন উহা কাটিয়া দিবে।

(১০) সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন না লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।

(১১) কাহারও অনুকরণ করিও না। অনুকরণে দোষগুলি অনুকৃত হয়, গুণগুলি হয় না। অমুক ইংরাজী বা সংস্কৃত বা বাঙ্গলা লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন, আমিও এইরূপ লিখিব, একথা কদাপি মনে স্থান দিও না।

(১২) যে কথার প্রমাণ দিতে পারিবে না, তাহা লিখিও না। প্রমাণগুলি প্রযুক্ত করা সকল সময়ে প্রয়োজন হয় না, কিন্তু হাতে থাকা চাই।

বাঙ্গলা সাহিত্য, বাঙ্গলার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গলা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।

বঙ্কিমোত্তরযুগে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি স্তব্ধ হইয়াছে বলিব না, তবে বঙ্গসাহিত্য ভারতী যে ভাবে সংকটাপন্ন হইয়াছেন, বঙ্কিমের উপদেশ পালন করিলে অনেকাংশে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত এবং অনেক সঙ্কট-মোচন হইত।

৫

॥ বঙ্কিমের উপন্যাস ॥

[কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণ]

বঙ্কিমের উপন্যাস লিখিবার প্রণালীতে তাঁহার নিষ্ঠা, শ্রম ও ধ্যানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি খাতা বাঁধিয়া গল্পের কাহিনী অংশ প্রথমেই স্থির করিয়া লইতেন। ইহার ফলস্বরূপ তাঁহার উপন্যাসে ও কাহিনীতে এমন একটি সুবিন্যস্ত গঠন ছিল যাহার ক্রমবিকাশে মূল বক্তব্য ও আদর্শ কখনও ছায়াচ্ছন্ন হইত না। তিনি প্রতি পরিচ্ছেদ পূর্বাহ্ণেই নির্দিষ্ট করিতেন এবং কোন কোন ঘটনার কিভাবে সমাবেশ হইবে এবং কোন কোন চরিত্রের অবতারণা হইবে তাহাও নির্ধারিত করিয়া নিতেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বহুবার লেখার পর পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়ের পরিবর্তন হইত। এই বিষয়ে ইহা উল্লেখযোগ্য যে তিনি এত পরিবর্তন করিতেন যে কখনও কখনও সম্পূর্ণ অধ্যায় পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতেন, যাহা খুব কম গ্রন্থকারকে করিতে দেখা যায় বা শোনা যায়। এই পরিবর্তন তাঁহার অদ্ভুত নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয়। বঙ্কিম নিয়তই পরিবর্তন করিতেন; লিখিবার সময়ে তো পরিবর্তন করিতেনই, এমন কি ছয় মাস বা এক বৎসর পরেও করিতেন। প্রথম সংস্করণের পর দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিম ঘটনা পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়াছেন, যথা কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম সংস্করণে গোবিন্দলাল আত্মঘাতী হইয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে সেই পরিণতি জীবন ধারণ করিয়া আত্মজয় ও আত্মোন্নতির পথে গিয়াছে। যতক্ষণ বাক্যটি, বর্ণনাটি বা ঘটনা-সমাবেশ ও সংযোজনাটি তাঁহার মনোমত না হইত ততক্ষণ তাঁহার এই অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলিত। একটি কথা, একটি ভাব, একটি ব্যঞ্জনা বা একটি গল্পাংশের উপর তিনি বহু চিন্তা, ধ্যান ও সময় ব্যয় করিতেন। সাধারণতঃ তাঁহার লেখার সময় ছিল সন্ধ্যায়, সকল কর্মের অবসানে। কিন্তু অন্য সময়েও তিনি লিখিতেন এবং এমনও দেখা গিয়াছে যে যখনই সময় পাইতেন তখনই লিখিতেন। তিনি কখনও বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। লিখিবার সময় তাঁহার

মূর্তি হইত বহুরূপী। কখন গম্ভীর, কখনও চপল ও চঞ্চল, কখনও নিশ্চল ও ভাবোন্মুখ, কখনও বাতায়নসম্মুখে দণ্ডায়মান, কখনও বা সুদূরে দৃষ্টিনিবদ্ধ; কখনও হয়ত দ্রুত পদচারণা করিতেছেন, সেই সময়ে লোক, আসিলে তাঁহাকে দেখিত অন্যমনস্ক ও আপন অন্তর্লোকে নিবিষ্টচিত্ত। এমন অনেক দিন গিয়াছে বঙ্কিম শুধুই ভাবিয়াছেন, এক ছত্রও লিখিতে পারেন নাই। ভাবের বন্যায় ভাষা ভাসিয়া গিয়াছে।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিবার বহু প্রয়াস হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে বিশেষ কার্যকরী বা সন্তোষজনক হইয়াছে সেরূপ মনে করা যায় না। প্রথমটি হইল দ্বৈত বিভাগ। বঙ্কিমের উপন্যাসের কয়েকটিকে বলা হইয়াছে নিছক বাস্তবাত্মক আখ্যায়িকা, যাহাকে ইংরাজীতে 'নভেল' বলা হয় এবং অন্য উপন্যাসগুলিকে বলা হইয়াছে ভাবাত্মক ও কল্পনাত্মক যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'রোমান্স'। এই বিভাগ করিয়া ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের নয়খানি উপন্যাস ভাবাত্মক ও কল্পনাত্মক উপন্যাসের অন্তর্গত করিয়াছেন; যথা—(১) দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), (২) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), (৩) মৃণালিনী (১৮৬৯), (৪) যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), (৫) চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), (৬) রাজসিংহ (১৮৮১), (৭) আনন্দমঠ (১৮৮২), (৮) দেবী চৌধুরাণী এবং (৯) সীতারাম (১৮৮৭)। অন্য চারখানি উপন্যাসকে এই মানদণ্ডে বলা হইয়াছে 'আখ্যায়িকা' বা বাস্তব উপন্যাস অর্থাৎ 'নভেল'। যথা (১) বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), (২) ইন্দিরা (১৮৭৩), (৩) রজনী (১৮৭৭) এবং (৪) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। চন্দ্রশেখর 'রোমান্স' কিন্তু বিষবৃক্ষ 'নভেল'। মৃণালিনী 'রোমান্স' কিন্তু রজনী 'নভেল'—এইরূপ ইংরেজী 'নভেল' ও 'রোমান্সের' পার্থক্য বঙ্কিমের উপন্যাসে প্রয়োগ করিলে খানিকটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বঙ্কিমের উপন্যাসে ইংরেজী সাহিত্যের 'নভেল—রোমান্স' পার্থক্য যথার্থভাবে কার্যকরী হইতে পারে না এই কারণে যে, বঙ্কিম এই পার্থক্য বহু ক্ষেত্রে বজায় রাখেন নাই। বঙ্কিমের কোন উপন্যাসকে সম্পূর্ণ বাস্তব বা সম্পূর্ণ কল্পনাত্মক বলিয়া সীমাবদ্ধ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বঙ্কিম-সাহিত্যে বাস্তব ও কল্পনা অনেক ক্ষেত্রে একাকার হইয়া গিয়াছে; কারণ, ভারতীয় দৃষ্টিতে এ দুইয়ের বিভাগ তেমন অটুট নহে যা ইংরেজী সাহিত্যে দেখা যায়।

অনেক সাহিত্যিক আবার বঙ্কিমের উপন্যাসকে চারিভাগে বিভক্ত

করিয়াছেন। প্রথম বিভাগ হইতেছে সামাজিক ও সাংসারিক উপন্যাস; যথা— কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা ও রজনী। দ্বিতীয় বিভাগ, ঐতিহাসিক উপন্যাস যথা—রাজসিংহ। তৃতীয় বিভাগ, ধর্মাত্মক উপন্যাস; যথা—আনন্দ-মঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। চতুর্থ বিভাগ জাতীয়তার ও স্বদেশ-প্রেমের উপন্যাস; যথা—আবার আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম। এই বিভাগ হইতেও দেখা যাইবে, যে এইরূপ বিচার সকল ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত ও কার্যকরী নহে। যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে গেলে বঙ্কিমের রাজ-সিংহ। কিন্তু ইতিহাসের পটভূমি দুর্গেশনন্দিনীতে, চন্দ্রশেখরে এবং সীতারামেও আছে। আনন্দমঠে ইতিহাস একেবারে নাই বলিলে ভুল করা হইবে। বঙ্কিমের উপন্যাস ও সাহিত্য ইতিহাস ও দেশের বাস্তব জীবনের ও আদর্শের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণা ব্যাপক ছিল এবং তাঁহার উপন্যাসে বহুস্থলে এই ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বঙ্কিমের ইতিহাস শুধু রাষ্ট্রের উত্থান-পতন বা তাহার যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া নহে, তাহাতে ধর্মের, সমাজের ও মানবজীবনের ইতিহাসও স্থান পাইয়াছে।

মৃণালিনী উপন্যাসে বাংলাদেশের সাতশত বৎসরের সামাজিক ইতিহাস প্রতিফলিত হইয়াছে। মৃণালিনীতে বঙ্গাধিকারের পরবর্তী এবং দুর্গেশ-নন্দিনীতে ও কপালকুণ্ডলায় আকবরের কালের অর্থাৎ চারিশত বৎসরের পূর্ববর্তী কালের বাংলার ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর চিত্র পাওয়া যায়। চন্দ্র-শেখর, দেবী চৌধুরাণী ও আনন্দমঠে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজের বা রাষ্ট্রের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সীতারাম ইহার পরবর্তী কালের কথা। বঙ্কিমের বিষবৃক্ষে, কৃষ্ণকান্তের উইলে, রজনীতে, ইন্দিরাতে ও রাধারাণীতে শত বৎসরের পূর্বাপর সামাজিক ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

উপন্যাস-সাহিত্যের সহিত ইতিহাসের এই সুন্দর সংমিশ্রণ বঙ্কিম-সাহিত্যের অভিনব সৃষ্টি। বঙ্কিমের পূর্বে সাহিত্য ও ইতিহাসের এই সমন্বয় এমনভাবে কেহ করেন নাই। ইহাতে কাহিনী গঠনের কৌশল আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে এবং চরিত্র চিত্রণে এক সরসতা আনিয়াছে যাহা যেমন স্বাভাবিকভাবে কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি বাস্তবতায় সজীব। ইতিহাসের উপকরণ এইরূপে ব্যবহার করিয়া বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যের কাহিনী ও চরিত্র-গঠনের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়াছিলেন। যদিও দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, মৃণালিনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও কপালকুণ্ডলায় ইতিহাসের উপকরণ

আছে, রাজসিংহ ব্যতীত যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস অন্যগুলিকে বলা যায় না। অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাস গৌণ ও আনুষঙ্গিক, মুখ্য নহে। এই সকল উপন্যাসের ভিতর ইতিহাসের কোন স্বাধীন মর্যাদা নাই। তাহা চরিত্র ও কাহিনীর পটভূমি মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই তাঁহার পাঠকগণকে এই বলিয়া সচেতন করিয়াছেন :

> পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবীচৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে, বড় বাধিত হইব।

তবে কথা হইতেছে এই যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এক জিনিস এবং ইতিহাসকে সাহিত্যে সহায় হিসাবে তাহার ব্যবহার করা আর এক জিনিস। ইতিহাসকে সহায়ক করিবার কৌশলটি বঙ্কিম উপন্যাস-সাহিত্যে প্রথম আবিষ্কার করিয়া তাঁহার উপন্যাস সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে ও গল্পকে সতেজ ও সজীব করিয়াছেন। এই বিষয়ে একটি উদাহরণ এই ভাবটিকে পরিস্ফুট করিবে। ইতিহাসে যুদ্ধের বর্ণনা আছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে উপন্যাসে তাই বহু যুদ্ধবর্ণনা পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই উপকরণ লইয়া তিনি উপন্যাস-সাহিত্যে মৌলিকতার ও নূতন পথের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে কোথাও পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটে নাই। নব নব কৌশলে তিনি তাঁহার উপন্যাসে যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। যুদ্ধবিজ্ঞান বা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের উপন্যাস-সাহিত্যে বিশেষ আলোচনা নাই, এবং এখন যাহাও বা আছে, বঙ্কিম-যুগে তাহাও ছিল না। এই স্থলে বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্য পথিকৃৎ। দুর্গেশনন্দিনী হইতে রাজসিংহ অবধি বঙ্কিম উপন্যাস-সাহিত্যে যে যুদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে বঙ্কিমের কল্পনার বৈচিত্র্য আছে; বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে তাঁহার সামরিক ভাষা, সাহিত্যে সামরিক গতি এবং মানসিক গভীরতা। উদাহরণ স্বরূপ, দুর্গেশনন্দিনীতে পাঠানকর্তৃক বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গ আক্রমণ, পাঠানসৈন্যের অতর্কিতে দুর্গে প্রবেশ এবং বিমলার দুর্গে বন্দিনী অবস্থা। ইহা বাস্তব না কাল্পনিক তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রাসঙ্গিক। কাহিনী ও চরিত্র শিল্পের চাতুর্যের দিক দিয়া ইহা অতুলনীয়। জগৎসিংহের সহিত ওস্‌মানের দ্বৈতযুদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের ও উপন্যাসের 'ডুয়েল' যুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চন্দ্রশেখরে মীরকাশিমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ অথবা প্রতাপের যুদ্ধ হইতেছে আদর্শের

যুদ্ধ, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য যুদ্ধ। আনন্দমঠ বা সীতারামের যুদ্ধ দেশ-প্রেমের আদর্শে ভাস্বর। তবে এই যুদ্ধে বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যে বীররসের অভিনব বিকাশ ও ব্যবহার দেখাইয়াছেন। রাজসিংহে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে বঙ্কিম যুদ্ধের কৌশল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে সমরনীতি, কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র, ব্যূহ প্রবেশ, আত্মগোপন, অতর্কিত আক্রমণ, ছল ও বলের প্রয়োগ—বিস্তারিতভাবে নিপুণ হস্তে বর্ণিত হইয়াছে। 'টডের রাজস্থান' যে বঙ্কিমকে সম্পূর্ণভাবে এই যুদ্ধ বর্ণনায় প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা বলা সম্পূর্ণ সত্য হইবে না। সংস্কৃত সাহিত্যের এবং বিশেষ করিয়া মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনাও বঙ্কিমসাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পূর্বে বঙ্গদর্শনে, ১২৮৪-১২৮৫ বঙ্গাব্দে যখন রাজসিংহ অংশতঃ প্রকাশিত হয় এবং ১২৮৮ বঙ্গাব্দে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) যখন ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় তখন বঙ্কিম 'টডের রাজস্থান' অবলম্বন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন সংস্করণে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, বাহুবল ও আত্মরক্ষা এবং এই বাহুবলের সামর্থে স্বদেশ ও স্বজন রক্ষা। কিন্তু এই শারীরিক বলের অনুশীলন ইন্দ্রিয়সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য ক্ষুদ্র রাজসিংহ পরে বৃহদাকারে প্রকাশিত হয়। এই বৃহৎ রাজসিংহ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজসিংহের প্রথম সংস্করণ হইতে দ্বিতীয় সংস্করণের মধ্যে ব্যবধান প্রায় ১৭ বা ১৮ বৎসরের। এই সময়ের মধ্যে বঙ্কিম বহু গ্রন্থ ও বহু বিষয় পাঠ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হইয়াছিল। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত যে রাজসিংহের দ্বিতীয় সংস্করণে 'মানুচী', 'আর্মি', 'বার্ণীয়ার' ও 'টা-ভারণীয়ার' প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকদের প্রণীত কাহিনীর প্রভাব আছে। সাজাহান, আওরঙ্গজেব, জাহানারা এবং উদীপুরী বেগমের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য অবলম্বন করিয়া করা হইয়াছে মনে করা ভুল হইবে না।

কাহিনী ও চরিত্রায়নের দিক দিয়া রাজসিংহ উপন্যাসে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে প্রথমত ইতিহাসের পটভূমিতে চরিত্র সংস্থাপন এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে সেই চরিত্র দুইদিক দিয়া একাধারে দেখাইবার কৌশল। যুদ্ধাদির জয় পরাজয়ের ইতিহাস ও কাহিনী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বঙ্কিম ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি যথাযথ রাখিলেও ঔপন্যাসিক

আবহাওয়ার মধ্যে তাহাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহাসিক মূল্য ও আদর্শ অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রাজসিংহে ইতিহাস প্রধান হইলেও সংসার ও সমাজ তাহার অন্তরালে গ্রথিত। রাজসিংহের ঐতিহাসিক পট-ভূমিকায় সাধারণ মানুষের স্থান অল্প এবং নায়ক নায়িকারা সকলেই প্রায় উচ্চ পদস্থ এবং রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কে সম্পর্কিত ইতিহাসের অংশ। রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সংঘর্ষের কারণ ও পুরস্কার। স্বীয় বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসে নির্মলকুমারী রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত। তাই তাহার দাম্পত্যজীবন রাজনৈতিক পরিবেশের পশ্চাতে পড়িয়াছে এবং সর্পিল পথের কূটবুদ্ধি, বাক্‌পটুতা ও চাতুরী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে জেবুন্নিসা যেমন ঐতিহাসিক সত্য তেমনি ইতিহাসের অতীত রমণীর শাশ্বত প্রেমের প্রতিমূর্তি। কাহিনী গঠনে ও চরিত্র সৃষ্টিতে এই অভিনব ভঙ্গি কলাকৌশল বঙ্কিমের সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহের কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণ-পদ্ধতি আলোচনার পর তাঁহার শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর আলোচনা করিলে বঙ্কিমের বিভিন্ন কৌশল ও রীতি দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্কিমের নিজের অভিমত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে তাঁহার সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ। ১২৭৫ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকান্তের উইলের রচনা আরম্ভ হয় এবং ১২৮১-৮৪ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের জীবদ্দশায় ইহার চার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১২৮৫ (১৮৭৮) সালে যখন তিনি হুগলীতে অবস্থিত এবং চতুর্থটি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। প্রত্যেক সংস্করণে বঙ্কিম কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করিয়াছিলেন মিরিয়াম এস নাইট (Mirriam S. Knight) এবং জে. এফ্. ব্লুমহার্ড (J. F. Blumhardt, M.A.)।

সামাজিক ও সাংসারিক উপকরণ কি ভাবে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিতে পারে তাহা কৃষ্ণকান্তের উইলে দেখিবার বিষয়। অনুরূপ ভাবে এইরকম উপকরণ বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিমের পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই। বাঙালী সমাজে হিন্দু গৃহস্থের সংসারে হিন্দু আইনের দায়ভাগ ব্যবস্থা কিরূপ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা আনিয়াছিল কৃষ্ণকান্তের উইল তাহার

সাক্ষী। বাঙ্গালী হিন্দু দায়ভাগশাসিত সংসারে পিতার যথেচ্ছ ব্যবহার কিভাবে সংসারের সুখ ও শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ পিতা কৃষ্ণকান্ত রায়, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং তাহার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন। এই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির দ্বিতীয় উপকরণ লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী ভূমিসত্ত্ব ও জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি। তাঁহাদের অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বহুস্থলে সাধারণের উপর অত্যাচার রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। যথা, কৃষ্ণকান্ত রায়ের আবাসে রোহিণীর অবরোধ এবং পোষ্টমাস্টার মাধবীনাথের গৃহে অগ্নিসংযোগের ভীতি প্রদর্শন। তৃতীয়, এই উপন্যাসে তদানীন্তন হিন্দু-সমাজে বিধবাদের প্রতি অকরুণ ব্যবহারের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বিধবা রোহিণীর ভোগাকাঙ্খা এবং গোবিন্দলাল ও রায়-পরিবারে সংশ্লিষ্ট সমস্যা এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপাদান। প্রেমের বিভিন্ন বিকাশ, বিবাহ, প্রেম ও বিবাহাতিরিক্ত প্রেম কিভাবে সমাজে ও সংসারে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার প্রতিক্রিয়া কি তাহা এই সামাজিক উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র গঠন করিয়াছে। চতুর্থ, কৃষ্ণকান্তের উইলে সমাজের স্তরবিভাগ ও বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। যথা, দাসী, আদালতের সাক্ষী, ব্রহ্মানন্দ, পোষ্টমাষ্টার সব এক বিচিত্র কৌশলে সন্নিবেশিত। ইহার পঞ্চম উপকরণ হইল ইংরাজ ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতেছিল তাহার এক চতুর ও বাস্তব চিত্র, যাহাতে দেখান হইয়াছে—কিভাবে ইহা সমস্ত সমাজকে অধঃপতনের পথে লইয়া যাইতেছে : পুলিশ, টাকার প্রভাব, মিথ্যা-সাক্ষী, অকৃতজ্ঞতা ও নানা অপকীর্তি। পরিশেষে, ধর্মবোধের দিক দিয়া কৃষ্ণকান্তের উইল এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। অপরাধ কি, তাহা কোন মানদণ্ডের দ্বারা নির্ণীত হইবে, রাষ্ট্রবিধান না মানবতার বিধান—এই সকল প্রশ্ন কাহিনীর ও চরিত্রের উপকরণ যোগাইয়াছে। রাষ্ট্রবিধানে গোবিন্দ-লাল হয়ত অপরাধী সাব্যস্থ হন নাই; কিন্তু মানবতার বিধানে ভ্রমর কি গোবিন্দলালকে ক্ষমা করিতে পারে? আইনের বিচারে গোবিন্দলাল নিরপরাধ হইলেও ভ্রমর স্বীয় মানবিক মর্যাদা বোধের জন্য নারীহন্তা স্বামীকে গ্রহণে অক্ষম। মৃত্যুই মানুষের চরম দণ্ড কিনা এই প্রশ্নও এই উপন্যাসে অনিবার্য-রূপে দেখা দিয়াছে। রোহিণী মরিয়া বাঁচিয়াছিল, না গোবিন্দলাল বাঁচিয়া মরিয়াছিল—ইহা এই উপন্যাসে আজো বিরাট জিজ্ঞাসা হইয়া রহিয়া গিয়াছে। জটিল নারীচরিত্রের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে এই কাহিনীতে। গীতার মর্মবাণী হইতেছে কর্মে মাত্র মানুষের অধিকার কিন্তু কর্মফলে নহে; রোহিণীর হত্যা-

কালে নিশাকরের যুক্তি তাহার উদাহরণ এবং গোবিন্দলালের প্রায়শ্চিত্ত ও সন্ন্যাসে তাহার পরিসমাপ্তি। কৃষ্ণকান্তের উইলের চরম নির্দেশ যে মানুষের আদর্শ শান্তি ভগবদ পাদপদ্মে চিত্ত নিবেদনে এবং সেই নির্দেশ আসিতেছে ভ্রমরের নিকট হইতে, স্বর্গ হইতে। বিধবাবিবাহের প্রচ্ছন্ন আলোচনা, হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্যের আদর্শ, অসংযমের পরিণাম ও প্রায়শ্চিত্ত এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্য ইত্যাদি বহু সামাজিক তত্ত্ব ও ধর্মাদর্শ কৃষ্ণকান্তের উইলের উপকরণ ও প্রেরণা, তাহার কাহিনী গঠনের ও চরিত্রশিল্পের মূলমন্ত্র। সেই কারণে ইহা জগতের একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে। এই উপন্যাসে বঙ্কিম সমসাময়িক বাংলা সমাজের অন্যান্য চিত্রও নিপুণহস্তে অংকণ করিয়াছেন। জমিদার কৃষ্ণকান্ত দৃঢ় চরিত্র হইয়াও দাম্ভিক ও হঠকারী। পিতা মাধবীনাথ স্নেহপ্রবণ হইয়াও উৎকোচদাতা। জালিয়াৎ হরলাল পারিবারিক আভিজাত্য সম্পন্ন হইয়াও অহংকারী, উদ্ধত ও দুর্বিনীত। বন্ধুবৎসল নিশাকর সৌখীন, কপটাচারী ও কৃত্রিম। ক্ষিরীদাসী ভ্রমরের মংগলাকাংখী হইয়াও জনশ্রুতি প্রচারে সবিশেষ উৎসাহী। খানসামা সোনা-রূপা ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস, তাহার নামের সার্থকতা দান করিয়াছে। সার্থকনামা ফিচেল খাঁ মিথ্যাসাক্ষী স্রষ্টা ব্রিটিশ বিচারক ও বিচারালয়ে এবং রাজত্বে পুলিশের কর্মপদ্ধতির নিখুত চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে; গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টার দশ টাকার লোভে সরকারী গোপন সংবাদ মাধবীনাথের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কুটীল প্রতিবেশী এবং কুপরামর্শদাতা। সাধারণ গ্রামবাসীদের পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দাপরায়ণতার উপর এই উপন্যাসের কাহিনী গঠনের ফাঁকে ফাঁকে আলোকপাত করিয়া চরিত্র সৃজনে ও পরিবেশ রচনায় অসামান্য লিপিকুশলতা প্রদর্শন করা হইয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের উইলের কাহিনী সংগঠন আর এক দিক দিয়াও উল্লেখযোগ্য। ইহার বর্ণনা ও ঘটনা সমাবেশ অনেকস্থলে নাটকীয় গতিসঞ্চার করিয়াছে। রোহিণীর অবৈধ প্রণয়, ভ্রমরের অভিমান, গোবিন্দলালের সন্ন্যাস, দাসী ক্ষিরীর কার্যকলাপ ইত্যাদি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। খুব অল্প উপন্যাসে নাটকের সহিত এত সাদৃশ্য দেখা যায়। এমন কি এই উপন্যাসের নামকরণও নাটকীয়। উপন্যাসের নাম ভ্রমর, গোবিন্দলাল, অভিমান, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি যে-কোন একটিই হইতে পারিত। কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নাম দেওয়া এক্ষেত্রে বিশেষ সার্থক হইয়াছে এই কারণে যে, এই উইল, তাহার পরিবর্তন ও চুরিই এই কাহিনীর ও গল্পাংশের মূল উৎস।

যদিও কৃষ্ণকান্তের উইলের বিষয় গুরুগম্ভীর ও সমস্যা-সমাকুল তথাপি বঙ্কিম এই কাহিনীর স্থলে স্থলে ব্যঙ্গ ও কৌতুক মিশ্রিত করিয়া ইহার আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহার কতিপয় ক্ষুদ্র উদাহরণ দিলে বঙ্কিম কিভাবে উপন্যাসের গাম্ভীর্যের সহিত কৌতুক সংমিশ্রণ করিতেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। হরলাল পিতা কৃষ্ণকান্তকে বলিতেছেন 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। আপনাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিব না।' কৃষ্ণকান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিতেছেন, 'হরলাল তুমি যদি বালক হইতে, তবে আজ তোমাকে গুরুমহাশয়কে দিয়া বেত দিতাম।' হরলাল তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের গোঁপ পোড়াইয়াছিলাম, এক্ষণে উইলও সেইরূপ পুড়াইব।' যদিও ব্রহ্মানন্দ ব্রাহ্মণ ছিলেন না এবং যদিও তিনি হরলালের অর্থ ও সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন নাই, তথাপি ব্রহ্মানন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মণের ফলাহারে চিত্র অঙ্কিত করিয়া বঙ্কিম এই বলিয়া কৌতুক করিয়াছেন :

'হায়, ফলাহার! কত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তুমি মর্মান্তিক পীড়া দিয়াছ। এক-দিকে সংক্রামক জ্বর, প্লীহায় উদর পরিপূর্ণ, তাহার উপর ফলাহার উপস্থিত, তখন কাংস্য পাত্র বা কদলীপত্রে সুশোভিত লুচি, সন্দেশ, মিহিদানা, সীতা-ভোগ প্রভৃতির অমলধবল শোভা সন্দর্শন করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি করিবে—ত্যাগ করিবে না আহার করিবে?' এই উপন্যাসে বঙ্কিম আফিঙখোরের একটি ব্যঙ্গচিত্র দিয়াছেন। কৃষ্ণকান্ত আফিঙের নেশায় কি দেখিয়াছিলেন তাহা বঙ্কিম বর্ণনা করিতেছেন :

'তিনি যেন দেখিলেন যে ব্রহ্মার বেটা আসিয়া কৃষ্ণরূপে মহাদেবের কাছে এক ফোঁটা আফিঙ কর্জ লইয়া এই দলিল লিখিয়া দিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বন্ধক রাখিয়াছেন। মহাদেব গাঁজার ঘোরে 'ফোরক্লোজ' করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।' ইহার রচনা-কৌশলের ও কাহিনীর দিক দিয়া তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণকান্ত অহিফেন সেবনে অপ্রকৃতিস্থ না হইলে রোহিণীর উইল চুরি আরও শক্ত হইত। ইহা ব্যতীত গোবিন্দলাল-ভ্রমরের কথোপকথনে ব্যঙ্গ বাঙ্গালী নারীর সহজ রঙ্গপ্রিয়তা প্রকাশ করে। উৎকলবাসী মালীর কৌতুক ইত্যাদির ব্যঙ্গরস কৃষ্ণকান্তের উইলের স্বভাব গম্ভীর বিষয়বস্তুকে ভারাক্রান্ত না করিয়া মাঝে মাঝে হালকা করিয়া পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়াছে। ইহা বঙ্কিমের সাহিত্য-কৌশল।

কোন সাহিত্যিক তাহার জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার সাহিত্য হইতে মুক্ত

রাখিতে পারেন না। প্রচ্ছন্ন বা প্রকটভাবে সেই অভিজ্ঞতা সাহিত্যে রূপান্তর গ্রহণ করে। বঙ্কিমের এই শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাসের পিছনেও বঙ্কিমের পরিবারের ইতিহাস আছে। দায়ভাগ ও পিতার উইলের স্বেচ্ছাচারিতা তাঁহার জীবনে অনেক দুঃখের ও ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুনঃ পুনঃ উইল পরিবর্তন বঙ্কিমপিতা যাদবচন্দ্রের বিষয় বিভাগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন ভ্রমরের দান গোবিন্দলাল অভিমানভরে গ্রহণ করেন নাই, সেইরূপ বঙ্কিমও যাদবচন্দ্রের পরিবর্তিত দলিল ও সঞ্জীবের দান গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। দায়ভাগ অধিকার মত যোগ্য পুত্রকে পিতার বঞ্চনার ছবি কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রতিফলিত। কাঁথীতে কার্যকালে থাকিবার সময় নিমকমহলের জনৈক দেওয়ানের বাড়ীতে তিনি থাকিতেন এবং সেই জমিদার দেওয়ানের নাম ছিল কৃষ্ণকান্ত রায়। সেই বাড়ীর নাম ও নামের প্রভাব কেহ কেহ বলেন কৃষ্ণ-কান্তের উইলে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার যখন ভ্রমর বলিতেছে 'সাত বৎসর হইল ওখানে ফুলবাগান ছিল। বে-মেরামতে গিয়াছে, আমি সাত বৎসর দেখি নাই'— সেই কথার ভিতরেও বঙ্কিমের নিজের জীবনের ইতিহাসের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম যখন তাঁহার পিতার বিষয় বিভাগে দুঃখিত হইয়া কাঁটাল-পাড়া ছাড়িয়া আসেন, তখন তাঁহার কাঁটালপাড়ার অর্জুনাতীরস্থিত বাগানের অবস্থাও সেইরূপ হয়। এই বাগান তাঁহার অতি সাধের ও যত্নের বাগান ছিল, যাহা তিনি তাঁহার বৃত্তির টাকা দিয়া হুগলী কলেজের মালীকে দিয়া বহুভাবে সাজাইয়াছিলেন। গোবিন্দলাল যখন একা 'দেহাতে' যাইবেন বলিলেন তখন ভ্রমর যেভাবে কাঁদিয়াছিল, যেরূপ অস্থির হইয়াছিল, যে ব্যবহার করিয়াছিল— তাহার যে বিশদ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত বঙ্কিমকে যখন একা যশোহরের কর্মক্ষেত্রে যাইতে হইয়াছিল, তখন তাঁহার ষোড়শবর্ষীয়া প্রথমা স্ত্রী মোহিনীর আচরণের সাদৃশ্য মিলিবে। নিজের জীবনের উপকরণ, অভিজ্ঞতা ও ঘটনা বহু কৌশলে বঙ্কিম কৃষ্ণকান্তের উইলের কাহিনী ও চরিত্র-গঠনে ব্যবহার করিয়াছেন।

এই কৌশল বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষে'ও ব্যবহার করিয়াছেন। বিষবৃক্ষ কৃষ্ণকান্তের উইলের পাঁচ বৎসর পূর্বের রচনা। বঙ্কিমের বয়স তখন ৩৪।৩৫ বৎসর। বারুইপুরের নিকটবর্তী মজিলপুরে বিষবৃক্ষের পরিকল্পনা। কিন্তু বহরম-পুরে ইহা ফলে-পুষ্পে বিভূষিত হয়। বিষবৃক্ষের সপ্তম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র দত্তর যে ঠাকুরবাড়ীর বর্ণনা আছে তাহাতে বঙ্কিমের কুলদেবতা রাধাবল্লভের মন্দিরের নিত্যসেবার ছায়াপাত আছে। জমিদারবাবুর বৃহদায়তন বাড়ীই বিষবৃক্ষের

দত্তবাড়ী আর কাল্পনিক গোবিন্দপুর সত্যিকারের মজিলপুর। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী রাজলক্ষ্মীর চরিত্র বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীতে প্রতিভাত। বঙ্কিম স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে বিষবৃক্ষে তাঁহার জীবনের ছায়া আছে যদিও তাহাতে অনেক কল্পনাও অবশ্যই আসিয়াছে। বারুইপুরে থাকিবার কালে বঙ্কিম জগদীশনাথ রায়কে অকৃত্রিম বন্ধুরূপে পাইয়াছিলেন এবং তিনি এই বিষবৃক্ষ জগদীশনাথ রায়ের নামে উৎসর্গ করেন। বিষবৃক্ষে হরদেব ঘোষাল জগদীশ-নাথের আদর্শে অঙ্কিত। জীবনের পাতা যখন উপন্যাসের পাতায় তাহার রেখাপাত করে তখন কাহিনী হয় বাস্তব, চরিত্র হয় সজীব।

কৃষকান্তের উইলের ন্যায় বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের পূর্ণাবয়ব সামাজিক উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে ফাল্গুন অবধি বিষবৃক্ষ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বিধবাবিবাহ লইয়া সমাজে ঘোর আলোচনা চলিতেছে। সেই আলোচনার তরঙ্গাঘাত এই উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, সূর্যমুখী ননদ কমলমণিকে বলিতেছে :

'এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সেদিন ন্যায়কচকচী ঠাকুর মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বিধবা-বিবাহের তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। পরদিন প্রভাতে সার্বভৌম ঠাকুর বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। আর বড় কেহ বিধবাবিবাহের দিকে নন্।'

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণীয় প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং সেই সময়ে বঙ্কিম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

এই দুই সামাজিক উপন্যাস, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল, গম্ভীর রসাত্মক রচনা ও উভয়েরই পরিণাম বিষাদময়। উভয় উপন্যাসেই বিপদের মূল কারণ দুর্দমনীয় রূপতৃষ্ণা এবং রমণীর রূপের আকর্ষণে পুরুষের অসংযম? বিষবৃক্ষে অতিপ্রাকৃত জগতের পরিচয় আছে কুন্দের স্বপ্নদর্শনে। জীবন সমুদ্র মন্থনে বিষোদ্গার বিষবৃক্ষের প্রধান বিষয়। আত্মসংযমে অক্ষম নগেন্দ্রনাথের রূপের প্রলোভন কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখীর জীবনে আলোড়ন আনিয়াছিল। সাহিত্য-কলার দৃষ্টিতে বঙ্কিম বহু জিনিস অব্যক্ত রাখিয়াও অস্পষ্ট আভাস দিয়া অব্যক্তকে ব্যক্ত ও মুখর করিয়াছেন, অস্পষ্টকে স্পষ্ট করিয়াছেন। কমলমণির নিকট সূর্যমুখীর পত্রে নগেন্দ্রনাথের প্রেমের বিকার প্রথম প্রকাশ পায়। কমলমণির সহজ নারীসুলভ অনুভূতি কুন্দনন্দিনীর গোপন প্রেম আবিষ্কার

করিতে অক্ষম হইল। হরিদাসী বৈষ্ণবীর আত্মপরিচয় প্রকাশ করিল হীরা। ইহার ফল, কুন্দের চরিত্রে সন্দেহ, সূর্যমুখীর তীব্র তিরস্কার এবং অভিমানিনী কুন্দনন্দিনীর গৃহত্যাগ। প্রত্যাগতা কুন্দনন্দিনীকে সূর্যমুখীর সাদরে গ্রহণ এবং তাহার সহিত স্বামীর বিবাহ সম্পন্ন বিষবৃক্ষের কাহিনী ও চরিত্র গঠনের এক বিশিষ্ট উপকরণ। দ্বিতীয় উপাদান মনস্তত্ব বিশ্লেষণ,—যখন এই প্রবল ক্রিয়ার প্রবলতর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সেই প্রবল প্রতিক্রিয়ার বহ্নিতে প্রথম আহূতি সূর্যমুখী নিজে। সূর্যমুখী অসহ্য মনোবেদনায় গৃহত্যাগ করিল। ইহার পর নিমেষে যেন সমস্ত পটপরিবর্তন হইয়া গেল। মাত্র একপক্ষ সময়ের মধ্যেই নগেন্দ্রনাথের আমূল মানসিক পরিবর্তন ঘটিল। নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীকে ত্যাগ করিয়া বিদেশযাত্রা করিলেন কিন্তু সূর্যমুখীর নিকট ফিরিয়া যাওয়ার পথে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতুলনীয় শব্দচাতুর্যে, ঘটনাসমাবেশে এবং মনস্তত্বের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে বঙ্কিম নগেন্দ্রনাথের এই অনুতাপ ও আত্মগ্লানি চিত্রিত করিয়াছেন। বিষবৃক্ষের শেষ ও অন্তিম ফল কুন্দনন্দিনীর আত্মোৎসর্গ।

রোহিণীর ও কুন্দনন্দিনীর কাহিনী বিধবাবিবাহ লইয়া তৎকালীন সামাজিক আলোড়নের চিত্র মাত্র।

উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের অপর একটি কৌশল এইস্থলে লক্ষ্যণীয়। বিষবৃক্ষে কাহিনীর অনেক মুখ্য অংশ পত্রের সাহায্য বর্ণিত হইয়াছে। দুর্গেশনন্দিনীতেও বঙ্কিম এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথ ও হরদেব ঘোষালের পত্র অন্য শ্রেণীর। কৃষ্ণকান্তের উইলে ভ্রমরের পত্র ও গোবিন্দলালের পত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য বিশেষ একটি সংকল্প জনাইবার জন্য। কিন্তু সূর্যমুখীর পত্রের ভাব ও রীতি অন্যপ্রকারের। তাহাতে নাটকোচিত রীতির প্রভাব আছে। অন্যপদ্ধতিতে যাহা প্রকাশ করিতে বহু সময় লাগিত এই কৌশল অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম সেই সময় সঙ্কোচ করিয়াছেন ও ভাবকে আরও ব্যঞ্জনাপূর্ণ করিয়াছেন। এইসকল পত্রের অন্য তাৎপর্য এই যে, এগুলি শুধু সংবাদ বহন করে না, চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশেও সাহায্য করে। ইংরেজী উপন্যাসেও কতিপয় সাহিত্যিক এই রীতি অবলম্বন করিয়াছেন; যেমন রিচার্ডসন্ বহুভাবে তাঁহার উপন্যাসে পত্রকৌশল ব্যবহার করিয়াছেন।

মোহিতলাল মজুমদারের মতে বিষবৃক্ষ বঙ্কিমের কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা। ইহার স্বপক্ষে তিনি প্রধান যুক্তি ও কারণ দেখাইয়াছেন এই বলিয়া—

"ইহাতে একটি ঘটনা, একটি চরিত্র, একটি বাক্যও কমবেশী নাই। এই 'ইকনমি অফ মিন্‌স্‌' (economy of means) বঙ্কিমের সকল উপন্যাসের বিশিষ্ট গুণ হইলেও, বিষবৃক্ষে ইহার চূড়ান্ত বিকাশ হইয়াছে।"

কাহিনী বর্ণনার দিক দিয়া বিষবৃক্ষে প্রাকৃতিক পটভূমি বহুস্থলে সুন্দরভাবে উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক ঘটনার সুন্দর বর্ণনা কাহিনীকে মনোমোহন করিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রা, গঙ্গাতীরস্থ স্নানের ঘাট, নিদাঘ-ঝটিকা বৃষ্টির বর্ণনা। যদিও বিষবৃক্ষ শোকাত্মক এবং গম্ভীর তথাপি এই উপন্যাসে হাস্যরসের অভাব পূরণ করিয়াছে শ্রীশের ও কমলের যুদ্ধবিগ্রহ ও সতীশের শিশুসুলভ চাপল্য। বিষবৃক্ষের বিষে অনেকেই জর্জরিত হইয়াছিল, হয় নাই কেবল কমলমণি। বিষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, যদিও চেষ্টাসত্ত্বেও সে নিজে বিষবৃক্ষের বীজ ধ্বংস করিতে পারে নাই।

ইহা বলা অবান্তর হইবে না যে, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমকে অতিরিক্ত একটি ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল এবং তাহাতে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলা বিবাহে অসুখী ছিলেন এবং তিনি তাঁহার জীবনান্ত ঘটাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন এই বিষপ্রয়োগের সাহায্যে। এই শোকাবহ ঘটনা ঘটে ৮ই নভেম্বর, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, উৎপলার স্বামীর বাঁশতলার গৃহে। চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন, 'আমিই কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি। আর আমার অদৃষ্টে আমারই মেয়ে বিষ খেয়ে মরেছে।' অনেক দুঃখ করে বঙ্কিম শ্রীশচন্দ্র চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন :

'শ্রীশ, আমার না জন্মিলেই ভাল হ'ত। আমার দ্বারা সমাজের ঘোর অনিষ্ট হবে। কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে আমি অন্য মেয়েদের বিষ খাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি। সেই অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। সেই দৃষ্টান্ত প্রথমেই অনুসরণ করে আমার আপন মেয়ে।' তবে বঙ্কিম বিষবৃক্ষের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন 'আমার বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।' বিষবৃক্ষের উদ্দেশ্য ও আদর্শ তাহাই ছিল ও আছে।

আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্র সৃজনে ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপকরণের ব্যবহার দেখিলাম। এইবার কপালকুণ্ডলায় দেখিব অন্য উপাদান ও ভিন্ন শিল্পকৌশল। বঙ্কিমের বয়স যখন মাত্র ২৮ বৎসর, তখন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার দ্বিতীয় উপন্যাস।

২৮ বৎসর বয়সের যুবকের পক্ষে এই রকম পরিণত সাহিত্য ও শিল্পকৌশল যেমন বিস্ময়কর তেমনি বিরাট মনীষার পরিচায়ক।

স্থানীয় ও ভৌগলিক প্রভাব যাহা কপালকুণ্ডলায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে, ইহার রচনা কালে বঙ্কিম চাঁদপুরে নেগুয়ায় অবস্থিত। কপালকুণ্ডলায় বর্ণিত রসুলপুরের নদী, নদীর মোহনা হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত বালিয়াড়ী, বালুস্তুপ, উচ্চস্থানে বাদাম-জাতীয় নানাবিধ বৃক্ষলতাদি এবং দূরস্থ 'তমালতাল বনরাজি' ঐ স্থানের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত মোহানা হইতে দরিয়াপুর যাইতে বালিয়াড়ির বামপার্শ্বে একটি উচ্চস্থান দৃষ্ট হয় এবং সেই উচ্চস্থানেই নবকুমার শবাসনে উপবিষ্ট ভীমদর্শন কাপালিককে দেখিতে পাইয়াছিল। কাঁথীর ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীর প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে একটি কালীবাড়ী আছে। বঙ্কিমের সময় এই মন্দিরে মানবাকার কালীমূর্তি ছিল। কপালকুণ্ডলায় মনুষ্যপ্রমাণ আকারের কালীমূর্তির উল্লেখ আছে। হিজলীর কাঁথী কেবল কপালকুণ্ডলার কল্পনাক্ষেত্র নহে, এই স্থান হইতে দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও সংগৃহীত হইয়াছে। সাহিত্যিক স্থানীয় বহু জিনিস লক্ষ্য করেন যাহা সাধারণ লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ইহা সাহিত্যদৃষ্টির এক লক্ষণ। সাধারণ চক্ষে যাহা হয়ত অতি সামান্য বা দ্রষ্টব্য বলিয়া মনে হয় না, তাহাই সাহিত্যিকের নিকট এক অসামান্য রূপ ধারণ করে। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমের এই সাহিত্যিক দৃষ্টি ও নিরীক্ষণ শক্তি বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা প্রকাশের পর সাহিত্যের রাজসিংহাসনে বঙ্কিম প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'এই উপন্যাস বাহির হওয়ামাত্র বঙ্কিমের যশোরাশি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।' কপালকুণ্ডলার ভাষা কব্যের নিজস্ব ভাষা। ইহাতে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যের প্রাধান্য আছে, কিন্তু তাহা ভাব, ভাষা ও কল্পনার সহিত মিলিত হইয়া এক সুন্দর শব্দালঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। গদ্য ছন্দে অলঙ্কার ব্যবহারের এইরকম উদাহরণ বিরল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে এইচ. এ. ডি. ফিলিপস্ (H. A. D. Philips) ইহার ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী ও ৪ঠা এপ্রিল গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বেঙ্গল থিয়েটারে কপালকুণ্ডলা অভিনীত হয়।

কপালকুণ্ডলার গঠনকৌশল গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের সহিত তুলনা করা যায়। প্রথম হইতেই এক অতিপ্রাকৃতিক ও অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বিষাদময়

পরিণতি যেন অবশ্যম্ভাবী ঘটনার ক্রমসন্নিবেশে দুর্বার কিন্তু স্বচ্ছন্দগতিতে ছুটিয়া চলিতেছে। ইহা নাটকীয় কৌশল ও কাহিনীসংস্থান। এখানে কল্পনা আছে, আদর্শ আছে, ধর্ম আছে ও সংসার আছে। ইহা একাধারে কল্পনাবাদী, আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী এবং সেই বিচারে ইহা গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের চেয়েও অভিনব ও চিত্তাকর্ষক। এক বিরাট প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তি মানুষের জীবন দৃশ্য ও অদৃশ্যভাবে বেষ্টন করিয়া আছে এবং তাহার শাসনে জীবন ও তাহার ঘটনা পরম্পরা অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ইহাই কপালকুণ্ডলার রহস্যগম্ভীর বিষয়, যাহা সাহিত্যের মূর্ছনায় মুখর হইয়া বাজিয়াছে। মনস্তত্ত্বের গভীর প্রশ্ন এই উপন্যাসের উপকরণ। অরণ্য ও সংসার, এই উভয়ের মধ্যে কোথায় মিল ও কোথায় দ্বন্দ্ব, তাহা কাহিনীর গঠননৈপুণ্যে ও চরিত্রচিত্রণের কুশলতায় এক মহাকাব্যে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃতির কোলে লালিত বনের মানুষের সঙ্গে যখন সংসারের মানুষের দেখা হইল তখন উভয়ের মনের মধ্যে কোন্ ভাবের সঞ্চার ও বিনিময় হইল তাহাই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরীর যে কথোপকথন, তাহা যেন দুই বিভিন্ন জগতের লোকের সঙ্গে, ভাষায় মিল আছে কিন্তু ভাবে মিল নাই, কেহই কাহারও ভাব বুঝিতেছে না। মানুষে মানুষে সবচেয়ে বড় বাধা মনের বাধা। অন্য ব্যবধান তাহার তুলনায় তুচ্ছ। তন্ত্রের ব্যভিচারের প্রতি অশ্রদ্ধা বঙ্কিমের কাপালিক চরিত্রে দৃষ্ট হয় যদিও তাহার ইঙ্গিত অস্পষ্ট; কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বঙ্কিমের নিজের জীবনে তিনি তন্ত্রমন্ত্রে অবিশ্বাসী ছিলেন না। এই উপন্যাসের আর একটি কৌশল হইল যে বঙ্কিম কাহিনীকে সংক্ষেপ করিয়া ঘটনা পরম্পরাকে এক নাটকীয় দ্রুতগতি দান করিয়াছেন।

এই সকল কারণে কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের অন্য সকল উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র, বিশিষ্ট, মৌলিক ও অভিনব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় প্রকাশিত এই রকম উপন্যাস বিরল।

বঙ্কিমের সর্বপ্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। ইহা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বঙ্কিম যখন ২৪ বৎসরের যুবক, তখন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার রচনা আরম্ভ হয়। যখন তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে খুলনায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন ইহার বেশীর ভাগ অংশ লিখিত হয়। তিনি ইহা সম্পূর্ণ করেন বারুইপুরে আসিয়া। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আজ দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম প্রকাশ হইতে পূর্ণ এক শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী যুগের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের

দুলাল', কিন্তু ইহার সহিত দুর্গেশনন্দিনীর পার্থক্য অপরিসীম এবং সাহিত্যে সেই পার্থক্য নবযুগ প্রবর্তনের নির্দেশ করে।

বাংলাসাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনী ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। এই এক উপন্যাস দ্বারা বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের অনন্ত বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ইহার পর উপন্যাসের সীমা, বিস্তার ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পথে আর কোন শৃঙ্খল বা অবরোধ রহিল না। সেই কারণে বলা হয় যে, বঙ্কিম বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাসের পথিকৃৎ।

উপন্যাসের বহু রুদ্ধ দুয়ার দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম প্রথম উদ্ঘাটন করেন। ইহার প্রথম বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিক পটভূমির ব্যবহার এবং তাহার সাহায্যে কাহিনীসৃজন। ইহার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য চিত্তাকর্ষক ও অভিনব কাহিনী গঠনের কৌশল। ইহার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নরনারীর হৃদয়াবেগকে গীতিকাব্য হইতে কাহিনীকাব্যে রূপান্তরিত করা। ইহার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য সন্ন্যাসী চরিত্রের অবতারণা করিয়া ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সহিত পরিচয় সাধন করা। দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম আর একটি উপকরণ কৌশলের সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহারিক জীবনে স্বপ্নের প্রভাব। বিষবৃক্ষে ও রজনীতে বঙ্কিম বিশেষভাবে এই স্বপ্নের ব্যবহার দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহার অঙ্কুর দুর্গেশনন্দিনীতেই প্রথম দেখা যায়। যথা, আরোগ্যলাভের পর তিলোত্তমা রোগশয্যায় জগৎসিংহকে স্বপ্নের যে বিবরণটি বলিয়াছিলেন। স্বপ্নের সহিত জীবনের আদান প্রদান ও যোগাযোগ বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায় এবং দুর্গেশনন্দিনীতেই ইহার প্রথম পরিচয়।

দুর্গেশনন্দিনী যে নূতন সাহিত্যযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, সাহিত্য পরিষদের পত্রিকার ১৩০৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় লিখিয়াছেন :

'যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্য আকাশে সহসা একটা নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সেই বালার্কিরণে প্রফুল্ল হইল, সেই দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতি গান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দ রব উঠিল। বঙ্গবাসীগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে, একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।'

প্রথম উপন্যাস বলিয়া, অনেক সাহিত্যিক দুর্গেশনন্দিনীতে অপরিণতির চিহ্ন দেখিয়াছেন। একথা বলা হইয়াছে যে, ইহা ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে, ঐতিহাসিক তথ্যগুলি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হয় নাই, মোগল-পাঠানের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত অতি ক্ষীণ, এবং ঐতিহাসিক চরিত্র—যথা, মানসিংহ, কত্‌লু খাঁ প্রভৃতির চরিত্র ঠিক ইতিহাসসম্মত হয় নাই। কিন্তু ঐতিহাসিক শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, বঙ্গসাহিত্যে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিম্বদন্তী আছে, বঙ্কিমের খুল্লপিতামহ গল্পের ছলে বঙ্কিমকে 'গড় মান্দারণের' কাহিনী বলিয়াছিলেন এবং সেই স্মৃতিই দুর্গেশনন্দিনী রচনায় প্রথম প্রেরণার উৎস।

বঙ্কিম নিজে দুর্গেশনন্দিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া রচনা করেন নাই। ঐতিহাসিক ভূমিকা বাংলা উপন্যাসের পাঠক কিভাবে লইবেন, তিনি দুর্গেশনন্দিনীতে তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। সুকৌশলী সাহিত্যিকরূপে বঙ্কিম বাংলাসাহিত্যের পাঠকের মন প্রস্তুত করিতেছিলেন। বাংলার গদ্য-সাহিত্যে ইতিহাসের নামগন্ধ ছিল না, সেখানে প্রথমেই একটি পুরাপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস বোধ হয় সেই যুগের পাঠকের পক্ষে নিতান্ত গুরুভার হইয়া যাইত। সাহিত্যিককে সাময়িক মনের সহিত খানিকটা অন্ততঃ সংযোগ রাখিয়া চলিতে হয়। ইহার পূর্ণ ব্যতিক্রম হইলে সাহিত্য সিদ্ধ হয় না।

দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে ঘটনার বৈচিত্র্য ও কাহিনীর সংগঠননৈপুণ্যই প্রধান আকর্ষণ। চরিত্র সৃষ্টি ও কথোপকথন গৌণ। দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচকগণ বলেন যে, এই উপন্যাসে চরিত্র গঠনের গভীরতা নাই, আছে শুধু কেবল ঘটনা ও কাহিনীরহস্য। বোধ হয় বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে ঘটনা ও কাহিনীবিন্যাসের উপরই জোর দিয়াছিলেন। ঘটনাবৈচিত্র ও কাহিনীরহস্যের দ্বারা পাঠকের আগ্রহ বজায় রাখিয়া, পাঠককে উপন্যাসের নূতন সম্ভাবনায় দীক্ষিত করাই বোধহয় বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য তিনি সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পর বঙ্কিমের একসঙ্গে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই-ই হইয়াছিল—তিনি নাকি বাংলাসাহিত্যের স্যার ওয়ালটার স্কট। অখ্যাতি যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, এই উপন্যাসে বঙ্কিম স্কটের 'আইভ্যান হো' হইতে অবিকল নকল করিয়াছেন। তদানীন্তন 'পাওনিয়ার' কাগজ লিখিয়াছিল যে, বঙ্কিম সাহিত্য জগতে 'তস্করের কার্য করিয়াছিল।' এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বঙ্কিম স্বয়ং এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রনাথ বসু

ও কালীনাথ দত্ত প্রমাণ করিয়াছেন যে বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী লিখিবার পূর্বে স্কটের 'আইভ্যান হো' পড়েন নাই। সে প্রমাণ অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকে সবিস্তারে ও যুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়াছেন যে, দুর্গেশনন্দিনীর সহিত 'আইভ্যান হো'র সাদৃশ্য থাকিলেও উপন্যাস হিসাবে তাহা বহুভাবে বিভিন্ন ও মৌলিক রচনা। প্রফেসর কাওয়েল (Prof. Cowell) ম্যাকমিলন ম্যাগাজিনে (Macmillan Magazine) লণ্ডনে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছেন যে দুর্গেশনন্দিনী 'আইভ্যান হো'র অনুকরণ নহে। স্কটের সহিত বঙ্কিমের তুলনার মূল কারণ এই যে উভয়ই ঐতিহাসিক তথ্য ও ঐতিহাসিক ভূমিকা তাঁহাদের উপন্যাসের বিষয় করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমের জীবদ্দশায় দুর্গেশনন্দিনীর তেরটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে শেষ সংস্করণ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বাহির হয় এবং ১৪০০ এরও বেশী পুস্তক বিক্রীত হয়, যাহা তখনকার দিনে অভাবনীয় ছিল। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন 'চিফটেন্স ডটার' (Chieftain's daughter)—এই নাম দিয়া। ইহার হিন্দী অনুবাদ করেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রী কে. কৃষ্ণ, এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে শ্রী জি. সিংহ। কানারী ভাষায় শ্রীবেনকাটাচারী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দুর্গেশনন্দিনীর অনুবাদ প্রকাশ করেন। দুর্গেশনন্দিনী প্রথম বাংলা উপন্যাস যাহা রোমান হরফে ছাপা হইয়াছিল এবং তাহা করিয়াছিলেন জে. আর. ব্রাউন এবং শ্রীহর-প্রসাদ শাস্ত্রী। ইহা মুদ্রিত হয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে থ্যাকার স্পিন্ক কোম্পানীর দ্বারা। বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম অভিনীত হয় ২০শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে।

'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিম আর একটি নূতন কাহিনী ও চরিত্র গঠনের কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সহিত রাজনৈতিক জগতের এক অভিনব সম্মিলন হইয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনের উপর রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাব এই উপন্যাসের এক বিশেষ উপকরণ। ইহাতেও বঙ্কিম প্রথম পথপ্রদর্শক এবং বহু আধুনিক উপন্যাস আজ সেই পথ অবলম্বন করিয়াছে। চন্দ্রশেখরে দেশের সহজ সরল সংসারযাত্রার উপর রাজনৈতিক প্রবাহের তরঙ্গ আনিয়াছে এবং এই দৃষ্টিতে এই উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই আগামী বা প্রায় আগত যুগের সংবাদ। নূতন ইংরাজ শাসকের সহিত দেশের জীবনের পরিচয় ও ভাবের বিনিময় করিয়া এই উপন্যাস নূতন উপকরণের

নূতন ব্যবহার দেখাইয়াছে। সর্বব্যাপী অরাজকতা, নৈতিক অবনতি, কেন্দ্রীয়-শক্তির শিথিলতা এই উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা করিয়াছে। শৈবলিনী ও ফস্টরের সম্বন্ধ ও সম্পর্ক ইহার নিদর্শন। ফস্টর বলপ্রয়োগে শৈবলিনীকে হরণ করিলেও, শৈবলিনী যে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিল তাহা নহে। ফস্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীর উদ্ধার, শৈবলিনীর প্রত্যুপকার, গঙ্গাবক্ষে প্রতাপ-শৈবলিনীর স্মরণীয় সন্তরণ, মুসলমান কর্তৃক অমিয়েটের নৌকা আক্রমণ, ইংরাজের বীরত্ব ইত্যাদি চন্দ্রশেখরের কাহিনীকে মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করিয়াছে। শৈবলিনীর কাহিনীর সহিত দলনীর কাহিনী যুক্ত করিয়া কাহিনীকে নূতন কৌশলে গঠন করা হইয়াছে; যাহার একদিক করুণ এবং আর একদিক সতেজ; একদিকে যেমন দলনীর বিষপান, অন্যদিকে তেমনি প্রতাপ মৃত্যুকালে রুদ্ধ প্রেমের আবেগে সন্ন্যাসীকে প্রত্যুত্তর দিতেছে, 'কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী, এ ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা'।

এই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে মূল পটভূমিকা রচনা করিয়াছে শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসেমের পরাজয়। লক্ষ্মণ সেনের প্রতি বঙ্কিম কোন শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই এবং এই উপন্যাসে লক্ষ্মণ সেনের চরিত্র অকর্মণ্যতার ও কাপুরুষতার চিত্র। কিন্তু মীরকাসিম বীরের মতন যুদ্ধ করিয়া তাঁহার জন্মভূমি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহস, ন্যায় অন্যায় বিচারশক্তি ও প্রজাবাৎসল্য বঙ্কিম বিভিন্ন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে বাংলার নবাব দুইটি সাম্রাজ্য হারাইয়াছেন—প্রথম বাংলার রাজসিংহাসন যাহা তিনি চেষ্টা করিলেও রাখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ—দ্বিতীয় সাম্রাজ্য 'দলনীবেগমের হৃদয়' যে অজেয় রাজ্য বিনা যত্নে থাকিত। ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া দুইটি প্রেমের চিত্রের দ্বারা—দলনীবেগম-নবাবের প্রেম এবং প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের প্রেম—বঙ্কিম কাহিনীর সঙ্গে চরিত্রের এক অভিনব পরিণয় ঘটাইয়া নূতন সাহিত্য-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর ছয় খণ্ডে বিভক্ত। ইহা ব্যতীত একটি উপক্রমণিকাও আছে। প্রধানতঃ শৈবলিনীর জীবন ও চরিত্র অবলম্বন করিয়া ঘটনা সন্নিবেশ করা হইয়াছে। খণ্ডগুলির নামকরণের তাৎপর্য আছে; যথা 'পাপীয়সী', 'পাপ', 'পুণ্যের স্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'প্রচ্ছাদন' ও 'সিদ্ধি'। ইহার দ্বারা বঙ্কিম চন্দ্রশেখরের বিষয়বস্তু, প্রতিপাদ্য বিষয় ও উপন্যাসের উপকরণগুলিকে নির্দেশ করিতেছেন। ইহাতে কাহিনীর রচনা-কৌশল বর্ধিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর

বস্তুতঃ শৈবলিনীর জীবনমাল্যের প্রধান অলঙ্কার কিন্তু দলনীকাহিনীও সেই মালার সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিম সুনিপুণ দক্ষতায় এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি ও সমাধান করিয়াছেন। তাহা এই যে, দলনী নিষ্পাপ এবং শৈবলিনীও ফস্টরের উপপত্নী নহে। কাহিনী আরও রহস্যময় হইয়াছে যখন দেখি শৈবলিনীর জীবনস্রোতে একদিকে প্রতাপ অন্যদিকে চন্দ্রশেখর। এই দুই বিপরীত প্রবাহের তরঙ্গাঘাত একই সঙ্গে চলিয়াছে।

চন্দ্রশেখরে একটি বিশেষ প্রশ্ন হইল, বঙ্কিম প্রতাপের জীবন উৎসর্গের দ্বারা কি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। সে জীবন উৎসর্গের সার্থকতা কি? চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সুখের জন্য প্রতাপ তাহার নিজের জীবন উৎসর্গ করিল কেন? সে রূপসীর কথা ভাবিল না কেন? ইহা কি নৈতিকভাবে সঙ্গত? না ইহার দ্বারা অবৈধ প্রণয়ের পরিণতি দেখান হইয়াছে? আবার কাহিনী ও চরিত্রায়ণের দিক দিয়া, ইহা বলা যাইতে পারে যে ইহার দ্বারা বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে অবৈধ প্রেম বিধিসঙ্গত না হইলেও, তাহা দিব্য ও সুন্দর হইতে পারে। প্রতাপ নিজের জীবন ত্যাগ করিয়া শৈবলিনীকে মুক্ত করিলেন, ইহা তাহারই নিদর্শন। প্রতাপের মৃত্যু ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত একদিক দিয়া সমভাবে দিব্য ও সুন্দর, যেমন রামানন্দ স্বামীর ঐশী যোগ-শক্তি দিব্য ও সুন্দর।

অনেক সমালোচক কুলসম্ ও শৈবলিনীচরিত্রে সেক্স্‌পীয়ারের নাটকের রচনানীতির প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে কুলসম্ 'ওথেলো' নাটকের 'এমিলিয়ার' অনুকরণ। 'এমিলিয়ার' ন্যায় সে প্রভুপত্নীর অনুরাগী এবং তাহারই ন্যায় সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। কুলসম্ যেন এক খেয়ালের বশে দলনীকে ত্যাগ করিয়া নবাবকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া সজাগ ও সচেতন করিল। এই সাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়া আবার অনেক সমালোচক বলিয়াছেন যে, শৈবলিনীর উন্মাদগ্রস্ত চিত্র নাকি সেক্স্‌পীয়ারের রাজা লীয়ারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজা লীয়ার বিকারের মধ্যে শুধু তাঁহার অকৃতজ্ঞ মেয়েদের কথা বলিয়াছিলেন ও ভাবিয়াছিলেন এবং আত্মীয়জনকে 'গর্ণেরিল' ও 'রিগান' ভাবিয়া ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষিপ্তপ্রায় শৈবলিনী বিকৃত দৃষ্টিতে লরেন্স ফষ্টর ও পার্বতীকে দেখিতে পাইয়াছিল। চন্দ্রশেখরকে লরেন্স ফষ্টর ভাবিয়াছিল এবং সুন্দরীকে পার্বতী বলিয়া ভুল করিয়াছিল। সুতরাং সেক্স্‌পীয়ারের সহিত এইরূপ সাদৃশ্য অন্বেষণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। সেক্স্‌পীয়ারের বিষয়বস্তু ছিল ভিন্ন; যথা পিতার প্রতি সন্তানের

অকৃতজ্ঞতা। মূলতঃ সেই কারণে চন্দ্রশেখরের সহিত সেক্স্‌পীয়ারের নাটকের কোন সাদৃশ্য নাই।

চন্দ্রশেখরে লরেন্স ফষ্টরের চরিত্র অনেকে বলেন 'হিলি' নামে এক ইংরেজ সন্তানকে উপলক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছে। এই 'হিলি' ছিল এক দুর্বৃত্ত অত্যাচারী ইংরাজ নীলকর ব্যবসায়ী,—যাহাকে বঙ্কিম খুলনায় হাকিমি করার কালে শাসন করিয়াছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম চন্দ্রশেখর উপন্যাস প্রকাশ করেন। ইহা ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে ১২৮১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। বহরমপুরে বঙ্কিম চন্দ্রশেখরের প্রথম স্তবক রচনা করিয়াছিলেন। এই বহরমপুরের গঙ্গা দেখিয়া বঙ্কিমের প্রতাপ বলিয়াছিল, 'আয় শৈবলিনী, ঝাঁপ দিই।'

যেমন দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস, দেবীচৌধুরাণী তাঁহার বড় উপন্যাসের মধ্যে শেষ উপন্যাস যদিও ইহা সর্বশেষ উপন্যাস নহে। ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং বঙ্গদর্শনে ১২৮৯-৯০ বঙ্গাব্দে আংশিক-ভাবে বাহির হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলনের প্রায় অব্যবহিত পরেই এই উপন্যাস রচিত হয়। সেই আন্দোলন ও বহুবিবাহ বিষয়ে বঙ্কিমের অভিমত দেবী চৌধুরাণীর উপাদান ও উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। বহুবিবাহ করিয়াও ব্রজেশ্বর সুখী। সাংসারিক জীবনে নয়ান বৌ, সাগর বৌ বা প্রফুল্ল আসিয়া তাঁহার সুখের পথ আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই কিম্বা হরবল্লভের গৃহে শান্তি ব্যাহত হয় নাই। বহুবিবাহ বঙ্কিম সমর্থন করেন নাই অথচ তাহা জোর করিয়া আইন বলে নিবারণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সুশিক্ষার ফলে কালক্রমে এ প্রথা হিন্দু সমাজ হইতে স্বতঃই লুপ্ত হইবে ইহাই বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত ও সুচিন্তিত অভিমত।

দেবী চৌধুরাণীর জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দুজাতি ও সমাজকে গীতার কর্মযোগ ও নিষ্কাম ধর্মে শিক্ষা দেওয়াই এই উপন্যাসে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল। দেবী চৌধুরাণী তাহার কর্মফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছিল। দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রের মাধ্যমে, অনাসক্তি, ইন্দ্রিয় সংযম, নিরহঙ্কার ও শরণাগতি, এই চারিটি গীতোক্ত উপদেশ বঙ্কিম দেশবাসীর সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন। গীতার আদর্শ নারীচরিত্রে প্রতিফলিত করিয়া বঙ্কিম নূতন আদর্শ সৃষ্টি না করিলেও সেই আদর্শের নূতন রূপ ও নূতন

চরিত্র গঠন করিয়াছেন। গীতার অর্জুন যে সংসারক্ষেত্রে স্ত্রীচরিত্রও হইতে পারে ইহা বাংলা এবং ভারতীয় সাহিত্যে নূতন দিক্‌দর্শন। বীরাঙ্গনা নারী সেই আদর্শের আধার, তাহাই বঙ্কিম এই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র গঠনে দেখাইয়াছেন।

কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টির উপকরণ রূপে বঙ্কিম দেবী চৌধুরাণীকে ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্মতত্ব, ইতিহাস, সমাজ সমস্যা ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে চিত্র এই উপন্যাসে দেখিতে পাই, তাহাতে দেখি কেমন করিয়া প্রতিবেশিগণ দল পাকাইয়া নিরপরাধ বিধবাকে বিপন্ন করিতে পারে এবং কেমন করিয়া তাহারাই আবার প্রকৃত সঙ্কটকালে স্বীয় দোষ স্বীকার করিয়া নিরুপায় যুবতীর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়। সংসারক্ষেত্রে ও সমাজ-জীবনে একাধারে কলহ, পরশ্রীকাতরতা, নীচতা, দুর্বলতা, স্নেহ, করুণা, মাধুর্য ও কদর্যতা কিভাবে অবস্থান করে তাহার চিত্র দেবী চৌধুরাণীর কাহিনীতে আমরা দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটি পিতাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছেন 'যাঁহার কাছে প্রথমে নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম, যিনি স্বয়ং নিষ্কাম-ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন, যিনি পুণ্যফলে স্বর্গারূঢ়, তাঁহার পবিত্র পাদ-পদ্মে এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম।'

এইবার সীতারামের কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা সঙ্গত হইবে। সীতারাম বঙ্কিমের সর্বশেষ উপন্যাস। ইহা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয় এবং ১২৯১ হইতে ১২৯৩ বঙ্গাব্দের 'প্রচার' পত্রিকায় তিন বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক সীতারাম সম্বন্ধে বঙ্কিম কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র ঝিনাইদহের শাসনভার গ্রহণ করেন। ঝিনাইদহ, যশোহর হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে এবং জঙ্গলাকীর্ণ মহম্মদপুর ইহারই অধীন। এখানকার রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামধারী এক রসিক ব্যক্তি সীতারাম সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বঙ্কিমকে শুনাইত। সীতারাম সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গ্রাম্য কবিতা বঙ্কিম শুনিতে ভালবাসিতেন। সেই গানের কয়েকটি লাইন ছিল—

ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালী বাহাদুর
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর।

এখন বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে
এখন রামী স্বামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্নানে যাবে।

এই রামীস্বামী হইতে সীতারামের রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের উদ্ভব। মহম্মদপুর গ্রামের নামকরণের যে ইতিহাস সীতারামে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও এই সকল তথ্য হইতে সংগৃহীত।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বঙ্কিম স্বয়ং বলিয়াছেন 'এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' বঙ্কিম এই উপন্যাস উৎসর্গ করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে ইহাই দেখাইবার জন্য যে, ইতিহাসকে কিভাবে সরস কাব্যে ও কাহিনীতে পরিণত করা যায়। সীতারামে যে বৈতরিণীর উল্লেখ আছে এবং তৎসংক্রান্ত যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র আছে তাহা বঙ্কিমের জাজপুর ও বালাসোর অবস্থানের স্মৃতির দ্বারা প্রভাবিত। বৈতরিণীর পরের ষ্টেশন জাজপুর; সম্মুখে কটক জেলার উদয়গিরি ও ললিতগিরি আর বালেশ্বর জেলার নীলগিরির অপরূপ দৃশ্য বর্ণনা সীতারামে পাওয়া যায়।

সীতারামে কাহিনী গঠনের এক নূতন কলাকৌশল দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই উপন্যাসে তিনটি কাহিনীর অভিনব একত্র সমাবেশ হইয়াছে। মূল কাহিনী সীতারাম ও শ্রীর বিচিত্র দাম্পত্য জীবন। ইহাতে স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রেম, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আছে কিন্তু সন্ন্যাস-পথগামিনী শ্রী সীতারামের যথার্থ সহধর্মিণী হইতে পারিল না। দ্বিতীয় কাহিনীর বিষয়, মুসলমান্‌ রাজত্বের সময় হিন্দুরা বিধর্মী শক্তির যে পীড়ন অনুভব করিত তাহার বর্ণনা। উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছে কাজী ও ফকিরের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়া। আবার এক মাতৃভূমির সন্তান বলিয়া বিদ্রোহের ভিতরেও শাসক ও শাসিতের ভিতর সখ্যতার ঐক্য সূত্র গড়িয়া উঠিতেছে। ইহাতেও মূলগ্রন্থি হইতেছে সীতারামের স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ হেতু হিন্দুরাজ্য স্থাপনে যত্নবান হওয়া। তৃতীয় কাহিনী এক অবৈধ প্রণয়কে আশ্রয় করিয়া। সেই অবৈধ প্রণয়ের নায়ক হইল গঙ্গারাম এবং নায়িকা রমা। তাহার পরিণতিতে গঙ্গারাম নিহত হইল এবং রমাও রক্ষা পায় নাই।

এই ত্রিধারা বহু খণ্ড ও উপাধারায় সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে উপন্যাস রচনার ভিতর দিয়া। মুরলার সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও তেজ, যমুনার স্বার্থে ও নীতিবোধে দ্বন্দ্ব, পুরাতনের সহিত নূতনের সংঘর্ষ, রাজবৈদ্যের অস্বাভাবিক

আত্মসম্মান বোধ, চন্দ্রচূড়ের ব্রাহ্মণ্য ও ক্ষাত্র তেজ, চাঁদসাহ ফকিরের উদার সর্বধর্মসমন্বয়ী দৃষ্টি, এই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের বিশিষ্ট সম্পদ। ইহা যেমন ঘটনাবহুল তেমনি চরিত্রবহুল এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়াও বহুভাবে জটিল।

এইখানে সীতারামের আর একটি অভিনব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশাল বিক্ষুব্ধ জনতার মন ও ব্যবহার, তাহার প্রকৃতি ও কার্য-কলাপ, তাহার প্রকট ও অপ্রকট রূপ, এই প্রথম বাংলাসাহিত্যে উপন্যাসের বিষয় এবং এই তাহার প্রথম বিশ্লেষণ। সমষ্টিগত জনতার যে একটি সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব আছে এবং সেই সমষ্টিগত ব্যক্তিত্বের আপাতবিশৃঙ্খলতার অন্তরালে যে এক অদৃশ্য শৃঙ্খলা আছে তাহার নিপুণ বর্ণনার দ্বারা বঙ্কিম চরম শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে জনতার মনো-বিজ্ঞানের এক বিরাট জগত বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রথম খুলিয়া দিয়াছেন। এই জনসমুদ্রের পর্যবেক্ষণে বঙ্কিম তিনটি বিশেষ দৃশ্য দেখাইয়াছেন। প্রথম হইল গঙ্গারামের উদ্ধার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ। দ্বিতীয় দৃশ্য রমা ও গঙ্গারামের বিচার। তৃতীয় দৃশ্য জয়ন্তীর বেত্রদণ্ডাজ্ঞা। যখন গঙ্গারামের জীবন্ত সমাধির শাস্তি ঘোষণা হইল এবং সীতারাম প্রার্থনারত তখন সেই বিশাল জনসমুদ্র তটস্থ ও স্তব্ধ। আবার যখন সেই গঙ্গারাম পলায়নরত এবং সীতারামের লক্ষ্য ও অলক্ষ্য ইঙ্গিত তাহার অনুচরবর্গকে নির্দেশ দান করিতেছে, তখন সেই নিস্তব্ধ জনতা 'মার মার' ধ্বনির কোলাহলে ও উত্তেজনায় আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া বিধর্মী প্রতিরোধে ব্যস্ত ও চঞ্চল। পুনরায় দেখা গেল, এই অসংযত জনতার এক অদৃশ্য সংযম আছে যাহা গঙ্গারাম ও জয়ন্তীর বিচারের দৃশ্যে পরিস্ফুট। সেই সংহতির ভিতরে এক অদৃশ্য শক্তি আছে যাহার আশ্বাস রমাকে সাহস দিয়াছিল এবং নন্দাকে জয়ন্তীর রক্ষায় সাহায্য করিয়াছিল। জনতার উত্তেজনা, ব্যর্থতা, কোলাহল, কৌতূহল, উন্মত্ততা, ক্রোধ, সংযম, সংহতি-শক্তি, গাম্ভীর্য, বাতুলতা—এ সমস্তই এমন এক বিপুল সমাবেশের ভিতর দিয়া বঙ্কিম প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাহিত্যে এই প্রকার বর্ণনা, বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্ব ও অনুভূতি অতুলনীয়। সেক্স্‌পীয়ারের জুলিয়াস সিজারে ব্রুটাস ও এণ্টনি নেতৃত্বে ও রোমান নাগরিকদের জনসমাবেশের দৃশ্য বঙ্কিমের এই বর্ণনার নিকট পরাজিত; কারণ সেক্স্‌পীয়ারে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কিভাবে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতার দ্বারা জনতা ও জনমতকে চালিত করে তাহা দেখান। কিন্তু জনসমুদ্রের ব্যষ্টি ও

সমষ্টিগত মনের পরিবর্তনশীল রূপের ও ব্যবহারের যে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা বঙ্কিমের সীতারামে আছে, তাহা সেক্স্‌পীয়ারে নাই।

'সীতারাম' উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃত ধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। গীতার শ্লোকসমষ্টি ইহার মুখবন্ধ। ইহার সমাপ্তিও সেই নিষ্কাম ধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুশাসিত। সীতারাম রচনা করিবার সময় বঙ্কিমের নিজের জীবনের গতির বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ ঝিনাইদহে অবস্থান কালে আমিষ ভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হন এবং তাঁহার বহুদিনের বিদেশী অভ্যাস কাঁটা চামচে খাওয়া ত্যাগ করেন। সীতারাম রচনা বঙ্কিমকে সর্বতোভাবে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করিয়াছিল। সাহিত্যিক এবং তাহার সাহিত্যের মধ্যে এক দুর্জ্ঞেয় আদান প্রদান আছে। সাহিত্যিক যেমন সাহিত্য সৃষ্টি করে তেমনি সাহিত্য আবার সাহিত্যিক সৃষ্টি করে। বঙ্কিম যেমন সীতারাম সৃষ্টি করিয়াছিলেন তেমনি সীতারামও এক অপূর্ব-ভাবে বঙ্কিমকে সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রকৃত সাহিত্যিক ও প্রকৃত সাহিত্য পরস্পরের পথপ্রদর্শক। সেখানে পথ ও পথিক এক। বঙ্কিম-সাহিত্যে ইহা জলন্ত সত্য।

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ইহাকে শুধু উপন্যাস-রূপে বিচার করিলে ইহার সমগ্র রূপ, বিশাল আদর্শ ও বিরাট প্রভাব জানা যাইবে না। উপন্যাসের ও কাহিনীর বহু ঊর্ধ্বে আনন্দমঠ। তবে এই অধ্যায়ে শুধু ইহার কাহিনী ও চরিত্রশিল্প আলোচনা করিব। অনেক সমালোচক এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন যে আনন্দমঠ উপন্যাসরূপে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। যতবার পড়িয়াছি আনন্দমঠ আকর্ষণ করিয়াছে। কাহিনীর দিক দিয়া মহেন্দ্রর গৃহত্যাগ, কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়া তাহার যাত্রা, সেই যাত্রায় স্ত্রী-কন্যা হারাইয়া যাওয়া, সেই যাত্রাপথে দেশের অবস্থা দর্শন, শান্তি ও জীবানন্দের বিরহ ও মিলন, মহেন্দ্রের সহিত স্ত্রী-কন্যার পুনর্মিলন, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগঠন, বিপ্লব ও যুদ্ধ, ধর্মের, স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি সেবার ও প্রেমের আদর্শ কাহিনীকে এমন এক উদার বিস্তৃতি দান করিয়াছে যাহা উপন্যাসে বিরল। একটি উপন্যাসের কাহিনীর ভিতর দিয়া একটি সমগ্র জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ এমন সর্বাঙ্গীনভাবে আর কোন উপন্যাসে এবং জগতের কোন সাহিত্যে নাই বলিলেই চলে।

বহু চিন্তা ও সাধনার পরিণতি এই 'আনন্দমঠ'। ইহাতেই প্রথম প্রকৃত সনাতন ধর্ম কি, বঙ্কিম তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আনন্দমঠের উপকরণ ও

উপজীব্য শুধু স্বদেশপ্রেম নহে। দেশ কাহাকে বলে, সে দেশের রূপ কি ও আধার কি, কোথায় তাহার জীবন ও প্রাণের মহিমা, সেই যথার্থ দেশের শাশ্বত আদর্শ কি, তাহার ভগবান, জীবন, মৃত্যু, সাধনা, সমাজ, সংসার ও রাষ্ট্রের কি ধারা—তাহাই এই মহাকাব্যের ও মহা-উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই উপন্যাসের উপসংহারে যে চিত্র বঙ্কিম দেখাইয়াছেন, তাহাতে জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে, ধর্ম আসিয়া কর্মকে কেন্দ্র করিয়াছে, বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে নির্লিপ্ত করিয়াছে। বহু উপকরণে আনন্দমঠ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রথম তাহার বাস্তব পটভূমি : অর্থনৈতিক সমস্যা, দারিদ্র্য, অরাজকতা, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের নগ্ন নিদারুণ দৃশ্য। বঙ্কিম তাই দেশের ভীষণ অবস্থার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতেছেন যে 'মীরকাসেম গুলি খায়, ইংরাজ টাকা আদায় করে আর ডেসপ্যাচ্ লেখে, বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্নে যায়।' আনন্দমঠ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরের কথা তখন খুবই প্রচারিত ছিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডায়মণ্ডহারবারের কথা ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের কথাও আনন্দমঠে বর্ণিত হইয়াছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গে এক সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হয়, এবং তাহাতে নাগা ও শৈব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বহু সন্ন্যাসী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমের মনে ছিল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের চিত্র। ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরাজয় আজ মনে হয় আনন্দমঠের ভবিষ্যদ্বাণী।

আনন্দমঠের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মনুষ্য চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও অভিব্যক্তি। সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসের আদর্শ, নারীর নারী-আদর্শ, সন্তানের কর্মযজ্ঞ অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম আনন্দমঠে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। আনন্দমঠের উপক্রমণিকাটি বঙ্কিম বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুত করিতেছিলেন। বঙ্কিম তাঁহার 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে জাতি প্রতিষ্ঠার আশা এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা পরিকল্পনা করিয়াছেন। আনন্দমঠে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, কোন্ বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতির দ্বারা সেই আশা পূর্ণ করিতে হইবে। ক্রমবিকাশের দিক দিয়া ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে, আনন্দমঠে স্বামী সত্যানন্দ কমলাকান্তের কর্ম-পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন। কমলাকান্ত সত্যানন্দের পূর্বপুরুষ ছিলেন। সত্যানন্দ আদর্শনেতা, জীবানন্দ ও নবীনানন্দ আদর্শ কর্মী। ভবানন্দ না থাকিলে সে আদর্শ পূর্ণতা পাইত না। নারী চরিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে

'শান্তির' জীবনে, যাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

আনন্দমঠের প্রথম ও শেষ কথা 'বন্দেমাতরম্'। ইহা আনন্দমঠের মূলমন্ত্র। ইহাই আধুনিক ভারতের বেদমন্ত্র। সেই মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় বন্দেমাতরম্ লইয়া বঙ্কিমের সহিত অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। কবিবর নবীন সেন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বন্দেমাতরম্ গীত ফরাসী জাতীয় সংগীত 'মার্সেলিজের' ন্যায় ভবিষ্যতে গীত হইবে। 'মারসেলিজ' বিদ্রোহ উদ্দীপক কিন্তু বন্দেমাতরম্ কর্মপ্রবর্তক ও ভক্তিমূলক এবং বন্দেমাতরমে অন্তঃদৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি উভয়ই বর্তমান।

যখন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেন যে বন্দেমাতরম্ সবটাই সংস্কৃতে হইলে এবং ইহাতে বাংলা ব্যবহার না করিলে ভাল হইত, তখন বঙ্কিম তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'তুমি গানটি গাইতে শুন নাই, গাইতে শুনিলে এ-কথা আর বলিতে না।' নবীন সেন মহাশয় আরও বলিয়াছিলেন 'আমার বিশ্বাস ইহা ভারতীয় জাতীয় সংগীত হইবে, সেইজন্য গীতটির মাঝে বাংলা থাকিলে অন্যস্থানের লোক বুঝিতে পারিবে না। এই কারণেই সমস্ত গীতটি ভারতীয় জাতীয় সংগীত হইতে পারিবে না।' নবীনচন্দ্রের এই আশঙ্কা সত্ত্বেও ইহা ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে নাই।

বঙ্কিম বলিয়াছিলেন 'একদিন এই গানে দেশ, ধুলো থেকে গাছের পাতা, আকাশ বাতাস পর্যন্ত, অগ্নিকণার মতন গরম হইবে।' ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যখন ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রথম আলোড়ন আরম্ভ হয়, তখন 'বন্দেমাতরম্' সমস্ত দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেই গান শুনিয়া স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছিলেন 'ব্রিটিশ রাজত্বের পতনের এই সূত্রপাত' (This is the beginning of the end of the British Rule) ইহারই অব্যবহিত পরের দৃশ্য বাংলার ও ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন, যখন ক্ষুদীরাম, কানাইলাল প্রভৃতি বীরগণ বন্দেমাতরম্ গাহিতে গাহিতে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের ও স্বদেশের জয়গান করিতেছেন। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আত্মত্যাগী যুবক এই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করেন। 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' প্রভৃতি সংগঠন আনন্দমঠের আদর্শে সন্তান সম্প্রদায় ও সন্তান সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিদ্রিত ভারতে নূতন জাগরণ ও চেতনা আনয়ন করে এবং ভারতের আসমুদ্র-

হিমাচল আকাশবাতাস বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত করিয়া তোলে। 'অনুশীলন' সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় পি. মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন—"এই গীতটির একটি সুর বসাইয়া ইহা গাওয়া হইত। পরে যদুভট্ট গানটিতে সুর দিয়াছিলেন। বঙ্কিম তাঁহাকে ৫০২ টাকা মাসিক বেতন দিতেন। বহুদিন পরে বন্দেমাতরম্ সম্প্রদায় 'কোরাসে' গাহিবার জন্য মিশ্রসুর বসাইয়াছিলেন। পরে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী অন্য একটি সুর দান করেন। ইহাতে বেহাগ সুর ব্যবহার কাহারও কাহারও ভাল লাগিত।" আনন্দমঠ প্রকাশিত হইবার কয়েক বছর পরেই দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'কংগ্রেস' জন্মলাভ করে, এবং সেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের প্রতি সভার, প্রতি অধিবেশনের, প্রতি স্বদেশীয় আন্দোলনের, বীজমন্ত্র ছিল এই ষড়াক্ষরী মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্।' শ্রীঅরবিন্দ এই মন্ত্রে প্রথম প্রেরণা লাভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন :

The song is not only a national anthem as the European nations look upon their own, but one replete with mighty power, being a Sacred Mantra, revealed to us by the author of 'Ananda Math', who might be called an inspired Rishi.

'বন্দেমাতরম্' বহরমপুরে কি কাঁটালপাড়ায় প্রথম রচিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন তবে ইহা নিশ্চয় যে 'আনন্দমঠ' রচনার পূর্বে ইহা বঙ্কিম রচনা করিয়াছিলেন। 'আনন্দমঠ' ইহার উপযুক্ত স্থান বলিয়া তিনি এই মহামন্ত্র-সংগীত আনন্দমঠের অন্তর্গত করেন। ইহা বলিলে ভ্রমাত্মক হইবে না যে বঙ্কিমের 'আমার দুর্গোৎসব' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং ১৮৭৪ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ভিতর 'বন্দেমাতরম্' রচিত হইয়া থাকিবে। আনন্দমঠের জন্য বন্দেমাতরম্ লিখিত হয় নাই। বন্দেমাতরমের জন্যই বরং আনন্দমঠ লিখিত হইয়াছিল।

জগতের ইতিহাসে ও সাহিত্যে কোন সংগীত এমনভাবে একটা সমগ্র জাতির বিপুল জাগরণে সহায়তা করিয়াছে বলিয়া জানা নাই। এই সংগীতে আছে জ্ঞান, কর্ম, ধর্ম, ভক্তি, প্রাণ, প্রেম ও শক্তি—যাহার সমন্বয় মূর্তি হইতেছে দেশমাতৃকা। ইহা শুধু রাজনীতির দেশপ্রেম নহে। ইহা ভারতের অন্তরাত্মার শাশ্বত উক্তি। বন্দেমাতরমের দেশপ্রেম জগতে দুর্লভ। ইহা পরাধীন জাতির মুক্তিমন্ত্র হইয়া রাজনৈতিক বন্ধন মোচন করিয়াছে। ইহা স্বাধীন জাতির অভ্যুদয় মন্ত্র যাহা মানবপ্রকৃতিকে সকল শৃঙ্খল হইতে যুগে যুগে মুক্তি প্রদান করে। ইহা সকল সুপ্ত স্মৃতির জাগরণ মন্ত্র।

আনন্দমঠ ধারাবাহিক ভাবে ১২৮৭-৮৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। ইহার রচনার স্থল হুগলীর জোড়াঘাটস্থিত গৃহ যেখানে বঙ্কিম অবস্থান করিতেন। চুঁচুড়াবাসী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতে পাওয়া যায় যে সুরজ্ঞ গায়ক ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঐ সময়ে বঙ্কিমের সহিত হুগলীতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তিনি প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় আসিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া বন্দেমাতরমে মল্লারের সুর দিতেন ও বঙ্কিম তাঁহার হাতে লেখা খাতা হইতে অক্ষয়বাবুকে আনন্দমঠের শেষ অংশে যুদ্ধের ভাগ পড়িয়া শুনাইতেন।

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের অবতারণা করেন প্রথমে বঙ্কিম। যদিও বঙ্কিম-যুগে সকল গল্প ও কাহিনীকে উপন্যাস বলা হইত তথাপি বঙ্কিমের 'ইন্দিরা', 'রজনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' আধুনিক আখ্যায় ছোটগল্প। 'ইন্দিরা' ছোটগল্প বা ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাস, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার কাহিনী সামান্য। দস্যুহস্তে অপহরণের পর ইন্দিরার দুঃখ ও স্বামীর সহিত পুনর্মিলনের কৌশল ইহার প্রধান কাহিনী। ইন্দিরা, সুভাষিণী, তাহার শাশুড়ী 'কালীর বোতল', পাচিকা সোনার মা ও হারানী ঝি কাহিনীকে শুধু সজীব করে নাই, পরিহাস ও হাস্যরসে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। ইন্দিরা চরিত্রে অসীম কৌতুকপ্রিয়তা ছোটগল্পকে মনোহর করিয়াছে। ইন্দিরা দুঃখেও কৌতুকপরায়ণা, যাহা বাঙ্গালী নারী চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ। তদুপরি সে নিজে বিদ্যাধরী। স্ত্রীজাতির মোহবুদ্ধির কৌশল ও স্বামীকে বশীভূত করার প্রচেষ্টা বঙ্কিম খুব সাহিত্য-চাতুর্যের সহিত দেখাইয়াছেন। সুভাষিণীর সরল ও সহৃদয় সহানুভূতি, গৃহিণীর স্বভাবসুলভ সন্দেহ ও পুত্রবাৎসল্য, সোনার 'মা'র কৌতুক ও ঈর্ষা যদিও গভীর চরিত্র বিশ্লেষণের পরিচয় দেয় না, তথাপি সাধারণ জীবনের এই সকল উপকরণই এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের মৌলিক উপকরণ হিসাবে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে।

উপরন্তু এই ছোট উপন্যাসে বঙ্কিম এক নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, যাহা গল্পের ও কাহিনীর দিক দিয়া বাংলা-সাহিত্যে অভিনব আবিষ্কার। এই প্রণালী হইল, আখ্যায়িকা নিজে বর্ণনা না করিয়া তাহা তাহার সৃষ্ট চরিত্রের দ্বারা বর্ণনা করাইলেন। ইন্দিরাতে ইন্দিরা স্বয়ং ভাষ্যকার। যখন ছোট ভগিনী কামিনী ইন্দিরাকে প্রশ্ন করিল 'দিদি, শ্বশুরবাড়ী কেমন তাহা কিছু জানিস না?' তখন ইন্দিরা এই প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিল তাহার

ভিতর কৌতুক যেমন ছিল, তেমনি ছিল বিজ্ঞ মন্তব্য :

'জানি সে নন্দন বন, সেখানে রতিপতি পারিজাতফুলের বান মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণ বাতাস বয়, অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উঠে।'

যেমন ইন্দিরায়, তেমনি রজনীতে। বঙ্কিমের গ্রন্থকারকে অন্তরালে রাখিয়া কাহিনীর চরিত্রের মুখ দিয়া সেই চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে রজনীর কাহিনী বহু চরিত্রের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া বলান হইয়াছে। অন্ধ নায়িকা নিজেই যে নিজের কথা বলিতেছে তাহা নহে, অন্যান্য চরিত্রও তাহাকে বর্ণনা করিতেছে। অন্য লোকের বিবরণে রজনী কোমল, লজ্জাবনত, প্রকাশবিমুখ, নিঃস্বার্থ ও সমবেদনাপূর্ণ প্রকৃতির। কিন্তু যখন রজনী তাহার নিজের ভাষ্যকার, তখন সে পরিহাসময়, মৃদুবিদ্রূপময়ী ও কুশলী যুক্তি-পরায়ণা। অথচ রজনীর নিজের কথায় গভীর দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। রজনীর শান্ত স্তব্ধ পাষাণময়ী মূর্তির অন্তরালে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন প্রেমের অনির্বাণ অগ্নি। অন্ধের কামোন্মাদনা ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্কিম রজনীতে এক অনির্বচনীয় নারী-চরিত্র সৃষ্টি করিলেন যাহা ছোট গল্পের এক নূতন ভবিষ্যৎ খুলিয়া দিল।

অন্ধের আত্মজিজ্ঞাসা ও তাহার মনস্তত্ব নিয়া লেখা বাংলা-সাহিত্যে নতুন এবং জগৎ-সাহিত্যেও বিরল। কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব রজনীর রমণী চরিত্রকে একাধারে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক করিয়াছে। ইহা বঙ্কিমের এক অনন্যসাধারণ চরিত্রসৃষ্টি। অমরনাথ বা শচীন্দ্র রজনীকে প্রেমিকের দৃষ্টিতে দেখিতেছে ও বর্ণনা করিতেছে। লবঙ্গলতা বাহির হইতে রজনীকে দেখিতেছে একটি পর-দুঃখকাতরা দয়াবতী রমণী। হীরালালের সহিত রজনীর গৃহত্যাগ এবং বিজন গঙ্গাসৈকতে তাহাকে বিসর্জন শুধু বর্তমানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ ভাবা ভুল হইবে। তাই ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সমালোচনা করিয়াছেন যে অন্ধ রজনীর পক্ষে অপরের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি খানিক অসামঞ্জস্য আনিয়াছে। কিন্তু অন্ধের মনস্তত্ব যদি দেখা যায় তাহা হইলে বলিতে হইবে রজনীর বহির্চক্ষু অন্ধ হইলেও তাহার অন্তঃচক্ষু অদ্ভূতভাবে দীপ্তিমান ছিল। ইহা বিজ্ঞান-সম্মত যে যাহারা অন্ধ তাহাদের অন্য ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি ও বোধ অনেকক্ষেত্রে সাধারণ চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। শচীন্দ্র প্রশ্ন করিয়াছে : 'অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? 'শরীরতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান বলিতেছে

তাহা হইতে পারে এবং তাহার বহু উদাহরণ বাস্তব জীবনে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে এই মনোবিজ্ঞানের প্রথম চিত্র বঙ্কিমের রজনী।

রজনী ক্ষুদ্র উপন্যাস বা ছোট গল্প, আর একটি সাহিত্য কৌশলের পরিচয় দেয়। নাটকীয় সংস্থান ইহাতে বহুল পরিমাণে আছে। তাহার উদাহরণ, রজনীর গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জনের পর তাহার উদ্ধারকর্তা অমরনাথের উক্তি, আবার অমরনাথের দ্বারা রজনীর বিষয় উদ্ধারের পথ নির্ণীত হইবার পর, শচীন্দ্রের উক্তি।

বাংলা কাহিনীসাহিত্যের ইতিহাসে রজনীর এক বিশিষ্ট স্থান চিরকালই থাকিবে এবং তাহা এই যে বাংলা ভাষায় ইহাই সর্বপ্রথম অন্ধের মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী। এই দিক দিয়া বিচার করিলে 'ডষ্টয়েভ্‌সকি'র বা 'ইবসেনে'র কয়েকটি রচনার সহিত বঙ্কিমের রজনীর তুলনা করা যাইতে পারে, যেমন 'ইডিয়ট'। ছোট গল্পের ভিতর 'মৃণালিনী' ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহার উপজীব্য বিষয় ইতিহাস ও প্রণয়। চরিত্রগুলি সজীব ও বাস্তব। মৃণালিনী শান্ত ও ক্ষমাশীলা। দুঃখ তাহাকে শুধু অভিজ্ঞতা দেয় নাই, তাহাকে তেজস্বিনীও করিয়াছে। বঙ্কিম মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের চিত্র এই কাহিনীতে অঙ্কিত করিয়াছেন। এক রাজনৈতিক সংকট-সন্ধিক্ষণে, হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য, পশুপতি ও লক্ষ্মণসেন এক শান্তিপ্রিয় জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। আবার অন্যদিকে এক সাধনানিমগ্ন ব্রাহ্মণ আর এক রাজ্যবঞ্চিত প্রণয়-পাগল রাজপুত্র—এই মুসলমান সাম্রাজ্যবাদের ঘোরতর পরিপন্থী। এই বৈপরীত্য সৃষ্টি করিয়া এই কাহিনী এক নূতন সাহিত্য-কৌশল দেখাইয়াছে। পশুপতির সহিত মৃণালিনীর প্রেমে বাহ্যিক বিরোধ ও ঔদাসীন্যের ভিতর গোপন আকর্ষণ আবার হেমচন্দ্র ও মৃণালিনীর সম্বন্ধে বিপরীত প্রবাহ সৃষ্টি করিয়াছে।

বঙ্কিমের যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারানী উভয়ই ছোট গল্প। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এবং ১২৮০ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে তাহা বাহির হয়। ইহা তাম্রলিপ্তের স্মৃতি বহন করে। ইহার এক বৎসর পরে, ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রাধারানী প্রকাশিত হয়। এই উভয় কাহিনীর বৈশিষ্ট্য চরিত্রসৃজনে নহে, ঘটনা বিন্যাসের চাতুর্যে। ইহার কোনটিই দুঃখমূলক বা বিষাদাত্মক নহে। যুগলাঙ্গুরীয় অতীত যুগের কাহিনী কিন্তু রাধারানী আধুনিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। প্রথমটিতে বণিক সম্প্রদায়ের ও বণিক সমাজের চিত্র এবং নায়ক ও নায়িকা দুইজনেই সেই শ্রেণীভুক্ত। হিরন্ময়ী ও পুরন্দরের প্রেম সমাজ-

বিরুদ্ধ ও অসাধারণ, যদিও অতীতের কাহিনী বলিয়া তাহা বিসদৃশ মনে হয় না। কিন্তু রাধারানীতে আধুনিক যুগের সন্দেহ ও অবিশ্বাস আছে এবং সেইজন্য রাধারানীর প্রেম আধুনিক যুগের। রাধারানীর সহিত রুক্মিনী-কুমারের আদানপ্রদানে সুদীর্ঘ চারি বৎসর ধরিয়া বহু বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

এই চারিটি কাহিনীতে বঙ্কিম বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের পথ দেখাইয়াছেন। ছোট গল্প ও উপন্যাসে কি পার্থক্য এবং তাহাদের মধ্যে সীমা-রেখা কোথায় তাহার কোন সুনিশ্চিত মাপকাঠি নাই। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, উপন্যাসে একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় ভাবধারা বর্তমান, ছোটগল্পে তাহা নহে এবং উপন্যাসে নায়ক-নায়িকা বর্তমান, কিন্তু ছোটগল্পে তাহা নহে। অবশ্য এই মানদণ্ডে উপন্যাসের ও ছোটগল্পের পার্থক্য সব সময়ে নির্ণয় করা যায় না। ছোটগল্পের নায়ক-নায়িকা থাকিতে পারে এবং তাহাতে একটি কেন্দ্রীয় ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। গঠন ও আয়তনের দিক দিয়াও ছোটগল্প যে সকল সময়ে ছোট তাহা নহে। বঙ্কিম যে যুগে উপন্যাস লিখিয়াছিলেন, সে যুগের উপন্যাস সাধারণতঃ বৃহদাকার হইত, যাহার তুলনায় বঙ্কিমের কোন উপন্যাসই যথেষ্ট দীর্ঘ নহে।

পরিশেষে বঙ্কিমের কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণরীতির আলোচনা সমাপ্ত করিতে হইলে, তাঁহার 'রাজমোহনের স্ত্রী'র উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাস, দুর্গেশনন্দিনী নহে। এই উপন্যাস বঙ্কিম সর্বপ্রথম ইংরেজীতে লিখিয়াছিলেন এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' নামক পত্রে এই ইংরেজী উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্কিম নিজে এই উপন্যাস গ্রন্থাকারে কখনও প্রকাশ করেন নাই। পরবর্তীকালে বঙ্কিম এই ইংরেজী উপন্যাসের সাতটি অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয়টি অধ্যায় ইংরাজী 'রাজমোহনের স্ত্রী'র বঙ্কিমকৃত অনুবাদ। যে-কোন কারণেই হউক বঙ্কিম ইহার অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন নাই এবং গ্রন্থাকারেও প্রকাশ করেন নাই।

এই উপন্যাসের কাহিনীর উপকরণ হইল গার্হস্থ্য জীবন। মাধবের বাড়ীতে ডাকাতি এই কাহিনীর কেন্দ্র। গৃহবিবাদ ও মামলা মকদ্দমা ইহার বিষয়বস্তু। মাতঙ্গিনী রাজমোহনের স্ত্রী ও সচ্চরিত্র। রাজমোহন অশিক্ষিত, সন্দিগ্ধচিত্ত, বর্বর ও দস্যুদলসংশ্লিষ্ট। মাতঙ্গিনীর সহিত মাধবের পূর্ব প্রণয় ছিল, কিন্তু

উভয়েই চরিত্রবলে বাল্যের আকর্ষণকে সংযত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

যদিও ইংরেজীতে লিখিত, তথাপি বঙ্কিমের এই প্রথম উপন্যাসে, তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ঘটনা সমাবেশ এই উপন্যাসে চতুর। মাধব ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতির চেষ্টা, মাতঙ্গিনীর সংবাদ-দান, মাতঙ্গিনীর পলায়ন, মাতঙ্গিনী ও মাধবের অবরোধ, বহির্গমন ও মুক্তি, মথুরের আত্মহত্যা কাহিনীকে প্রতি পদক্ষেপে সজীব ও সজাগ রাখিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই উপন্যাসে উইল হস্তগত করার কথা ও জমিদার বাড়ীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র পরবর্তীকালের কৃষ্ণকান্তের উইল ও নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর চিত্রের অগ্রদূত। তৃতীয়তঃ, এই উপন্যাসে দস্যু সর্দার, তাহার অনুচর ভিক্ষু ও তাহাদের বন্ধু রাজমোহন পরবর্তী কালের আনন্দমঠে ও দেবীচৌধুরণীর পূর্বসূচনা মনে করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র দুই সাধ্বী রমনী, কিন্তু তাহাদের স্বামী মথুর ও রাজমোহন পাপাসক্ত। কোন কোন সমালোচক বলেন ইহা সূর্যমুখী ও ভ্রমরের পূর্বাভাস।

এই আলোচনায় আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র সৃজন-পদ্ধতির পর্যালোচনা করিলাম। ইহার উপাদান ও উপকরণের বৈচিত্র্য দেখিলাম। ইতিহাস, সমাজ, সংসার, রাষ্ট্র, ধর্ম এই ব্যাপক শিল্পকর্মের অন্তর্গত। দাম্পত্যপ্রেম, মিলন, বিরহ, অভিসার, অভিমান, মনোমালিন্য, পুন-র্মিলন ইহার উপজীব্য বিষয়। অবৈধ প্রেম, প্রলোভন ও পতন, সনাতন বিষয় হইলেও বঙ্কিম তাহা হইতে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন ও অভিনব সাহিত্য কৌশলে ও ভাবসংযমে কাহিনী গঠন করিয়াছেন। সামাজিক, সাংসারিক, রাষ্ট্র-নৈতিক সমস্যার বিচিত্ররূপ তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রের উপকরণ হইয়াছে। স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, জাতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা ও আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত বঙ্কিম তাঁহার বিভিন্ন উপন্যাসে বহুভাবে বহু চরিত্রে ও কাহিনীতে প্রকাশ করিয়াছেন। হয়ত একটি অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এই যে বঙ্কিম-সাহিত্যে মানুষের সহিত পশুপক্ষীর সাহচর্য ও প্রীতি কোথাও তাঁহার মনকে আকর্ষণ করে নাই। প্রকৃতির প্রায় সকল ঐশ্বর্যই তাঁহার কাহিনীর বিষয় হইয়াছে, হয় নাই কেবল মানুষের জীবনের সহিত অন্যান্য প্রাণীজগতের আদানপ্রদান। বঙ্কিমের উপন্যাসের সমগ্র ক্ষেত্র পরিক্রমণ করিলে ইহা বলিতে হইবে যে বঙ্কিম-উপন্যাস সর্বাঙ্গীণভাবে আধুনিক। পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরাও বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমের এই সর্বাঙ্গীণ আধুনিকতার ও

ভূয়োদর্শনের সীমা অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

বঙ্কিম রোপণ করিয়াছিলেন সাহিত্যের এক অক্ষয়বট। মানবমনের ফল্গু-তটে তাহা আজ বিরাট মহীরুহরূপে প্রতীয়মান। তাহার প্রাণস্পর্শে ও শীতল ছায়ায় বহু সংসার-পথিক জীবনের, ধর্মের, সমাজের, সংসারের ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নূতন করিয়া খুঁজিয়া শান্তি ও প্রেরণা পাইয়াছে ও পাইতেছে। কতকগুলি পরিস্থিতি ও চরিত্র যাহা বঙ্কিম সৃজন করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী, অক্ষয় ও অমর। যতদিন মানবমন থাকিবে ততদিন 'বিষবৃক্ষ' থাকিবে। সংসারে আজও 'বিষবৃক্ষ' দেখা যায়। আজও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচিত হয়। আজও প্রতাপ গৃহস্থ হইয়াও গৃহহীন, সে আজও যুদ্ধ করিতেছে ও নিজেকে আত্মোৎসর্গ করিতেছে। সহনশীল চন্দ্রশেখর নীরবতার অন্তরালে আজও সহ্য করিয়া যাইতেছে। মুচীরাম গুড় এখনও বর্তমান ও তৎপর। কমলাকান্তকে এখনও দেখা যায় এবং দেখা হইলে চেনা যায়। সূর্যমুখী ও ভ্রমর এখনও নিষ্ঠার সহিত সংসারধর্ম পালন ও রক্ষা করিতেছে। শৈবলিনী ও রোহিনীও বর্তমানে বিরল নহে এবং যথেষ্ট সক্রিয়। নবকুমার আজও অরণ্যের সরলতার সহিত জটিল সংসারের মিলন ঘটাইতে পারে নাই এবং আজও কপালকুন্ডলা হৃদয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির সহজ স্বাধীনতার কোলে ফিরিয়া যাইতে চায়। চাঁদশা ফকির হাল ছাড়িয়া দেন নাই, তিনি এখনও ধর্মের সংঘর্ষকে ধর্ম-সমন্বয়ে পরিণত করিতে যত্নবান। জীবানন্দ ও ভবানন্দ আজও দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। মাধবাচার্য, ভবানী পাঠক, অভিরাম গোস্বামী, রামানন্দ স্বামী, সত্যানন্দ ও গঙ্গাধর স্বামী বর্তমানেও সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়াও বিপন্ন ও বিভ্রান্ত গৃহস্থাশ্রমীকে পথ দেখাইতেছেন। যতদিন জগতে মনুষ্যচরিত্র থাকিবে ততদিন বঙ্কিমসৃষ্ট চরিত্র সচেতন ও জাগ্রত থাকিবে, কোনদিন তাহা পুরাতন হইবে না।

৬

বঙ্কিমের নারী-চরিত্র

যখনই পুরুষ নারীচরিত্র, নারীপ্রকৃতি ও নারীর স্বভাব বর্ণনা করিতে গিয়াছে তখন তাহাতে বহু বিড়ম্বনা দেখা দিয়াছে। সে বিড়ম্বনা কখনও কল্পনার, কখনও যুক্তির, কখনও বিলাসের, কখনও আলাপের, কখনও বিলাপের, কখনও বা ঈর্ষার। জগতের সাহিত্যে পুরুষ বহুবার এই নারী-চরিত্র বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজেকে ভুলাইয়াছে, জগতকে ডুবাইয়াছে এবং সাহিত্যকে পুষ্পিত করিতে কণ্টকিত করিয়াছে। সেই সাহিত্য পড়িবার যাহাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য হইয়াছে তাহারা জানেন যে সাহিত্যে শেষ কথা কেহ বলিতে পারেন নাই। নারী স্বর্গের সোপান, নরকের দ্বার ও মর্ত্যের ছায়াছবি। ত্রিভুবনব্যাপিনী এই নারীকে পুরুষ কখনও চিনিতে পারে নাই, যেদিন সে চিনিবে সেদিন সাহিত্য ও সাহিত্যিক অন্তর্ধান করিবে। সেই কারণে সাহিত্যের নারী জগতে অভিসারে বাহির হইয়াছে এক অন্তহীন অন্বেষণে। পুরুষ নারী বলিয়া সৃষ্টি করিয়াছে এক অলীক জীব যাহা অজ্ঞেয় না হইলেও দুর্জ্ঞেয় ও বিরল। তবে যাহা অলীক তাহাও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; কারণ সাহিত্যে ভ্রান্তিরও স্থান আছে, যদি তাহা সাহিত্যে সত্য-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। জগতের সাহিত্য দেখিলে, নারী যে কি এবং কি নহে তাহা ধারণা করা প্রায় অসম্ভব।

বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে যে নারীচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা যেমন বৈচিত্রময়ী তেমনি সনাতন এবং তাহাদের বিচিত্র রূপ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সূর্যমুখী পতিব্রতা সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অঙ্কিত। বঙ্কিম তাই নগেন্দ্রনাথের উক্তিতে সূর্যমুখীর আলেখ্য আঁকিতে গিয়া বলিতেছেন :

'সূর্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী। সূর্যমুখী আমার সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্যে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিণী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী। আমার সূর্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম, কণ্ঠে

অলঙ্কার; আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব। আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ।'

এই সাহিত্য অতুলনীয়, কোন সাহিত্যে ইহার তুলনা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। সহজ মর্মস্পর্শী ভাষা, দিগন্ত প্রসারী দৃষ্টি। ভাবচিত্রে অনুপম, আদর্শে উদার অনন্ত। 'মিনিস্টারিং এন্‌জেল'-এ ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ারথ্‌-এর বিখ্যাত স্ত্রী-চরিত্র বর্ণনা ইহার নিকট ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ। ইহা ভারতবর্ষের অন্তরের কথা, প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা, প্রেমের পরিপূর্ণ চিত্র এবং সহধর্মিণীর পূর্ণ রূপ। পুরুষের সকল অভাব অভিযোগ মোচনকারিণী এই নারী।

সূর্যমুখী পতিপ্রাণা দেবীমূর্তি। কুন্দনন্দিনীর পাশে ইহার মহিমা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখীর ভিতরে আকাশ-পাতাল বৈষম্য কিন্তু উভয়ই নগেন্দ্রর একান্ত অনুরাগিণী। সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিল 'তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল।' আবার কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে বলিতেছে—'আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম। সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই।'

যেখানে দুইটি স্ত্রী চরিত্রই অতুলনীয় সেখানে তুলনা বৃথা। তবে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অপূর্ব ভাব ও ভাষায় এই দুই নারী চরিত্রের বৈষম্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :

'কুন্দ চঞ্চল স্রোতস্বিনী, সূর্যমুখী গভীর সমুদ্র। কুন্দ নয়ন দিয়া দেখিবার সামগ্রী—হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার সামগ্রী নহে। কুন্দ বাহিরের সৌন্দর্য, তাহাকে লইয়া ঘরকন্না করা চলে না। সূর্যমুখী বঙ্গনারীর অলঙ্কার, বঙ্গভূমির অহঙ্কার, নারীহৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।'

সূর্যমুখীকে বন্ধ্যা করিয়া বঙ্কিম এই অনুক্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন যে সন্তান বাৎসল্য যদি এই বিবাহকে দৃঢ় করিত তাহা হইলে নগেন্দ্র হয়ত সংযত হইতে পারিতেন।

বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইলে নারীচরিত্র পূর্ণবিকাশ লাভ করিয়াছে অভিমানিনী ভ্রমরে ও চঞ্চলা রোহিণীতে। ভ্রমর চরিত্র সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভ্রমর চরিত্রে আছে শিশুর কোমলতা ও সরলতা, পুষ্পের নির্মলতা, মহাকাশের উদারতা ও উচ্চতা, রাধিকার প্রেম-বিহ্বলতা, উমার তপস্যা। ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের নারীর অভিমান এক জাতীয় চরিত্র-সম্পদ। ইহা গুণও বটে, দোষও বটে। ইহা লইয়া ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে।

রাধার অভিমান ধর্মের অঙ্গরাগ হইয়াছে এবং ইহাকে ঘিরিয়া বহু কাব্য রচনা করা হইয়াছে। অন্য কোন দেশে বা অন্য কোন সাহিত্যে অভিমানের এত বড় স্থান আছে বলিয়া আমার জানা নাই। এমন কি অন্য কোন ভাষায় ইহার কোন উপযুক্ত প্রতিশব্দ আছে কিনা সন্দেহ। সেই ভারতের ও বাংলার রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় অভিমানের চরম প্রকাশ ভ্রমর চরিত্রে। সেই কারণে সে গোবিন্দলালকে বলিতেছে :

'তবে যাও—পরে আসিও না। বিনা অপরাধে আমাকে ত্যাগ করিতে চাও, কর। একদিন তোমাকে কাঁদিতে হইবে। যদি আমি সতী হই, তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে। এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয় বল যে, আর আসিবে না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আবার আমার জন্য কাঁদিবে। তুমি যাও আমার দুঃখ নাই। তুমি আমারই—রোহিণীর নও।'

এমনি সুন্দর, শাস্বত এই অভিমান যে ইহাতে অহঙ্কার নাই, কিন্তু আত্ম-বিশ্বাস আছে। এই ভ্রমরই ফাল্গুণী পূর্ণিমার দিন তাহার মৃত্যুশয্যায় গোবিন্দলালের প্রতীক্ষা করিয়াছিল এবং শেষ দর্শনে এই কথা বলিয়া গিয়াছিল, 'আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিও।'

ভ্রমরের আদর্শ নারীচরিত্র, কর্তব্যে কঠোর, নীতিতে নিষ্কলুষ, অভিমানে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্বাসে অচলা, জীবনে অপরাজিতা এবং মরণে মৃত্যুঞ্জয়ী।

রোহিণী চঞ্চলা, ক্ষরস্রোতা। গুণময়ী কিন্তু বস্তুতঃ উন্মাদিণী ও বিভ্রান্ত-কারিণী। রোহিণী স্বৈরিণী। সে ব্যাধিণী, পুরুষ শিকার করা ও বধ করা তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি। রোহিণীর মৃগয়াবিহারে নিশাকর বধ অতর্কিত ঘটনা। গোবিন্দলালকে শিকার সুচিন্তিত। রোহিণীর আসঙ্গলিপ্সা প্রবল। সে তাহার নবীন বয়স, রূপ নিয়া নিত্যনূতন সুখের সন্ধানে সর্বদাই সচেতন-দৃষ্টি। অকালবৈধব্যহেতু প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় বিফল জীবনের ব্যর্থ সম্ভোগলিপ্সা ভষ্মাবৃত অগ্নির ন্যায় রোহিণীকে সর্বদা দগ্ধ করিত। হরলালের সামান্য ইঙ্গিতে তাহার রুচি ও বিবেক বিচলিত হইল। তাহার কামাগ্নি মদনকে ভষ্ম করে নাই, সে নিজেই তাহাতে ভষ্মীভূত হইয়াছিল; গোবিন্দ-লালকে দগ্ধ করিয়াছিল, ভ্রমরকে আহুতি দিয়াছিল এবং সমগ্র রায় পরিবারকে ছারখার করিয়াছিল। সর্বগ্রাসী কামনায় রোহিণী উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় শুধু আপনাকে ভাঙ্গিতে চায় না, অপরকেও ভাঙ্গে প্রচণ্ড আঘাতের আলিঙ্গনে। সুতরাং সে প্রগল্‌ভা, কল্লোলপ্রিয়া ও দুঃসাহসিকা! এককালে তাহার

স্বাভাবিক নীতিবোধ ও সংস্কার ছিল যে চুরি ও বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। কিন্তু সে সংস্কারও শেষ অবধি জয়ী হইতে পারে নাই। রোহিণীর বহু আকর্ষণ। সে রন্ধনে দ্রৌপদী, আলপনায় শিল্পী, খয়েরের গহনা গঠনে, ফুলের খেলনায়, সূচের কাজে সুদক্ষা এবং সর্বোপরি স্বয়ং রূপসী। রোহিণীর সম্মানবোধ তীক্ষ্ন, কিন্তু নীতিবোধ বিপর্যস্ত; তাই সে নিজের ও পরের সম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই।

বঙ্কিমের রোহিণী নারীচরিত্র সংযমহীন হইলেও অসুন্দর নহে। এই চরিত্রে বঙ্কিম পাপ ও পাপীকে যেন পৃথক করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্থলে একটি সমালোচনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, রোহিণীর হত্যা যুক্তিবিরুদ্ধ ও কলাবিরুদ্ধ হইয়াছে। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহা কলাবিরুদ্ধ। সমালোচনা করা হইয়াছে—ধর্মনীতি বজায় রাখিবার জন্য বঙ্কিম কলানীতি বিসর্জন করিয়াছেন। গোবিন্দলাল তাহাকে লইয়া প্রসাদপুরে গিয়া বাসা বাঁধিলে রোহিণী সকল-রকম সুখ স্বাচ্ছন্দ পাইয়াও সুপুরুষ সুদর্শন গোবিন্দলালকে পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত নিশাকরের প্রতি কেন অকস্মাৎ আসক্ত হইয়া ঘাটে আসিয়া প্রেমালাপ করিবে? কিন্তু এই অবস্থায় রোহিণী যদি বাঁচিয়া থাকিত, কেবল পুষ্প হইতে পুষ্পে বিচরণ করিত, তবে তাহাকে বারাঙ্গনার জীবনই বহন করিতে হইত। সেই ঘৃণিত জীবনযাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। তাই তাহার মৃত্যু সংঘটন করাইয়া বঙ্কিম বাস্তব জ্ঞানের ও প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ারই পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ রোহিণীর মৃত্যুই কলা ও বাস্তব-সম্মত। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে রোহিণীর হত্যা ভারতীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত নহে এবং হয়ত এই হত্যাকাণ্ডে ইংরেজী ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ও নাটকের প্রভাব পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বঙ্কিম এইখানেও ভারতীয় ও পাশ্চাত্য আদর্শের দ্বন্দ্ব ও তাহাদের বৈষম্য ও পার্থক্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। যখন গোবিন্দলাল বিকারগ্রস্ত অবস্থায় মৃত রোহিণীর অশরীরী কণ্ঠস্বরে মৃত্যুর আহবান শুনিতেছেন—'গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল 'আমি ডুবিব।' অশরীরী রোহিণী কণ্ঠস্বর উত্তর করিতেছে 'হাঁ, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে, তাহার পুণ্যবলে আমাদের উদ্ধার করিবে। প্রায়শ্চিত্ত কর। মর।" তখনি কিন্তু ভ্রমরমূর্তি বলিল—

'মরিবে কেন? মরিও না। আমাকে হারাইয়াছ, তাই মরিবে? বাঁচিলে তাঁহাকে পাইবে।'

যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলিয়াছেন—যিনি পতির চেয়ে প্রিয়, যিনি পত্নীর চেয়েও প্রিয়, যিনি সন্তানের চেয়েও প্রিয়, তিনি অন্বেষণীয় ও প্রাপ্তব্য। তাই রোহিণীর হত্যাতেও ভারত-আদর্শই জয়ী হইতেছে। তাই সন্ন্যাসী গোবিন্দলাল শচীকান্তকে শেষ কথা বলিতেছেন 'ভগবৎ পদে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।' ইহাই যথার্থ সাহিত্যকলা, কারণ ইহা জীবন-কলা। এইখানে সঙ্কীর্ণ সাহিত্য-দৃষ্টিতে জর্জ বার্নার্ড শ'-এর 'মিসেস ওয়ারেনস প্রফেসন'-এর মানদণ্ড অনুযায়ী রোহিণীর জীবনের সম্ভোগ প্রবৃত্তিকে বড় করিয়া দেখিলেই তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ, কলাবিরুদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ হইত।

বঙ্কিমের এক অসাধারণ সৃষ্টি কপালকুণ্ডলার নারীচরিত্র। কপালকুণ্ডলার জীবন বনের মধ্যে কাটিয়াছে। সে অরন্যচারী, সে একাকী ও নিঃসঙ্গ। পরে সে গৃহস্থের সংসারে স্ত্রী হইলেও পূর্ব আশ্রমের সংস্কার তাহার মধ্যে সক্রিয় ছিল। হিজলীতে ভবানীমন্দিরের অধিকারী কপালকুণ্ডলার প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণ কন্যা, বালিকাসুলভ চাপল্যে চঞ্চলা, খৃষ্টান তস্কর কর্তৃক অপহৃতা এবং পরে সমুদ্রতীরে পরিত্যক্তা। কাপালিক ইহাকে পাইয়া আপন তন্ত্রসাধনায় যোগসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিপালন করিয়াছিল।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমের মানসদুহিতা। উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পরিবেশে বঙ্কিম এই অপূর্ব নারীচরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। কপালকুণ্ডলা সাহিত্যিক বঙ্কিমের কবিমনের শুধু মানসী নহে, সে দেবীমূর্তি। এই দেবী-মানসী পথহারা নবকুমারকে কেবল কুটীরের পথ দেখাইয়া নিরস্ত হয় নাই, হাতে ধরিয়া তাহাকে বনের বাহিরে ফিরাইয়া আনিয়াছিল, নিষ্ঠুর কাপালিকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছিল, খড়্গ লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পথহারাকে পথ দেখান দেবীশক্তির কাজ। সে যেন পথহারা অচেতন পুরুষকে পথের সন্ধান ও চেতনা ফিরাইয়া দিল। গৃহস্থকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য সুযোগ করিয়া দিয়া প্রাণে নূতন আশা ও উদ্যম জাগাইল। কাপালিকের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সে নবকুমারকে তাহার সপ্তগ্রাম গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিল, কিন্তু নিজে সেখানে স্থান করিতে পারিল না। কপালকুণ্ডলা যেমন সরল ও অকৃত্রিম, তেমনি বুদ্ধিমতী। কিন্তু সে জানিত প্রকৃতির অরণ্যভূমিই তাহার নিজের একান্ত স্বাভাবিক আশ্রয়। সুতরাং যখন দেখিল যে তাহার জন্য অন্য অযাচিত ও

অপ্রত্যাশিত আশ্রয়ও আছে তখন সে চমকিত হইয়াছিল। জীবন ও সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলা বিবাহে উদাসীন। তাই দেখি অধিকারীর আশ্রমত্যাগের সময় কপালকুণ্ডলার চক্ষুতে অশ্রু। তখনি স্মৃতিপথে আসে সংস্কৃত সাহিত্যের আর এক আশ্রমদুহিতার ছবি, অমর কবি কালিদাসের শকুন্তলা।

কালিদাসের শকুন্তলা ও বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার ভিতর সাদৃশ্যও আছে পার্থক্যও আছে। উভয়েই স্বভাবদুহিতা, উভয়ই পরিত্যক্তা, উভয়ই প্রকৃতির পরিবেশে প্রতিপালিতা। যোগিণীর পক্ষে গৃহিণী হওয়ার বিড়ম্বনা উভয়ের জীবনকেই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তবে কণ্বমুনি করুণ, কাপালিক নিষ্করুণ। শকুন্তলা কণ্বমুনির পালিতা কন্যা, কিন্তু কপালকুণ্ডলা তন্ত্র পথচারী কাপালিকের সাধনার উপকরণ মাত্র। কপালকুণ্ডলার রূপ ছিল কিন্তু সেই রূপের চেতনা ছিল না। শকুন্তলা আভরণাদির ব্যবহার জানিতেন, কপালকুণ্ডলা আভরণে উদাসীনা। কপালকুণ্ডলা গৃহিণী হইতে পারে নাই, তাই সে নিজেও অসুখী, নবকুমারও অতৃপ্ত। সুতরাং শেষ অধ্যায়ে বিসর্জন। জগতকারণময়ী, সুখদুঃখবিধায়িণী কৈবল্য-দায়িণী ভৈরব স্বপ্নে কপালকুণ্ডলাকে অবশেষে আত্মবিসর্জনের পথ দেখাইলেন। কবি-সাহিত্যিক বঙ্কিম নদীতটে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন 'অনন্ত গঙ্গা প্রবাহ মধ্যে, বসন্তবায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?' ভবানীচরণে উৎসর্গীকৃত দেবীমূর্তি তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। প্রকৃতির বক্ষে যাহার আকস্মিক আবির্ভাব সেই প্রকৃতির বুকেই আবার তাহার আকস্মিক তিরোধান। এক বৎসর গৃহস্থ বধূ হইয়া থাকিবার পরও কপালকুণ্ডলা অকুণ্ঠচিত্তে নিশীথে নির্ভয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে, কাননতলে অপরিচিত পুরুষের সহিত কুণ্ঠাহীন চিত্তে কথা বলে—ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আরণ্যক সরলতারই পরিচয় বহন করে—যাহাতে সংসারাশ্রমের একটুও ছাপ পড়ে নাই।

কপালকুণ্ডলার সহিত সেক্সপীয়ার সৃষ্ট মিরাণ্ডার চরিত্রের আপাতসাদৃশ্য থাকিলেও পার্থক্য আছে। মিরাণ্ডার পিতার যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র, সাধনা ও প্রেতবশীকরণ বিদ্যা মিরাণ্ডার জীবন প্রভাবিত করিলেও, সে কখনও পিতার স্নেহ ও আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হয় নাই—যেমন কপালকুণ্ডলা হইয়াছিল। সুতরাং কপালকুণ্ডলার জীবনে পারিবারিক প্রভাব পড়িবার কোন সুযোগ হয় নাই, প্রাকৃতিক পরিবেশই ছিল একমাত্র আশ্রয়। সেই দৃষ্টিতে প্রস্পেরো

ও কাপালিকের ভিতরেও অনেক প্রভেদ।

কপালকুণ্ডলা বলিয়াছিল যে সে যদি জানিত বিবাহ স্ত্রীলোকের দাসীত্ব তাহা হইলে সে কদাপি বিবাহ করিত না। কিন্তু হায়, কপালকুণ্ডলা! সে জানিল না নবকুমারের হৃদয়ের গভীরে কপালকুণ্ডলার জন্য সঞ্চিত অনন্ত ভালবাসার সন্ধান। গহন অরণ্যে ও গহন হৃদয়ে, তাই যোগাযোগ হইল না। কপালকুণ্ডলা বুঝিল না বিবাহ কাহারও দাসত্ব নহে, স্ত্রীপুরুষের উভয়েরই আত্মিক মুক্তি। সুসম্বন্ধ সমাজবিধি শাসনহীন আরণ্য প্রকৃতিকে কোন বন্ধন ডোরে বাঁধিতে পারিল না।

দুর্গেশনন্দিনীতে দেখি তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা—এই তিনটি প্রধান নারীচরিত্র। তিলোত্তমা ও আয়েষা নীরব ও স্বল্পভাষিণী। আয়েষা নবাবকন্যা হইয়াও শান্ত, দৃঢ়চিত্ত ও ত্যাগপরায়ণা। আয়েষা চরিত্রে নারীর দেবীত্বের বিচিত্র বিকাশ। বঙ্কিমের নিজের কথা এই স্থলে স্মরণ করা প্রয়োজন। তিনি বলিতেছেন : 'যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এই আখ্যায়িকামধ্যে তেমনি আয়েষা।' জগৎসিংহ সেই কারণে বলিয়াছে 'আয়েষা তুমি রমণীরত্ন।' আয়েষা শুধু দেখিতে সুন্দর নহে, তাহার হৃদয় ও প্রকৃতিও সুন্দর। এইজন্য অনেকে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—আয়েষা দেবী না মানবী! আয়েষার গাম্ভীর্য ও আত্ম-সংযমের তুলনা নাই।

বিমলা রসিকা, তেজস্বিনী, সাধ্বী ও বীরাঙ্গনা। তাই কখনও দেখি এই নারীচরিত্র বলিতেছে—'স্ত্রীলোকের পরিচয়ই বা কি? যাহারা কুলোপাধি ধারণ করিতে পারে না, তাহারা কি বলিয়া পরিচয় দিবে? গোপনে বাস করা যাহাদের ধর্ম, তাহারা কি বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে।' আবার দেখি সেই বিমলাই বলিতেছে 'শনিত লৌহ ভিন্ন এ হস্তে অলঙ্কার আর পরিব না।'

চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী চরিত্র জটিল। বহু ধারা এই নারীচরিত্রে আসিয়া মিশিয়াছে। শৈবলিনীর অধঃপতন ও উত্থানের এক সূক্ষ্ম ক্রমবিকাশ ইহাতে দেখা যায়। প্রথম যৌবনে প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়ে ইহার আরম্ভ। প্রতাপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া ডুবিয়াছিল কিন্তু শৈবলিনীর প্রাণের মায়া প্রণয়ের চেয়ে অধিক। শৈবলিনীর সহিত চন্দ্রশেখরের বিবাহ শৈবলিনী চরিত্রের দ্বিতীয় বিকাশ। বিষয়বিমুখ পাঠনিরত চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। শৈবলিনীর মনের পাপ বাহিরে প্রকাশ পাইল যখন ফষ্টর তাহাকে সমাজ ও গার্হস্থ্য জীবন হইতে অপহরণ করিল। শৈবলিনী চরিত্রের এই

অংশ কোন উক্তির দ্বারা স্পষ্ট না করিয়া ঘটনা সমাবেশের দ্বারা বঙ্কিম তাহা প্রকাশ করিয়াছেন এক অপূর্ব সাহিত্যকৌশলে।

কিন্তু প্রথম জীবনের শৈবলিনী এবং পরবর্তী শৈবলিনীর পার্থক্য অনেক। প্রথম জীবনের শৈবলিনী মর্তের। দ্বিতীয় ও পরিণত জীবনে শৈবলিনী স্বর্গের। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রম-বিকাশ জীবনের এক মহাকাব্য। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন "তাহা 'মিলটন' ও 'দান্তের' নরক বর্ণনার সহিত প্রতিযোগিতার স্পর্ধা করিতে পারে।"

শৈবলিনী এক দৃষ্টিতে বাঙ্গালী বধূ। কিন্তু তাহাই শৈবলিনীর সম্পূর্ণ রূপ নহে। এক ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া তাহার দুঃসাহস, অনন্যসাধারণ বুদ্ধিকৌশল ও তাহার ভুবনমোহিনী রূপ তাহাকে প্রধান নায়িকা করিয়াছে। সহনশীল চন্দ্রশেখর একবার মাত্র প্রতাপের উপর কটাক্ষ করিয়া যখন শৈবলিনীকে বলিয়াছিলেন, 'প্রতাপ কি তোমার জার?' তৎক্ষণাৎ শৈবলিনী সসঙ্কোচে কিন্তু অকপটে উত্তর দিয়াছিল 'ছিঃ ছিঃ, এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনের মধ্যে ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?'

সংসারে সমাজে নারীর স্থান ও আদর্শ দেবীচৌধুরাণীর মুখ্য বিষয়। বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে ঐশ্বর্যে, প্রভুত্বে, কর্তৃত্বে, নারীজীবনের শান্তি নাই। নারীজীবনের সার্থকতার ও সম্পূর্ণতার পথ ইহা নহে। স্বামী, সন্তান ও সংসার হইল নারীর কর্মকেন্দ্র। তাহার পূর্ণরূপ, শান্তি ও সার্থকতা এইখানে যেখানে সে একক ও অদ্বিতীয়। দেবীরাণীর কর্তৃত্বাভিমানের মধ্যে ও নেতৃত্বের গৌরবে এবং তাহার বিপুল বৈভবের মধ্যে প্রফুল্ল প্রচ্ছন্ন, অপরিতৃপ্ত। সেই কারণে সে ব্রজেশ্বরের আঙ্গিনায় বাসন মাজিতেও আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল। কারণ সেখানে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

প্রফুল্ল চরিত্রের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্মের এক বিশিষ্ট দিক দেখাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। প্রফুল্ল নিষ্কাম কর্মে দীক্ষিতা হইয়া, দশ বৎসর অরণ্যে দস্যুদলের সহিত ঘুরিয়া পুনরায় হরবল্লভের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সাধনার কঠোরতা, জীবনের নিষ্ঠুরতা এবং সংসারের অকরুণ ব্যবহার প্রফুল্লর নারীচরিত্রকে মলিন বা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। গৃহান্তরালে অদৃশ্য হইলেও প্রফুল্ল আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর চিত্র। নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিতা

হইয়াও প্রফুল্ল গার্হস্থ্য ধর্মের প্রতি আস্থাহীনা হয় নাই। ভারতের সনাতন আদর্শ হইল আদর্শ গৃহী, আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ গৃহস্থ। প্রফুল্ল নারী-চরিত্রে একাধারে প্রেম ও বৈরাগ্যের সমন্বয়। প্রফুল্ল যেন এক ঋষিকন্যা। সন্ন্যাসী ভবানী পাঠকের কঠোর শিক্ষায় প্রফুল্লর দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব হইয়াছিল। প্রফুল্লর জন্য ভবানীপাঠকের শিক্ষাপদ্ধতি পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। প্রথম বৎসরে কোন পুরুষের সামনে যাইবার বা আলাপ করিবার অনুমতি ছিল না। দ্বিতীয় বৎসর কেবল সামনে যাওয়ার নিষেধ ছিল, কিন্তু আলাপের নহে। তৃতীয় বৎসরে প্রফুল্লকে মুণ্ডিত-মস্তকে অবনতমুখে শিষ্যদের সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে দেখা গেল। চতুর্থ বৎসরে পুরুষ শিষ্যদের ন্যায় মল্লযুদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। পঞ্চম বৎসরে সকল বিধি-নিষেধ রহিত হইল। প্রফুল্ল তখন পুরুষের সহিত পুত্রবৎ আলাপ করিত। ইহা হইতে দেখা যাইবে বঙ্কিম নারীকে কিভাবে গীতার নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষা দিতেছেন, তাহাকে কিভাবে গঠন করিতেছেন এবং তাহার শিক্ষা ও সংযম কিভাবে জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া দিতেছেন। নারী যে গীতার ধর্ম পালনে সক্ষম এবং গীতার উপদেশ মানিয়া চলিতে হইলে যে সব সময়ে পৌরুষ অর্জন করিতে হইবে তাহা নহে, উপযুক্ত নারীও সে স্থান অধিকার করিতে পারে—ইহাই প্রফুল্ল চরিত্রের শিক্ষা।

স্ত্রীলোক হইয়াও দেবী চৌধুরাণী দস্যু দলের নেতা, বাংলা সমাজে এটি একটি অভিনব চিত্র। বঙ্কিম এই চরিত্রে দেখাইতেছেন যে নারীরও বীরত্বের অধিকারিণী হওয়া সম্ভব। এই দেবী চৌধুরাণীতে বঙ্কিমের বিখ্যাত 'লাঠি'র মহিমা কীর্তন আছে। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ বঙ্কিমের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্কিমের আদর্শ ছিল যে ভারতীয় নারী অবলা নহে, বীর, শক্তিমতী, সমাজ সংসার ও রাষ্ট্রের অধিনায়ক হইতে সক্ষম।

আনন্দমঠে শক্তির জীবন্ত মূর্তি এইরূপ আর একটি বিশিষ্ট নারীচরিত্র হইতেছে শান্তি। শান্তি প্রথমে বালিকাসন্ন্যাসী বেশে এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে শান্তিকে এক সন্ন্যাসী কাব্য পড়াইতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহা অকাব্যোচিত মারামারিতে দাঁড়াইয়া গেল। শান্তি বলশালিণী ছিল এবং ব্যায়ামের দ্বারা তাহার দেহ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ হইয়াছে। শান্তি তাহার পর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিল। শান্তি নির্ভীক। একাই স্বদেশের পথে যাত্রা করিল। কখনও ভিক্ষা করিয়া, কখনও

বন্যফল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিল এবং শেষে শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করিল। আবার দেখি শান্তি সন্ন্যাসীবেশে :

"দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি ধাওরে
সমরে চলিনু আমি, হামে না ফিরাওরে।"

বলিয়া জীবানন্দের সন্ধানে মঠে চলিল, যুদ্ধের জন্যে নহে, স্বামীর ব্রত-ভঙ্গের জন্য নহে, স্বামীর বলবৃদ্ধির জন্য। শান্তি যখন ইস্পাতের ধনুতে গুণ পরাইয়া দিয়া তাহার দৈহিক শক্তির পরিচয় দিল, তখন সত্যানন্দ পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন 'একি তুমি দেবী না মানবী'। অন্যত্র দেখি শান্তি বৈষ্ণবী সাজিয়া মেজর এডওয়ার্ডসের শিবিরে সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে ; ধরা পড়িবার উপক্রম দেখিয়া কৌশলে লিণ্ডলের আরবী ঘোড়া চড়িয়া শান্তি বায়ুবেগে ছুটাইয়া সোজা জীবানন্দের কাছে হাজির হইয়াছে। সেই ঘোড়াই জীবানন্দের জয়ের ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের এবং ইংরাজ সৈন্যের পরাজয়ের কারণ হইতেছে। বীরত্ব, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জ্বলন্ত উদাহরণ এই স্ত্রীচরিত্র শান্তি। শান্তি বীরাঙ্গনা। বীরাঙ্গনা সৃষ্টিতে বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত। তার সুনিপুণ চিত্র আনন্দমঠের শান্তি ও দেবী চৌধুরাণী। বঙ্কিমের নারী-মন্দিরে আমরা আরও বীরাঙ্গনা দেখিব।

শান্তির চরিত্রের একটি সমালোচনা এই যে, তাহা অস্বাভাবিক, অবাস্তব ও কাল্পনিক। কোন সমালোচক এইভাবে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন 'শান্তি দেবী, দানবী, মানবী, পিশাচী, রাক্ষসী যাহা খুসী হইতে পারে—কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে নয়।' আমরা এই সমালোচনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই।

শান্তি অল্পবয়সে মাতৃহারা। অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পিতা টোলে ছাত্রদের পড়াইতেন। শান্তি সেই আবহাওয়ায় মানুষ। তাই সে মেয়েদের মতন কাপড় পরিতে শিখিল না, ছেলেদের মতন করিয়া কাপড় পরিত। সে সাহিত্য, সংস্কৃত ও ব্যাকরণের ছায়ায় মানুষ হইল অন্য ছাত্রদের সহিত। পিতার বিয়োগে শান্তি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় বোধ করিল। পিতার টোল উঠিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেল। শান্তির কোন অবলম্বন রহিল না। কিন্তু সেই ছাত্রদের মধ্যে একজন, সন্তান সম্প্রদায়ের অন্যতম, জীবানন্দ তাহাকে বিবাহ করিয়া আশ্রয় দিল। শান্তি প্রকৃতিবৎসল বলিয়া বনে বনে ঘুরিত, ময়ূর, হরিণ, ফুল, ফল তাহার সঙ্গী ও সাথী। কিন্তু তাহাতেই কেহ শ্বশুরালয়ে সুখী

হইতে পারে না, শান্তিও পারে নাই। সে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিল। গৃহত্যাগ করিল। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহিত সঙ্গ করিয়া কিছুদিন তাহাদের সহিত মিশিল। কিন্তু ইহাতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আবার শ্বশুরালয়ে প্রত্যাবর্তন করিল। কিন্তু শাশুড়ী ভুলিবার লোক নহেন, তিনি শান্তিকে স্থান দিলেন না। জীবানন্দ কিন্তু শান্তিকে বলিলেন 'আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না।' সে শান্তিকে লইয়া ভগ্নী 'নিমি'র কাছে রাখিয়া আসিল। নিমির গৃহ শান্তির নূতন গৃহ হইল। কিন্তু সে গৃহও ভাঙ্গিল, জীবানন্দের সুখস্বপ্নও শেষ হইয়া গেল; সে সত্যানন্দের প্রভাবে পড়িয়া সন্তান সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইল এবং শান্তিকে পরিত্যাগ করিল। শান্তি বহুবার গৃহদীপ জ্বালাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বারে বারেই তাহা নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু শান্তি নারী হইয়াও কি তাহাতে হতাশ হইয়াছে? হতাশ হওয়া ত' দূরের কথা শান্তি সমস্ত ঝড়, সব বাঁধা, সকল বিঘ্ন বীরের মতন অতিক্রম করিয়া জীবনে শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে। কয়টি নারী এমন কি কয়টি পুরুষ ইহা পারিয়াছে? এই পরিস্থিতিতে শান্তি আবার সন্ন্যাসী বেশে বাহির হইল জগত জয় করিবার জন্য। সে যে শুধু তাহার বাহুবল, বীর্য ও শৌর্যের দ্বারা সত্যানন্দকে পর্যন্ত চমকিত করিয়াছিল তাহা নহে, শান্তি চারি বৎসর সন্তান সৈন্যদের সহিত থাকিয়া অশ্বারোহণ বিদ্যা শিখিয়া চতুর ও কুশলী অশ্বারোহী হইয়াছিল।

এত ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও শান্তি তাহার রসিকতা হারায় নাই। মঠ দেখিয়া যখন সে ঘর পছন্দ করিতেছে, তখন জীবানন্দকে তাহার কৃত্রিম তিরস্কারের ভিতরে সেই রসিকতার পরিচয় মিলিবে। ক্যাপ্টেন টমাসকে বাহু-বলে পরাজয় করা, তাহার হস্ত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লওয়া কেবল শান্তির বীরত্বের ও বলের পরিচয় নহে, সেখানেও সে তাহার অদম্য-রসিকতার পরিচয় দিয়াছে। ক্যাপ্টেন টমাস যখন শান্তিকে তাহার ঘরে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করে, শান্তি তাহাকে বলিয়াছিল যে শান্তির একটি বাঁদরের ঘর খালি আছে, টমাসকে শিকলে বাঁধিয়া সেইখানে রাখিবে কারণ তাহাই টমাসের উপযুক্ত স্থান। এই টমাসকেই শান্তি বলিয়াছিল 'এমন বুনো জাতের সঙ্গে কেউ কথা কয়?'

অথচ নারীসুলভ যে কোমলতা ও কমনীয়তা তাহারও কোন অভাব শান্তির চরিত্রে দেখা যায় নাই। বীর জীবানন্দ শেষ যুদ্ধে শত্রুব্যূহমধ্যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বরণ করিবার পূর্বে মহেন্দ্রকে বলিতেছে 'ভাই নবীনানন্দকে (অর্থাৎ শান্তিকে) বলিও আমি চলিলাম, লোকান্তরে সাক্ষাৎ হইবে।' সেই শান্তি জীবানন্দের শব দেখিয়া সাধারণ রমণীর ন্যায় উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিল, সমস্ত বীরত্ব,

সমস্ত কঠোরতা, সমস্ত দৃঢ়তা মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। তখন মহাপুরুষ শান্তিকে বলিতেছেন 'কাঁদিও না মা। জীবানন্দ কি মরিয়াছে?' যখন সেই মহাপুরুষ মৃত জীবানন্দকে জীবন দান করিতেছেন তখন পুনরায় দেখি শান্তি প্রকৃতিস্থ এবং জীবানন্দকে বলিতেছে 'আমরা রাজ্যের ভাগ চাহি না। আমরা আর গৃহী নহি। এমনি দুজনে সন্ন্যাসী থাকিব—চির ব্রহ্মচর্য পালন করিব।' তখন বঙ্কিম প্রশ্ন করিতেছেন 'হায়। এমন দিন আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা আবার গর্ভে ধরিবে কি?'

পরিস্থিতি ও অবস্থার বিবেচনায় এইরূপ নারীচরিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করা যায় না। বঙ্কিমের 'শান্তি' বহুবলধারিণী। জীবন, সংসার ও সমাজ তাহার সহিত অনেক অকরুণ ব্যবহার করিয়াছিল কিন্তু তাহাকে তিক্ত করিতে পারে নাই। তাহাকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করিয়াছে। সে ভারতীয় বা বাঙ্গালী মেয়ে কিনা তাহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ঝাঁসীর রাণী যেমন সত্য, শিবাজী ও মারাঠার ইতিহাস যেমন সত্য, যেমন মহারাষ্ট্র নারী চতুর অশ্বারোহী হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় নারী, তেমনি শান্তিও ভারতীয় নারী তাহাতে সন্দেহ নাই। শান্তির নারীচরিত্রে আছে এক অপূর্ব সামঞ্জস্য, সমস্ত কঠোরতার ভিতর নারীর অজেয় সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। আগামী দিনের ভারতীয় নারীর আদর্শ আনন্দমঠের এই শান্তি। অথচ এই ভবিষ্যতের সহিত অতীত ভারতের আদর্শের এক অক্ষুণ্ণ যোগ আছে। এ নারী পাশ্চাত্য নারীর প্রতিচ্ছায়া নহে।

আনন্দমঠের আরও দুইটি নারীচরিত্রের উল্লেখ করিব। মহেন্দ্রের পত্নী কল্যাণী ধনীর স্ত্রী হইয়াও অসীম সাহসিকতা, কর্মকুশলতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শ্রমশীলতার এক আশ্চর্য উদাহরণ। অবস্থা বিপর্যয়ে ভারতীয় নারীর কুশলী কর্মদক্ষতা, অভিনব পরিস্থিতির সহিত যুদ্ধ করিবার তৎপরতা, এই চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। আবার কল্যাণী চরিত্রে নারীসুলভ ভয় ও ত্রাস আছে এবং সন্ন্যাসের আদর্শে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। যখন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়া কল্যাণী জানিল তাহার স্বামী ও কন্যা কেহই মারা যায় নাই, তখন তাহাদের জন্য গভীর আগ্রহ, ব্যগ্রতা ও প্রতীক্ষা তাহাকে যথার্থই কল্যাণী-রূপিনী করিয়াছে।

অন্য স্ত্রী চরিত্র আনন্দমঠের নিমি। নিমির নারী চরিত্র স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম। কল্যাণীকে যখন অরণ্য মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এবং জীবানন্দ

মহেন্দ্রের শিশুকন্যাটিকে পাইয়া লইয়া আসিল তখন সেই মাতৃহারা কন্যাকে সে অতি সহজেই গ্রহণ করিল, তাহাকে মানুষ করিতে, পালন করিতে উৎসুক হইল। নারীচরিত্রের এই স্বাভাবিক অধিকারে সেখানে কোন কুণ্ঠা নাই। এবং কল্যাণীকে পাওয়া গেলে যখন তাহার আপন মার নিকট সেই সুকুমারী কন্যাকে ফিরাইয়া দিতে হইল, তখন নিমি তাহার বিচ্ছেদ বেদনায় কাঁদিয়া আকুল হইল। বঙ্কিম নিমির চরিত্রে এইখানে ভারতীয় নারীর চরিত্রগত কোমলতা ও বৈশিষ্ট্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

সীতারামে আর একটি অভিনব নারীচরিত্র হইতেছে 'শ্রী'। প্রথম জীবনে স্বামীপরিত্যক্ত হওয়ায় শ্রীকে জীবনের আর এক আদর্শ খুঁজিয়া লইতে হইয়াছিল, যাহা তাহার সমগ্র জীবন আবার ভরিয়া দিতে পারে। সে দিক দিয়া শ্রীর সন্ন্যাস গ্রহণ মহৎ সিদ্ধান্ত। সন্ন্যাস জীবনে শ্রী সিদ্ধিলাভ না করিলেও শান্তি পাইয়াছিল। তবে শ্রীর চরিত্রের আরম্ভ হইতে শেষ এক বিপুল অভিমানে আচ্ছাদিত। সে সীতারামকে শ্রদ্ধা ও অনুরাগ দুই-ই দিয়াছিল কিন্তু সহধর্মিনীর পূর্ণ আদর্শ পালন করিতে সক্ষম হয় নাই। কোথায় যেন তাহার মনে কিসের অভাব রহিয়া গিয়াছে। উপন্যাসের দিক দিয়া ইহা কাহিনীকে মনোহর করিয়াছে, কিন্তু ধর্মকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। শ্রীর চরিত্রে আদর্শের কঠোরতা আছে, আর আছে বীর্যের অভিব্যক্তি। শ্রী তাই স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকারে কোন দাবী জানায় নাই। হিন্দুর কাছে হিন্দুর দাবী জানাইয়াছিল এই বলিয়া—'হিন্দুকে হিন্দু না রক্ষা করিলে কে রক্ষা করিবে?'

এই সীতারামে বঙ্কিম নারী চরিত্রের এক বিশেষ দিকদর্শন করিতেছেন এই বলিয়া 'স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ভালবাসাই দাম্পত্যসুখ নহে, একাভিসন্ধি সহৃদয়তা ইহাই দাম্পত্যসুখ।'

প্রকৃত দাম্পত্যসুখ দেখাইবার জন্য ভালবাসা ও একাভিসন্ধি সহৃদয়তা পৃথক করা বঙ্কিমের নারীচরিত্র বিশ্লেষণের বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য অবদান। এই অনুভূতি যে কোন অন্তর্বিরোধ বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে নাই তাহা নহে, কারণ জয়ন্তীর শিষ্যা 'শ্রী'র সন্ন্যাসে অভাবনীয় নিষ্ঠা সীতারামকে হয়ত বিভ্রান্ত করিয়াছিল। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত সমালোচনা করিয়াছেন যে, অনুরাগিনী স্ত্রী হইতে সন্ন্যাসিনীতে পরিবর্তন এবং কেমন করিয়া অদম্য আসক্তি গভীর ঔদাসীন্যে পরিণত হইল তাহা দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কিন্তু এই রহস্যের দ্বার উন্মোচন হয় যদি বঙ্কিমের দাম্পত্য সুখের ধারণায় ভালবাসাকে

একাভিসন্ধী সহৃদয়তার সহিত পৃথক করা যায়। এই সন্ন্যাসিনী শ্রীর সাহায্যেই সীতারাম একাকী দুর্গরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাই একাভিসন্ধি সহৃদয়তা, যাহার ভিতর সকল ভালবাসা রূপায়িত ও রূপান্তরিত এবং ইন্দ্রিয়ের তাড়না হইতে নির্মুক্ত।

তবে 'শ্রী'র এই একাভিসন্ধি সহৃদয়তা তাহার অন্তরের পূর্ণতাসাধন করিতে পারে নাই। তাহার সেই দুরতিক্রম্য অভিমান ইহাতে বাধা দিয়াছিল। এইজন্য শ্রীর যে এক মহান দুঃখ অন্তরে ছিল তাহা বৈতরিণী দর্শণে প্রকাশ পাইল, যখন সে বলিতেছে—'হায়! এই ত বৈতরিণী।' ইহা পার হইলে কি তাহার 'জ্বালা' জুড়াইবে। সেই অভিমানের জন্য এই জ্বালা। জয়ন্তী ইহা বুঝিতে পারিয়া উত্তর করিয়াছিল 'এ সে বৈতরিণী নহে—যমদ্বারে মোহ ঘেরা তপ্তা বৈতরিণী নদী—আগে যমদ্বারে উপস্থিত হও—তবে সে বৈতরিণী দেখিবে।' এই অভিমান সৃষ্ট জ্বালার জন্য জীবনের এক চরম মুহূর্তে শ্রী তাহার গুরু জয়ন্তীর নিকট বলিতেছে 'যে শ্রীকে ফিরাইবার জন্য তিনি ডাকাডাকি করিতেছেন, সে শ্রী আর নাই, তোমার হাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আছে কেবল তোমার শিষ্যা। তোমার শিষ্যাকে লইয়া মহারাজাধিরাজ সীতারাম রায় সুখী হইবেন কি? না তোমার শিষ্যা মহারাজাধিরাজকে লইয়া সুখী হইবে?' এই অভিমানেই শ্রী সীতারামকে প্রত্যাখ্যান করিল।

সীতারাম উপন্যাসে 'রমার' চরিত্র আর একটি ভিন্ন দিক দেখাইয়াছে। রমা প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। সে নারীচরিত্রে উচ্চাভিলাস, রাজত্ব বা বীরত্ব নাই। সীতারামের রাজ্যস্থাপনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন রাষ্ট্রসংগঠন রমার নিকট অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব। মুসলমান ভীতিতে সে দিবারাত্র সন্ত্রস্ত। কাহিনীর যুদ্ধ-কলরব বা সন্ন্যাসের আদর্শ রমাকে স্পর্শ করে নাই। রমা সাধারণ বাঙ্গালী সংসারের অতি সাধারণ কিন্তু বাস্তব নারী। কিন্তু এইদিকে স্বাতন্ত্র্যবিহীন হইলেও রমার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ করা রমাকে দুঃসাহসের চরমসীমায় লইয়া গিয়াছে। আবার দরবারের প্রকাশ্য আদালতে বিচারের দিন তাহার পুত্রস্নেহ সেই স্বল্প ও সংযতবাক রমাকে মুখরা করিয়া তুলিয়াছে। অতি সাধারণ নারীরও যে এক বিপুল অন্তর্নিহিত শক্তি আছে রমা তাহার উদাহরণ এবং গঙ্গারামের অধঃপতনের কারণ হিসাবে এই চরিত্র সৃষ্টির এক তাৎপর্য আছে।

বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজসিংহে নারীচরিত্রের এক অসাধারণ

রূপ দেখা যায়। জেবুন্নিসার প্রথমদিকের কলঙ্কিত জীবন ইতিহাস সমর্থিত। কিন্তু কাহিনীতে তাহার অপূর্ব রূপান্তর ঘটিয়াছে। পিতামাতার বিরুদ্ধে মোবারকের সহিত পরিণয়, ঐশ্বর্যত্যাগ ও প্রেমিককে বাঁচাইবার কৌশল, বিলাসিনী হইয়াও পতিপ্রেমে অনুরাগী হইয়া স্বেচ্ছায় দুঃখবরণ—এ সমস্তই বঙ্কিমের সৃষ্টি এবং সেইখানে বঙ্কিমের জেবুন্নিসা যথার্থ মহিমান্বিতা। জেবুন্নিসার নারীচরিত্র বর্ণনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'সাধনায়' লিখিয়াছেন 'আরামের সুখশয্যা চিতাশয্যার ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিল। তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য অর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া অভিষেক করিল। তারপর আর সুখ পাইল না। কিন্তু আসল সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবুন্নিসা সম্রাট-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। তখন হইতে সে অনন্ত জগৎবাসিনী রমণী।' জেবুন্নিসা যেমন ঐতিহাসিক সত্য তেমনি ইতিহাসেরও অতীত সত্য রমণীর প্রেমঘন এই মূর্তি। ত্যাগের অপরূপ মহিমায় রমণী প্রেমের যে অক্ষয় নৈবেদ্য জেবুন্নিসা রচনা করিল তাহার তুলনা নাই। জেবুন্নিসা সেই প্রেমময়ী নারীমূর্তি, যে সকল সাম্রাজ্য, সকল ঐশ্বর্য ও সকল আকাঙ্ক্ষা প্রেমের জন্য চরণে দলিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। মতিবিবি বিলাসিনী প্রমোদিনী নায়িকা হইয়াও স্বামীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিতে দ্বিধাহীন; দলনীবেগমের মতো সেও কর্তব্যনিষ্ঠ ও স্বামীর অনুগামিনী।

ইহার পর বঙ্কিমের বিষবৃক্ষে আর একবার ফিরিয়া গিয়া, সেখানে আর একটি বিচিত্র কুটীল নারী চরিত্র দেখিব। 'হীরা' বিষবৃক্ষের বিষছায়া। হীরাই সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথের শেষ বিচ্ছেদের কারণ। আর সেই হীরাই মর্মাহতা ও অনুতপ্তা কুন্দনন্দিনীর নিকট আত্মহত্যার প্রলোভন দেখাইয়া বিষ পৌঁছাইয়া দিল। হীরা অগ্নিতে ইন্ধন জোগাইতে নিপুণা। তাহার চরিত্র কলুষে পরিপূর্ণ। হীরার চরিত্রে আছে ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের অভিমান, প্রভুর বিরুদ্ধে ভৃত্যের আক্রোশ। হীরা দেবেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল, এবং দেবেন্দ্রের নিকট প্রতিদান পাইলে সে হয়ত ধর্ম বিক্রয় করিতেও প্রস্তুত ছিল। ধর্মভ্রষ্টা হীরা দেবেন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও ঘৃণাভরে বিতাড়িত হইল। বঙ্কিম হীরার কলুষিত প্রণয়ের অন্তিম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে তাহার আত্মহত্যার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র বা কুন্দকে বিষপ্রয়োগের দ্বারা হত্যার সঙ্কল্পে

পরিণত হইল। হীরা নিজেই কবিতার ভিতর দিয়া তাহার আত্মপরিচয় দিতেছে—

'আমার নাম হীরা মালিনী
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে
কুব্জা আমার ননদিনী।'

নারীচরিত্র যখন কুটীল ও কলুষিত হয় তখন তাহা কত নির্মম ও নৃশংস হইতে পারে, এবং তাহা কিভাবে কত হাস্যমুখর নির্মল নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত করে তাহার উজ্জ্বল চিত্র এই হীরা।

ব্রজেশ্বরের মা ও গোবিন্দলালের মা ভিন্ন চরিত্র। বুদ্ধি, বিচার ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের জন্যে ব্রজেশ্বরের মা ব্রজেশ্বরকে হারাইল না এবং সংসারে শান্তি রক্ষা করিল কিন্তু গোবিন্দলালের মার অবহেলায় সংসার ছারখার হইল। মৃণালিনী, শান্ত, ক্ষমাশীলা, সংসারঅভিজ্ঞ ও তেজস্বিনী। অন্তরের আকর্ষণ সে বিপরীত বাহ্যিক আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে পারিত। রাধারানী সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী কিন্তু হিরণ্ময়ী সন্দেহমুক্ত ও সরলবিশ্বাসী। নন্দা পাকা গৃহিণী। কৌতুক-পরায়ণা কোমল, নিপুণা ও দক্ষ গৃহিণী। রামসদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা আদর্শ গৃহকর্ত্রী। রজনী বাহিরে অন্ধ হইলেও অন্তরে পূর্ণ, ভাবময়ী এবং অবেগময়ী।

বঙ্কিমের নারীমন্দিরে আমরা বিচিত্র জাগ্রত নারীমূর্তি দেখিতে পাই। ভ্রমর ও রোহিনীকে দেখিলাম, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীকে দেখিলাম। শৈবলিনী, শান্তি, প্রফুল্ল ও শ্রীকে দেখিলাম। আয়েষা, জেবুন্নিষা, মতিবিবি ও দলনীকে দেখিলাম। তিলোত্তমা, বিমলা, রমা, মৃণালিনী, রজনী ও কল্যাণীকে দেখিলাম। ইহাদের বিচিত্র ঐশ্বর্যে আছে—রাজার মহিষী, নবাব দুহিতা, সন্ন্যাসিনী, অরণ্যবিহারিনী, প্রেমিকা, প্রণয়িনী, পতিব্রতা, সাধ্বী, স্বৈরিনী, গৃহিণী, নানা আয়ুধসমন্বিতা শক্তিরূপিনী বীরাঙ্গণা, বহুবল-ধারিনী, কুটীল কুচক্রী, সাধারণ গ্রাম্যনারী, দাসী, বাঙ্গালীবধু, অন্ধ ও আতুরা, পাষাণী, মানবী, মানসী, দেবী, রসিকা, বিদ্রূপময়ী, সাধিকা ও সাধ্যা—সকলে মিলিয়া বঙ্কিমের নারীমন্দির পরিপূর্ণ করিয়াছে। নানা বেশে, নানা রূপে, নানা নৈবেদ্য ও নানা উপচারে বঙ্কিম তাহাদের আরতি করিয়াছেন। তাহাতে নারী-মনোবিজ্ঞানের, ব্যবহারতত্ত্বের এবং প্রকৃতির ও আদর্শের বহু দিকদর্শন রহিয়াছে। ইহার অরুনোদয়, অস্তরাগ, বর্ণচ্ছটা, চালচিত্র প্রায় সমস্ত

দিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছে।

তবে বঙ্কিমের এই নারী মন্দিরে তৃষিত নয়ন ও সদা উন্মুখ হৃদয় বাংলা-দেশের একটি অতি পরিচিত ও প্রিয়, অত্যন্ত আপনার ও যুগ যুগান্তরের সাধনার সদা জাগ্রত ও ধ্যানমূর্ত বিগ্রহকে কোথাও অন্বেষণ করিয়াও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যেখানে এত সম্ভার, এত সৌন্দর্য, এত বৈচিত্র্য, সেখানে এই শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্যের একটি মহিমাময়ী মূর্তির অভাব কেন? বঙ্কিমের উপন্যাসে মাতৃচরিত্র নাই। নারীর পূর্ণ সার্থকতার যে রূপ, নারীজীবনের যে পূর্ণসম্ভার ও পরিপূর্ণ বৈভব—তাহার মূর্তি বঙ্কিমের নারীমন্দিরে দেখা যায় না। আনন্দমঠের যে মাতৃমূর্তি সে জন্মভূমি। কিন্তু যে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সি, আনন্দমঠের মা সে মা নহে। যে জননী তাহার জঠরে ধারণ করিয়া, তাহার শোণিত অস্থি ও মজ্জা দিয়া, তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়া পলে পলে সন্তানকে গঠন করেন, যে জননী তাহার শৈশব বাল্যজীবন যৌবন ও পরিণত বয়স পর্যন্ত সমস্ত জীবন মন-প্রাণ ও অন্তর দিয়া প্রতিদিন অপেক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি সন্তানের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ঐশ্বর্যে সম্পদে ও কৃতিত্বে গরবিনী, বিপদে আপদে ও নিরাশায় আশ্রয়, জীবনে সহায়, কর্মে শক্তি, যাহার স্বার্থত্যাগের ও আত্ম-বলিদানের তুলনা নাই, যাহার স্নেহে অভিমান নাই, যাহার প্রেমে প্রতিদান নাই এবং যে জননী ত্রিভুবনে দুর্লভ, বঙ্কিমসাহিত্যে সে জননী কোথাও নাই। সাহিত্যে যাঁহার সর্বব্যাপী ভূয়োদর্শন, যিনি মানবপ্রকৃতির এত বড় বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক, যিনি নারীচরিত্রের এত বড় শিল্পী, তিনি এ অভাবটি রাখিলেন কেন?

এ প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কেহ জিজ্ঞাসা করেন নাই। এই প্রশ্নের আজ পর্যন্ত কোন উত্তরও দেওয়া হয় নাই। তাই সে আলোচনা আজ প্রয়োজন। এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর ইহাই যে বঙ্কিম তাঁহার আনন্দমঠের মার পার্শ্বে আর কোন মা আনিতে চাহেন নাই। আনন্দমঠের ভবানন্দ বলিতেছে 'জন্মভূমিই আমাদের জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই।' সেই দেশমাতৃকার রাজসিংহাসন অচল, অটল ও অদ্বিতীয় রাখিতে হইলে আর কোন মাতৃচরিত্র সৃষ্টি করা যায় না, কারণ সে মা যে জন্মভূমির থেকেও গরীয়সী; কেননা জন্মভূমিতেও ভূমিষ্ট হইবার অধিকার একমাত্র সেই গরীয়সী জননীই দান করিতে পারেন। হইতে পারে এই কারণে বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যকে এই মাতৃ মূর্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর : বঙ্কিমের কুল-দেবতা রাধাবল্লভ। বঙ্কিমের নারী নায়িকা এবং সেই নায়িকার অনন্তরূপিনী

বিকাশ, যাহার রূপের অন্ত নাই, যাহার লীলার শেষ নাই। বৈষ্ণবধর্মে নারী প্রধানতঃ নায়িকা। রাধা মাতা নহে, নায়িকা, জীবনের লীলাসঙ্গীনী। রাধাবল্লভ লীলাময় নায়ক। সেই কারণে বঙ্কিমের নারীচরিত্রে বৈষ্ণবধর্মের অনন্ত লীলাময়ী নায়িকার প্রভাব। শাক্তসাহিত্যে নারী মাতা, সাধক ও জীব তাঁহার সন্তান। সুতরাং শাক্তধর্মে নারী মাতা ও জননী এবং শ্যামাসাহিত্যে ও উমাসাহিত্যে নারী মাতৃরূপিনী। তন্ত্রসাহিত্যে ও তন্ত্রে নারীর যে নায়িকা রূপ নাই—তাহা নহে তবে মাতৃরূপেই ইহার বিশেষ প্রকাশ। বঙ্কিম নারী চরিত্রে দেখি বিষ্ণুমায়ার প্রভাব। তৃতীয় উত্তর এই যে, হয়ত বঙ্কিম তাঁহার নিজের জীবনে জননীর বিশেষ প্রভাব অনুভব করেন নাই এবং সেই কারণে বিশিষ্ট মাতৃচরিত্র তাঁহার সাহিত্যে প্রকাশ পায় নাই। এই উত্তর খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না; কারণ এমন কোন কথা নাই যে সাহিত্যিক কেবলমাত্র তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতাই সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবেন এবং অন্য অনুভূতি যাহা তাঁহার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত নহে তাহাকে প্রকাশ করিবেন না। বিশেষ করিয়া বঙ্কিমসাহিত্যে ইহা ভাবা যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে। যে বিরাট অনুভূতির পরিচয় বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাসে রাখিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহার সর্বগামী দৃষ্টি ছিল, তিনি এই কারণে তাহা মাতৃচরিত্র সাহিত্যের বহির্ভূত রাখিবেন ইহা যুক্তিসহ নয়। চতুর্থ উত্তর হইতে পারে যে, মাতৃচরিত্র বঙ্কিমের নিকট এত অন্তরের অন্তরতম ছিল যে তাহা তিনি উপন্যাসের অন্তর্গত করিতে চাহেন নাই। যাহা সকল মান ও পরিমাপের বাহিরে সেই মাতৃরূপ তাই বঙ্কিমের উপন্যাসে নাই। এই চারিটি সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে ইহাই মনে হয় যে উপরোক্ত প্রথম দুইটি কারণই প্রকৃত ও অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

৭

॥ বঙ্কিমের পুরুষ-চরিত্র ॥

বঙ্কিমের উপন্যাসে পুরুষ-চরিত্র ব্যাপক ও বিচিত্র। ভ্রমর ও রোহিনীর দ্বন্দ্বের কুরুক্ষেত্র হইল পুরুষ গোবিন্দলাল। গোবিন্দলালের পৌরুষ আহত হইয়াছিল বলিয়া তিনি ভ্রমরের অন্নদাস হইয়া জীবনযাপন করিতে অস্বীকার করিলেন এবং ভ্রমরকে বলিলেন 'তোমায় আমায় সম্বন্ধ কি? আমি তোমায় অলঙ্কার দিব, তুমি পরিবে। তুমি বিষয় দান করিবে, আমি ভোগ করিব, এ সম্বন্ধ নহে।' তাহার পৌরুষ স্বাভাবিক ও সহজ। পুরুষোচিত উদারতারও তাহার অভাব ছিল না। এইজন্যে বিধবার কষ্ট দেখিয়া তাহার কাতরতা স্বাভাবিক এবং রোহিনীর প্রতি গোবিন্দলালের প্রথম করুণা দোষদুষ্ট নহে। যাহা দোষদুষ্ট তাহা গোবিন্দলালের অসংযমের ফলে সেই করুণার পরবর্তী বিকার। অসংযম একমাত্র কারণ নহে। রূপের মোহও গোবিন্দলালের অবনতির আর একটি কারণ। রূপের আদর দোষের নহে, রূপমোহ দোষের। পুরুষের প্রকৃতি স্বভাবত সৌন্দর্যানুরাগী। প্রকৃতির বিধানে পুরুষ নিজে সুন্দর, তাই সে সুন্দরের উপাসনা করে। বঙ্কিম তাই লিখিয়াছেন যে প্রকৃতি-জগতের সর্বত্র ইহার স্বাক্ষর বিদ্যমান। পুরুষ প্রজাপতি নারী প্রজাপতির চেয়ে সুন্দর, হরিণ হরিণীর চেয়ে সুন্দর। পুরুষ কোকিল নারী কোকিলের চেয়ে দেহে ও কণ্ঠে সুন্দর, ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রিনীর চেয়ে সুন্দর, সিংহ সিংহিনীর চেয়ে সুন্দর, ময়ূর ময়ূরীর চেয়েও সুন্দর। পুরুষ তাহার নিজের সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যবোধ নারীতে আরোপ করিয়া নারী সৌন্দর্যকে আরও মনোহর ও উজ্জ্বলতর করে। তাহা দোষের নহে, তাহা স্বভাববিরুদ্ধও নহে এবং তাহা প্রকৃতিরই নিয়মানুগামী।

গোবিন্দলালের পক্ষে যাহা দোষের, তাহা এই যে রোহিনীর রূপ গোবিন্দ-লালকে অধর্মের পথে লইয়া গিয়াছিল। পুরুষ গোবিন্দলাল অরূপ ভ্রমরের রূপ অন্তরে অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করিবার পৌরুষ দেখাইতে পারেন নাই। দ্বাদশ বৎসর পরে সন্ন্যাসী গোবিন্দলাল যখন ভাগিনেয় শচীকান্ত নির্মিত পুরাতন বারুণীঘাটে ভ্রমর-স্মৃতিমন্দিরে স্থাপিত ভ্রমরের স্বর্ণপ্রতিমা দেখিতে আসিয়াছিলেন তখন গোবিন্দলাল তাহার বঞ্চিত

পৌরুষের আত্মগ্লানি গোপন রাখিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন 'এই ভ্রমর আমার ছিল, আমি গোবিন্দলাল রায়।' যথার্থ সুন্দর কি সে সম্বন্ধে প্রথম জীবনে গোবিন্দলালের ধারণা খুব সুস্পষ্ট ছিল না কিন্তু শেষ জীবনে সন্ন্যাসী পুরুষ গোবিন্দলাল কথা বলিলেন 'ভ্রমরাধিক ভ্রমর'কে স্মরণ করিয়া সেই সৌন্দর্যের স্বীকৃতি দান করিলেন। যে সুন্দর, সে সুন্দরের ও কল্যাণের পথ দেখায়, তাই সুন্দর ভ্রমর তাহার জীবন ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া গোবিন্দলালের সুপ্ত পৌরুষ ও চেতনা জাগ্রত করিয়া, সেই নিত্য সুন্দর, 'ভ্রমরাধিক ভ্রমরে'র সন্ধান দিয়া গেল। নারীর এই শেষ দানেই পুরুষের চরম মুক্তি। আগে সে বন্ধনে বাঁধে, পরে সেই পুরুষের বন্ধন আপনি খুলিয়া দেয়।

কপালকুণ্ডলার নবকুমার আদর্শ পুরুষ এবং আদর্শ স্বামী। মোগল সাম্রাজ্যের অপরিসীম ঐশ্বর্য যাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই, সেলিমের রাজকান্তি যাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই, সেই ল্যুৎফ-উন্নিসা (মতিবিবি) আগ্রার রাজপ্রাসাদ হইতে সপ্তগ্রামের পথে আসিয়া যখন নবকুমারের পদতলে ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল 'তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছুই কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য, পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে সকলই দিব, কিছুই তাহার প্রতিদানে চাহি না। কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব এ গৌরবও চাহি না। কেবল দাসী', তখন নবকুমারের পুরুষ-চরিত্রের কঠিন পরীক্ষা হইতেছে। নবকুমার দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দারিদ্র্য তাহার ভূষণ, ল্যুৎফ-উন্নিসা পরস্ত্রী, তাহার অর্থ গ্রহণ মহাপাপ। তাই নবকুমারের পৌরুষ নিরহঙ্কার, ধীর শান্ত কণ্ঠে বলিতেছে 'তুমি আবার আগ্রায় ফিরিয়া যাও। আমার আশা ত্যাগ কর'। সমস্যার সমাধান নিঃসন্দিগ্ধ, করুণ অথচ দৃঢ়, বিচার সংক্ষিপ্ত কিন্তু রূঢ়, সত্য ও অপরিবর্তনীয়। এই পৌরুষই পান্থনিবাসে মতিবিবির বিভ্রান্তকারিণী রূপলাবণ্যের প্রথম দর্শনে নবকুমারকে দীপ নিভাইয়া দিতে প্রেরণা দিয়াছিল, যাহাতে সেই দীপালোকে ঐ মনোহর রূপ আর দেখিতে না হয়। এই শক্তি ও পৌরুষ নবকুমার কোথা হইতে পাইল? কপালকুণ্ডলার প্রতি তাহার নিষ্ঠা ও প্রেম হইতে। রমণীকণ্ঠে নবকুমার এই প্রথম শুনিয়াছিল 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ'। যে রমণী ভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইয়াছে সেই কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রেম হইল তাহার যথার্থ পৌরুষ সঞ্জাত, যে প্রেম কপালকুণ্ডলার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াও এবং পূর্ণ পরিণতি না পাইয়াও, মলিন হয় নাই। ইহাও নবকুমারের দৃপ্ত পৌরুষের পরিচয়।

চন্দ্রশেখর বঙ্কিমের এক বিচিত্র পুরুষচরিত্র। সাধারণ দৃষ্টিতে এ পুরুষ-চরিত্র নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় মনে হইতে পারে; কারণ কোন বিরাট কর্মের বা সার্থকতার রাজতিলক তাহার ললাটে শোভা পায় নাই। কিন্তু চন্দ্রশেখর এই উপন্যাসের শুধু নামমাত্র নহে। চন্দ্রশেখর ইহার কেন্দ্র। চন্দ্রশেখর নবাবের শিক্ষক এবং সেই নবাবের প্রেয়সী মহিষী দলনী বেগমের আশ্রয়দাতা। সেই চন্দ্রশেখরেরই স্ত্রী শৈবলিণী যাহার কল্যাণের জন্য রামানন্দ স্বামী তাঁহার দুর্লভ যোগৈশ্বর্য প্রয়োগ করিয়াছেন। অন্যদিকে প্রতাপ নবাবের প্রধান যোদ্ধা। সেই নবাবের সহিত চন্দ্রশেখরের সম্পর্ক অতি বিচিত্র। যদিও চন্দ্রশেখর স্বয়ং এই উপন্যাসের নায়ক নহেন তথাপি কেমন করিয়া যেন সমস্ত উপন্যাস জুড়িয়া তাঁহার প্রভাব অলক্ষ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে। সেই দৃষ্টিতে উপন্যাসের নামকরণ সার্থক। চন্দ্রশেখরের পুরুষ চরিত্রে এক অদৃশ্য সংযম ও অনির্বচনীয় সহ্যগুণ দেখিতে পাই। শৈবলিণীর প্রতাপের প্রতি ভালবাসা, এবং শৈবলিণীর বহু ত্রুটি যেন তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না। চন্দ্রশেখর কেবলমাত্র একবার শৈবলিণীকে প্রতাপের কথা বলিয়াছিলেন, যাহা আমরা শৈবলিণীর নারীচরিত্র আলোচনা করিতে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু আর কোনদিন শৈবলিণীর প্রতি কোন রুষ্ট বা অভদ্র ব্যবহার করেন নাই। স্ত্রীর চরিত্র, ব্যবহার ও স্বভাবের ত্রুটি ক্ষমা করা ও সহ্য করা চন্দ্রশেখরের শান্ত পৌরুষের পরিচয়। চরিত্রের গভীরতা ও দৃঢ়তা না থাকিলে খুব কম পুরুষই এই সংযম প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। বিষয়বিমুখ ও সদা পাঠনিরত চন্দ্রশেখর যদিও শৈবলিনীকে সুখী করিতে পারেন নাই, তথাপি সেই জন্যই সে চরিত্র মহান, মনোহর ও চিত্তাকর্ষক; কেন না তাহাতে রহিয়াছে নানা বিপর্যয়ের ভিতরেও এক বিপুল ও অটল আদর্শনিষ্ঠা। কোন সংঘাতই চন্দ্রশেখরের শান্ত জীবনছন্দ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে নাই।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়ক প্রতাপ। শৈবলিনী যেমন জটিল নারীচরিত্র প্রতাপ তেমনি জটিল পুরুষ চরিত্র। এই পুরুষের চরিত্রে বঙ্কিম আদর্শ-নিষ্ঠার ও অবৈধ প্রণয়ের এক বিচিত্র সমন্বয় দেখাইয়াছেন। প্রতাপের প্রেমের সাধনা বিচিত্র ও মহিমান্বিত। শৈবলিনীর সহিত তাহার বাল্যপ্রণয় ছিল। বঙ্কিম বলিয়াছেন বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে। সে অভিসম্পাত প্রতাপ সহ্য করিয়াছিল। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ প্রতাপের জীবনে সেই অভিসম্পাত আনিয়াছিল, কিন্তু প্রতাপের পৌরুষ এই যে তাহা প্রতাপকে ধর্মভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। সে বাল্যের ও যৌবনের আকর্ষণকে এমনভাবে

রূপান্তরিত করিল যে তাহা এক মহাশক্তি ও শৌর্যে পরিণত হইল। যাহা অবৈধ হইতে পারিত তাহাকে সমাজসংগত সীমার মধ্যে রাখিয়া প্রতাপ ধর্ম, সমাজ ও পৌরুষ এই তিনকেই রক্ষা করিল। যে প্রেম বহির্মুখী হইলে সমাজে ও জীবনে গ্লানি আনয়ন করিত তাহাই অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় নিত্য প্রেরণাস্বরূপ হইয়া প্রতাপকে শ্রেষ্ঠ সাধকে পরিণত করিল। সেই সাধনার আবেগে চরম মুহূর্তে জীবন বিসর্জন করাও প্রতাপের নিকট তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল; তাই রামানন্দ স্বামীকে সে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় বলিয়া গেল 'কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী, এ ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।' প্রতাপের সাধনা রামানন্দের সাধনার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতাপের সাধনা প্রণয়ের, রামানন্দের সাধনা সংযমের কিন্তু উভয় সাধনার সিদ্ধিই প্রেম।

প্রতাপ যে লরেন্স ফষ্টারকে আঘাত করিয়া শৈবলিনীকে রক্ষা করিল, তাহা কেবলমাত্র পুরুষের নারী উদ্ধারের চিত্র নহে। ইহা বিগত-গৌরব মুসলমান নবাবের ও নবাগত ইংরাজের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের ইতিহাসের ইঙ্গিতময় উপক্রমণিকা। প্রতাপ সেই ইতিহাসের পুরোভাগে প্রধান নায়ক ও যোদ্ধা। জগৎশেঠ ও গুরগণ খাঁ তাহার ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং নবাবের শেষ যুদ্ধে প্রতাপ প্রধান ও অগ্রণী যোদ্ধা। যুদ্ধই তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা এবং জীবনের অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাই বোধহয় প্রতাপের রূপসী স্ত্রী ও প্রতাপের অসামান্যা রূপবতী ভগ্নী এই চরিত্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন নাই।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের আর একটি বিশিষ্ট পুরুষ চরিত্র চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামী। তিনি অভিরাম স্বামীর বা মাধবাচার্যের ন্যায় বিষয়াসক্ত বা বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন সন্ন্যাসী নহেন। অথচ সাংসারিক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কর্ম হইয়া দাঁড়াইল শৈবলিনীর উদ্ধার; তাহাকে তাহার বৃত্তির, বিত্তের ও মানসিক দ্বন্দ্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি দান। স্বয়ং নির্লিপ্ত কিন্তু শরণাগত রক্ষায় সক্রিয়, রামানন্দ ভারতের আদর্শ সন্ন্যাসী চরিত্র; ধর্মের পথপ্রদর্শক অথচ সংসারের নির্ভরস্থল। রামানন্দ স্বামী শৈবলিনী ও দলনী উভয়কেই রক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের ভাগ্যবিপর্যয় ও কর্মফল রামানন্দকে বিচলিত করে নাই বা তাঁহার ভগবদ্বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

দেবী চৌধুরাণীতে হরবল্লভ ও তাহার পুত্র ব্রজেশ্বর বিশিষ্ট পুরুষ-চরিত্র। ইহাদের চরিত্রগত বৈষম্য পিতাপুত্রের সম্বন্ধের ভিতর দিয়া বিশেষ-

ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। হরবল্লভ পাপ পথের পথিক, কিন্তু এই পাপাত্মা কাপালিক, পশুপতি, গুরগণ খাঁ হইতে পৃথক। হরবল্লভ স্বার্থপর এবং তাহার স্বার্থানুসন্ধানের শেষ নাই। যদিও সে অকারণে অন্যের অনিষ্ট সাধন করিতে অগ্রসর হয় না, তথাপি নিজের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ হইলে, তাহার নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন কোন অন্যায় বা অত্যাচার ছিল না যাহা করিতে সে প্রস্তুত ছিল না। তাহার ধর্মজ্ঞান প্রকৃত নহে, ভয়জনিত এবং তাহা সে ব্যবহার করিত একটি কৃত্রিম আবরণরূপে ও সমাজে সুনাম অর্জন করিবার জন্য। প্রফুল্লর সহিত তাহার ব্যবহার নির্মম ও নিষ্ঠুর। জগতে নারীর মর্যাদা সে বুঝিত না। অসহায় নিরুপায় বিধবার কলঙ্ক শুধু মিথ্যা অপবাদ না যথার্থ, তাহার বিচার করিবার সাহস বা উদারতা কোনটাই এই পুরুষচরিত্রে ছিল না। তাহার সমাজনীতিতে পুরুষের একাধিকবার বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না এবং সেই কারণেই দেখি যে, হরবল্লভ নিঃসঙ্কোচে ও অকাতরে কৃতদার পুত্রের জন্য আবার পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছে। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়া হরবল্লভ এক অদ্ভুত সৃষ্টি। হরবল্লভের নিকট অন্য কোন কিছুরই কোন মূল্য নাই। তাহার নিজের লাভ, লোকসান, যশ, অপমানই একমাত্র মাপকাঠি। দেবী রানীকে ধরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা, শেষে বিপাকে পড়িয়া যে কোন প্রস্তাবে রাজী হওয়া এবং অবশেষে প্রফুল্লকে গ্রহণ করিয়া নতুন বৌ বলিয়া প্রচার করা হরবল্লভ চরিত্রের কাপুরুষতার এবং নীতিবোধহীন মানসিক শিথিলতার পরিচায়ক। এইরূপ পুরুষ সমাজের ও সংসারের কণ্টকস্বরূপ। হীরা যেমন নারীচরিত্রের দিক দিয়া, হরবল্লভ তেমনি পুরুষচরিত্র হিসাবে মনুষ্যসমাজে নিতান্ত নীচাশয় জীব।

পুত্র ব্রজেশ্বর পিতা হরবল্লভের ন্যায় নরাধম নহে। ব্রজেশ্বর সাধারণ বাঙ্গালী ভাল মানুষ; যাহার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, বৈশিষ্ট্য নাই, ব্যক্তিত্ব নাই, পৌরুষ নাই এবং মন তাহার ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে সন্তুষ্ট। 'ভাল ছেলে' হইবার সুখ্যাতি অর্জন করিবার জন্য, সে পিতার আদেশে অম্লানবদনে প্রফুল্লকে বাহির করিয়া দিতে স্বীকৃত হইল। তাহার স্বকীয় বিচারশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন দৃঢ়তাই দেখা যায় নাই। অপুরুষোচিত লজ্জা ও ভয়ের জন্য সে প্রফুল্লকে ঘরে ডাকিয়া আনিবার সাহস পায় নাই, কিন্তু তাহাকে লুকাইয়া দেখিতে যাইবার সুযোগ ছাড়ে নাই। গুণের মধ্যে বহু-পত্নীক হইয়াও ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু তথাপি দেবীচৌধুরাণীর রূপ ও ব্যক্তিত্ব তাহাকে চঞ্চল করিয়াছিল। তাহার নীতিবোধে একটি ঘূর্ণাবর্ত

ছিল। একদিকে প্রফুল্ল ডাকাত বলিয়া তাহার প্রতি সে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছে, আবার অন্যদিকে তাহারই অর্থে পিতাকে রক্ষা করিতে সে কোন কুণ্ঠাবোধ করে নাই। ধর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত ব্রজেশ্বর 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' বুলি মন্ত্রচালিতের মতন আওড়াইয়া পদে পদে নিজে অপদস্থ হইয়াছে এবং অন্যায়ের ও অত্যাচারের সহায়ক হইয়াছে, কিন্তু কোথাও অবিচারের কোন প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হয় নাই।

কিন্তু এই মেরুদণ্ডহীন অতি সাধারণ এবং ব্যক্তিত্ববিহীন পুরুষ ব্রজেশ্বর একেবারে নির্গুণ নহে। সেই হরবল্লভকে দেবীসিংহের নিকট হইতে রক্ষা করিয়াছে। আর কি করিয়াছে? সে দস্যুনেত্রী দেবী চৌধুরাণীর প্রাণে ও হৃদয়ে উপেক্ষিত সুপ্ত রমণীহৃদয় আবার জাগাইয়া তুলিয়াছে। যদিও ব্রজেশ্বর চরিত্র ব্যক্তিত্বহীন, ইহাতে প্রেম ও পিতৃভক্তির এক সামঞ্জস্যের প্রচেষ্টা আছে। একটি দিকে এই নির্বিশেষ পুরুষচরিত্রে কিছু বৈচিত্র্য আছে। ব্রজেশ্বর ত্রিপত্নীর স্বামী। একটি সাগর-বৌ, দ্বিতীয় নয়ান-বৌ এবং তৃতীয় প্রফুল্ল। তিনজনই বিভিন্ন প্রকৃতির। বহু পত্নী লইয়া যাহাকে ঘর করিতে হয় তাহাকে অতি সাবধানে সবদিক বাঁচাইয়া চলিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। ব্রজেশ্বরের তিন পত্নীর সহিত ব্যবহারে বিভিন্নতা এবং দাম্পত্য সম্পর্কে ব্রহ্মঠাকুরাণীর সহিত রসাত্মক বাক্যালাপে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমের পুরুষচরিত্রের মধ্যে সীতারাম অনন্যসাধারণ ও অদ্বিতীয়। মনোবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এই পুরুষচরিত্র বহু প্রবৃত্তির, বহু আকাঙ্ক্ষার ও বহু বিরোধী ভাবের রণক্ষেত্র। বিভিন্ন অবস্থায় তাহার বিচিত্র ভাব ও ব্যবহারের বিকাশ এবং তাহার শেষ অপ্রত্যাশিত পরিণতি যেমন মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাবহুল তেমনি বিস্ময়কর ও অভিনব। এই যুক্তিতে সীতারাম চরিত্র বঙ্কিমের অন্যান্য পুরুষচরিত্র হইতে পৃথক।

সীতারাম চরিত্রের প্রথম দুর্বলতা তাহার অতৃপ্ত ও অতিশয় রূপমোহ। শ্রীর সহিত প্রথম দর্শনে সীতারাম প্রশ্ন করিতেছে 'তুমি শ্রী এত সুন্দরী'। ইহাই তাহার একমাত্র দুর্বলতা নহে, কারণ তাহা হইলে বুঝিতাম ইহা অনেক পুরুষেরই স্বাভাবিক দুর্বলতা এবং সেইজন্য ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু তাহার দ্বিতীয় দৌর্বল্য সে পিতৃ-আজ্ঞার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া নিরপরাধী শ্রীকে নিঃসঙ্কোচে ত্যাগ করিল এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে কর্তব্য তাহার অবহেলা করিল। হিন্দুর স্বাধীন রাষ্ট্র সংগঠন সীতারামের পুরুষোচিত উচ্চাভিলাষ

ও আকাঙ্ক্ষা বটে। হিন্দুরাজ্য স্থাপনার জন্য যুদ্ধ ও আত্মত্যাগের ইচ্ছা সেই পৌরুষের জয়তিলক। চাঁদশা ফকিরের সহিত তাহার কথোপকথন সীতারাম-চরিত্রে ধর্মজিজ্ঞাসার নিদর্শন। তাহার স্বীয় সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া ফকিরের যুক্তি গ্রহণ ও স্বীকার করা সীতারামের ধর্মবিষয়ে উদারতার পরিচায়ক। শ্যামাপুর নাম না রাখিয়া তাহার রাজত্বের নাম মহম্মদপুর রাখিতে স্বীকৃতি সেই উদারতার পরাকাষ্ঠা।

তবে রূপের মোহ সীতারামের চরিত্রে প্রমাদ ডাকিয়া আনিল। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন-রূপে, বিভিন্ন অবস্থায় এই রূপের মোহই তাহার মহতী বিনষ্টির কারণ। সীতারাম এই রূপের আকর্ষণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করেন নাই তাহা বলা যায় না, কিন্তু সে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়াছেন। যুদ্ধের সময় শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্তি সীতারামের পুরুষচরিত্রে উচ্চাভিলাষের ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। রূপমুগ্ধ সীতারাম সেই বিগ্রহ ধ্যান করিয়া সেই মোহকে কর্মের প্রেরণায় রূপান্তরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই রূপের মোহই সীতারামকে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল, যখন তিনি গঙ্গারামের জন্য জীবন বিসর্জনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনী স্ত্রী শ্রীর প্রত্যাখ্যান তাঁহার মোহকে রূপান্তরিত করিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল; সেই সঙ্গে তাঁহার শেষ নৈতিক অবলম্বনটুকুও ভাঙ্গিয়া ছারখার হইয়া গেল। ফল কি হইল? স্বাধীন রাজা সীতারাম রাজ্য পাইলেন বটে, কিন্তু শ্রীকে হারাইয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া মদের নেশায় ডুবিয়া রহিলেন। এই কর্তব্যচ্যুতির পরিণামে রমা মরিল, চন্দ্রচূড় ভর্ৎসনা পাইল, রাজকর্মচারী-গণ শূলে প্রাণ দিল। সীতারাম ক্রমেই ক্ষিপ্ত, অপ্রকৃতিস্থ ও মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইলেন। ক্রোধ হইতে আসিল সম্মোহ। হিংস্র পশুর ন্যায় এই সম্মোহে সীতারাম জয়ন্তীকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রোষ আপাতস্বাভাবিক মনে হইলেও অমার্জনীয়। সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম এবং স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে ধ্বংস। এই ক্রমাবনতি সীতারামের চরিত্রে পরিষ্কার। প্রতিহত আকাঙ্ক্ষা, রূপের মোহ ও মোহজ বিকার ইহার মূল।

একদা আত্মোৎসর্গে প্রস্তুত, হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজ সীতারাম কামার্ত পশুতে পরিণত হইয়া, রাজত্ব ও মনুষ্যত্ব দুই-ই নষ্ট করিলেন। মানবমনের আকাঙ্ক্ষা ও বিকার কত বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে পারে তাহার জ্বলন্ত উদাহরণ এই সীতারামের

চরিত্র। অন্তিম দৃশ্যে দুর্গপ্রাচীরভেদী কামানের শব্দে, আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া সীতারাম যখন তাহার নৈতিক চেতনা ফিরিয়া পাইয়া আপনার পুনরুদ্ধারের পথ অনুসন্ধান করিতেছেন তখন তাহার ভিতর দিয়া বঙ্কিম এই শিক্ষাই দিতেছেন যে, ভারতীয় আদর্শে ও সাধনায় সকল পাপীরই পুনরুদ্ধারের পথ আছে এবং সকল পাপের মোচন আছে এবং পাপের ও পাপীর অন্তহীন নরকবাস ভারতীয় শাস্ত্রের আদর্শের ও সভ্যতার শেষ কথা নহে। ইহার সম্যক উপলব্ধির অভাবে সীতারামের এই বিপুল পরিবর্তনকে অস্বাভাবিক বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং এই সমালোচনার এক দিকে আছেন শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত এবং বিপরীত দিকে রহিয়াছেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ও সীতারাম, এই তিন উপন্যাসেই নায়কের সম্মুখে প্রলোভনের জাল বিস্তার করা হইয়াছে। ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রলোভনের সহিত পুরুষকারের যুদ্ধ। এই তিন নায়কের মধ্যে কেহই, দুর্বল-হৃদয় ও দুর্বল প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন না। যাঁহার প্রণয় নিকৃষ্ট, যিনি গুণের কদর না করিয়া রূপসমুদ্রে আত্মবিসর্জন দিলেন তিনি অবশেষে প্রণয়িনীকে সংহার করিয়া নিজের পাপজীবনের অবসান ঘটাইলেন এবং পরে মোহমুক্ত প্রেমের সাধনায় নিজের প্রকৃত উদ্ধার সাধন করিলেন। যাহার প্রণয় অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং যিনি গুণকে অবহেলা না করিয়াও রূপের সেবা করিলেন তিনি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াও ধ্বংস হইলেন না। যাহার প্রণয় বিশুদ্ধ, যিনি সংযমী তিনি জয়ী।

সীতারাম উপন্যাসে ধর্ম ধ্রুবতারার মতো সর্বদা ইহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই ধর্মদৃষ্টির প্রতীক দুইটি পুরুষ চরিত্র। সীতারামের গঙ্গাধর-স্বামী পরমযোগী ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ। আবার জ্ঞানী চাঁদশা ফকির সর্ব-ভূতে সমদর্শী সিদ্ধপুরুষ। উভয়ই সর্বত্যাগী অমায়িক কিন্তু আর্তের কল্যাণে ও সেবায়, উপদেশপ্রার্থী শিষ্যের আহ্বানে সদাজাগ্রত।

আনন্দমঠের পুরুষচরিত্রসমূহ সন্তান সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট। ইহার বাহিরে আছে মহেন্দ্র। সে তাহার বিত্তসম্পত্তি, ঘর বাড়ী এবং তাহার নিজের অকাতর শ্রম দিয়া সন্তান সম্প্রদায়কে দেশহিতব্রত যাপনে সহায়তা করে। তাহার বিরাট আভিজাত্য ছিল কিন্তু তথাপি বিপুল বিপ্লবের যুগে সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সহিত নিজেকে সংযুক্ত ও সমঞ্জস করা তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও পৌরুষ জ্ঞাপন করে। নিত্য নূতন অবস্থায় অভাবনীয়

পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়াও সে স্রোতমুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যায় নাই এবং যখনই প্রয়োজন হইয়াছে সেই প্রবল স্রোতকে নিজের জীবনের সঙ্গে সর্বদা মানাইয়া নিয়াছে।

সত্যানন্দ আনন্দমঠের প্রধান নায়ক। ধর্মনিষ্ঠ, সত্যের প্রতিষ্ঠায় অবিচল, ত্যাগী, সংযমী সত্যানন্দ ভারতের জাতীয় আদর্শের প্রতিচ্ছবি। সর্বত্যাগী কিন্তু মহান কর্মবীর। অতন্দ্র যোদ্ধা কিন্তু সদা করুণাময়। গীতার আদর্শ তাঁহার পৌরুষে ও চরিত্রে প্রতিফলিত। অতুল ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু নিরাসক্ত ও নিরহঙ্কারী, পরার্থে সমাজসেবায় ও দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। দেশের কল্যাণ, জগতের হিত, অধর্ম নাশ ও ধর্মসংস্থাপন তাঁহার জীবনের দীক্ষা ও ব্রত। মানুষের সুখ দুঃখে সর্বদা সজাগ কিন্তু নিজে অবিচলিত।

এই সকল বৃত্তি সত্যানন্দকে আদর্শ নেতা করিয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বে বজ্রের ক্ষমতা ও সম্মোহিনী শক্তি ছিল যাহার চিরন্তন উৎস ছিল তাহার ধর্মানুগত জীবন। তাঁহার নেতৃত্বই সন্তান সম্প্রদায় সংগঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার সংগঠন-কৌশল ও সংগঠন রীতি ও পদ্ধতি ভারতের সনাতন ধর্মাশ্রিত, সমাজের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে নিয়োজিত। জীবানন্দ, ভবানন্দ, ব্রহ্মচারী ও সমস্ত সন্তান সম্প্রদায়কে একসূত্রে ও এক আদর্শে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া যে সংগঠনপদ্ধতি ও কর্মনীতির উদাহরণ তিনি দেশের সম্মুখে কার্যকরীভাবে দেখাইলেন, তাহাই আগামীযুগের মুক্তির শঙ্খধ্বনি হইয়া বাজিয়া উঠিয়াছিল। সেই সঙ্ঘকর্তা শক্তিধর সত্যানন্দ চরিত্র বঙ্কিমের ধ্যানদৃষ্টির অপূর্ব রচনা।

কিন্তু সত্যানন্দ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলেন না। তাঁহারও উৎস ও প্রেরণা আসিয়াছিল একজন কালজয়ী মহাপুরুষের নিকট। যখন যুদ্ধে জয়লাভ হইয়াছে, যখন সনাতন ধর্ম নিষ্কণ্টক হইয়াছে তখন প্রত্যাদেশ হইল যে সত্যানন্দকে এইবার ফিরিতে হইবে। তখন সত্যানন্দের মনেও ক্ষণতরে সন্দেহ আসিল। মহাপুরুষ সেই কঠিন সন্ধিক্ষণে সত্যানন্দকে স্মরণ করাইয়া দিলেন ভারতের শাশ্বত আদর্শ এই বলিয়া : 'তোমার কার্যসিদ্ধি হইয়াছে, শত্রু আর নাই, চল এখন জ্ঞানলাভ করিবে।' মানুষের কর্মে অধিকার, কর্মফলে নহে। সত্যানন্দের জয়ের ফলভোগ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং সেই কারণে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে শেষ ও চরম শিক্ষা দান করিলেন। প্রথমে কর্ম, পরে জ্ঞান। কর্ম বিনা জ্ঞানলাভ অসম্ভব। কিন্তু কর্মাসক্তি হইতে মুক্ত হইতে হইবে, কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। এই বিরাট পুরুষ চরিত্র সেই নির্দেশ বহন করিতেছে।

বঙ্কিমের পুরুষ চরিত্র যেমন বিভিন্ন তেমনি বিচিত্র। আদর্শ পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, অধম পুরুষ, পুরুষরূপে দেবতা ও পুরুষরূপে পশু, প্রেমিক, মোহাসক্ত, প্রলোভনের সহিত যুদ্ধে কেহ নিহত, কেহ বিজয়ী, রাজা, নবাব, জমিদার, রাজকর্মচারী, যোদ্ধা, কর্মী, বীর, সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী, সাধক, ভণ্ড, কপটাচারী, স্বেচ্ছাসেবক, দেশভক্ত, নারীর প্রতি প্রেম, দেশপ্রেম, ধর্মপ্রেম সকলই বঙ্কিমের সৃষ্ট পুরুষ চরিত্রগুলিতে পাওয়া যাইবে। একই স্তরের ও শ্রেণীর পুরুষেরও বিচিত্র প্রকৃতি। নগেন্দ্রনাথের ন্যায় জমিদার, মন্দিরে নিত্য অতিথি সেবায় ও অন্নবিতরণে যত্নপরায়ণ। কৃষ্ণকান্তের ন্যায় জমিদার দানে বিখ্যাত। দরিদ্র ও আর্তকে দান করিতে তিনি মুক্তহস্ত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সেবায় তিনি নিষ্ঠাবান। ইহার বিপরীত উদাহরণ দেবেন্দ্রের ন্যায় কুক্রিয়াসক্ত সমাজদ্রোহী জমিদার এবং জমিদার হরবল্লভ—স্বার্থপর, নিজের কার্যোদ্ধারে নিয়ত ব্যস্ত এবং পরে উপকারীকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে অকুণ্ঠিত। কৃষ্ণকান্তের উইলে অনেক গৌণ পুরুষচরিত্রের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি চতুর উৎকোচদাতা পিতা মাধবীনাথ, জালিয়াৎ হরলাল, বন্ধুবৎসল নিশাকর, খানসামা সোনারূপা, মিথ্যাসাক্ষীদাতা ও স্রষ্টা ফিচেল খাঁ, গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টার এবং সাধারণ পরশ্রীকাতর পুরুষ। উত্থান, পতন, যুদ্ধ ও সংগঠন বঙ্কিমের বহু পুরুষচরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং বঙ্কিমের এই পুরুষচরিত্রের মিছিলে পুরুষ, সুপুরুষ ও কাপুরুষ সকলেই বর্তমান।

কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় পুরুষচরিত্রে সম্পূর্ণতা থাকিলেও যেন মনে হয় কোথায় এক অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসে সত্যানন্দের ন্যায় পুরুষ-সিংহ আছে, নবকুমারের ন্যায় আদর্শ স্বামী আছে, কিন্তু আদর্শ পিতা নাই।

৮

॥ বঙ্কিম-সাহিত্যে দাম্পত্য প্রণয় ॥

বঙ্কিমের দাম্পত্য জীবন তাঁহার সাহিত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্কিম যদিও গম্ভীর প্রকৃতি কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল প্রেমিকের। যিনি নিজের জীবনে প্রেমের সৌন্দর্য, মাধুর্য, ঐশ্বর্য, মাদকতা ও শান্তি পাইয়াছেন—তিনি ভাগ্যবান। তিনি যদি আবার রসজ্ঞ সাহিত্যিক হন, তাহা হইলে সেই প্রেমের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যের উপর পড়া স্বাভাবিক। বঙ্কিম-সাহিত্যে ইহা বিশেষভাবে সত্য।

বঙ্কিমের প্রথমা স্ত্রী মোহিনীদেবী। এই বিবাহ হয় তাঁহাদের অতি অল্প বয়সে, তখনকার সময়ের ও সমাজের রীতি অনুসারে। বঙ্কিমের এই বিবাহ তাঁহার ১১ বৎসর বয়সে হয়। মোহিনীদেবীর বয়স এই বিবাহের সময় মাত্র পাঁচ ছয় বৎসর ছিল। মোহিনীদেবী উজ্জ্বল গৌরবর্ণা, তন্বী ও অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। তিলোত্তমাই বঙ্কিমের জ্যোৎস্নাময়ী মোহিনী প্রতিমা। তাঁহার প্রথম উপন্যাস, দুর্গেশনন্দিনীতেই মোহিনীর অলৌকিক রূপরাশির বর্ণনা বঙ্কিম করিতেছেন :

'পাঠক। কখন কি কিশোর বয়সে কোন স্থীরা, ধীরা কোমল প্রকৃতি কিশোরীর নবসঞ্চারিত লাবণ্য প্রেমচক্ষুতে দেখিয়াছেন, একবার মাত্র দেখিয়া চির জীবনমধ্যে যাহার মাধুর্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই? কৈশোরে, যৌবনে, প্রগল্‌ভ বয়সে, কার্যে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায় পুনঃ পুনঃ যে মোহিনী মূর্তি স্মরণ পথে স্বপ্নবৎ যাতায়াত করে, অথচ তৎসম্বন্ধে কখন চিত্তমালিন্যজনক লালসা জন্মায় না, এমন তরুণী কি দেখিয়াছেন?'

বঙ্কিমজীবনে ও সাহিত্যে তাঁহার প্রথমা পত্নী মোহিনীর স্মৃতি কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহা তাহার এক ক্ষুদ্র উদাহরণ। মোহিনীদেবীর সহিত বঙ্কিমের পুতুল লইয়া, কবিতা লইয়া ও লেখাপড়া লইয়া বালক-বালিকাসুলভ কলহও হইত। মোহিনীদেবী প্রায়ই নারায়ণপুরে থাকিতেন, কারণ তিনি তাঁহার পিতামহের বড় আদরের পৌত্রী ছিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় বঙ্কিমের বিরহব্যথা অসহ্য হইত। প্রায় প্রতি নিশীথে, সকলে যখন নিদ্রিত, সকলের অগোচরে বঙ্কিম বাহির হইয়া পড়িতেন। বাড়ীর পশ্চাৎদিক

হইতে কোনাকুনি রাস্তায় মাঠের উপর দিয়া শ্বশুরবাড়ী আসিয়া স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতেন। কিন্তু পাঠে এমন কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন যে আবার অরুণোদয়ের পূর্বেই বাড়ী আসিয়া পড়িতে বসিতেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র ইহা দেখিয়া মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন 'বঙ্কিম কি সারারাত জেগে পড়িতেছে।' কখনও কখনও একথার উত্তর দিত ভৃত্য। শৈবলিনী প্রতাপে যে বাল্যপ্রণয় তাহাতেও মোহিনীর স্মৃতির চিহ্ন আছে।

বঙ্কিমের 'ললিতা' কবিতাটিতে প্রথম মোহিনীদেবীর প্রভাব এইভাবে প্রকাশ পাইয়াছে :

(ক) নাথ ভুজে মাথা দিয়া পড়েছে মোহিনী।
(খ) মন্মথমোহিনী প্রতি কহিছে হে প্রিয়।
(গ) ধূলি হয়ে কুঞ্জবনে মন্মথ-মোহিনী নাথ সনে।

বঙ্কিমের প্রথম কর্মস্থল ছিল যশোহর। যশোহরে মোহিনীদেবীকে লইয়া যাইতে পারেন নাই। যখন মোহিনীদেবীকে রাখিয়া বঙ্কিম যশোহরে যাইতেছেন তখন তাহার কিশোরী স্ত্রীর অবস্থা কিরূপ তাহা ভ্রমরের উক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন কতদূর নিবিড় ও একান্ত ছিল তাহা কৃষ্ণকান্তের উইলে প্রতিফলিত হইয়াছে। যখন তিনি ভ্রমরের অবস্থা নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে মোহিনীর কথাই বর্ণনা করিতেছেন :

ভ্রমর শুনিল মেজবাবু দেহাতে যাইবেন। ভ্রমর বায়না ধরিল আমিও যাইব। কাঁদাকাঁদি হাঁটাহাঁটি পড়িয়া গেল। কিন্তু ভ্রমরের শাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন না। ভ্রমর আগে মাটিতে পড়িয়া কাঁদিল, তারপর উঠিয়া 'অন্নদামঙ্গল' ছিঁড়িয়া ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল, পুতুল সকল ফেলিয়া দিল, টবের ফুলগাছ সব কাটিয়া ফেলিল, আহারের অন্ন পাচিকার গায় ছড়াইয়া দিল,—চাকরানীর খোঁপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়া দিল—ননদের সঙ্গে কোঁদল করিল—এইরূপ নানা দৌরাত্ম্য করিয়া শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল।

যখন স্থির হইল মোহিনীদেবী বঙ্কিমের সহিত যশোহরে যাইবেন না, তখন তাঁহার মনের ভাব ও অনুরূপ কার্যকলাপের স্মৃতিই এই বিশদ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার বাস্তব ভিত্তি।

এই যশোহরে থাকিতে থাকিতেই বঙ্কিম মোহিনীদেবীকে চিরতরে

হারাইয়াছিলেন। মোহিনীদেবীর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বঙ্কিম তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন 'তোমাকে শীঘ্রই এখানে আনাইব।' এই পত্র পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া মোহিনীদেবী বাড়ীর সকলকে দেখাইয়াছিলেন। এক অদৃশ্য নিয়তি সেই আনন্দ পূর্ণ হইবার সুযোগ দেয় নাই। অল্প কয়েকদিনের জ্বরে, মাত্র ষোড়শ বৎসর বয়সে, মোহিনীদেবী দেহত্যাগ করেন। অসুখের খবর পাইয়াই বঙ্কিম বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন, কিন্তু শেষদেখা আর পাইলেন না। নিকটবর্তী ষ্টেশনে পিতা যাদবচন্দ্র ও অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র দেখা করিতে আসিয়া বঙ্কিমকে এই দুঃসংবাদ জানাইলেন। বঙ্কিম সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত ও বাক্‌রহিত হইলেন। এই অসহনীয় গভীর শোকে তিনি অশ্রুপাত পর্যন্ত করিলেন না, শুধু কেবল বাড়ী ফিরিলেন না, কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভ্রাতাকে কেবল যাইবার সময় এই অনুরোধ করিয়া গেলেন যে তাঁহার বৃত্তির অর্থে যে 'কানের দুল দুটি ও সোনার কাঁটা' তিনি মোহিনীদেবীকে স্নেহের উপহার দিয়াছিলেন, সেইগুলি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে। বঙ্কিমের নিজের মনের অবস্থা ও শোক তাঁহারই নিজের ভাষায় সাহিত্যে এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :

'স্বচিত্রিত পক্ষিনীর মতই হতাশ হৃদয়ে দেখিলেন, বৃক্ষ নাই, বাসা নাই, শাবক নাই—দগ্ধ হৃদয়ে দগ্ধ বনের উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।'

বাল্যকালের ও কৈশোরের এই প্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিম চন্দ্রশেখরে বলিয়াছেন যে বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে। চন্দ্রশেখরে তাই বঙ্কিম বলিতেছেন :

বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। বালকমাত্রেই কোন সময়ে অনুভব করিয়াছে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর। উহার চক্ষে কোন বোধাতীত গুণ আছে। খেলা ছাড়িয়া কতবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়াছে—তাহারই পথের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কতবার তাহাকে দেখিয়াছে। কখন বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কালক্রমে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।

বঙ্কিম তাঁহার সমস্ত অবশিষ্ট জীবনে মোহিনীদেবীকে ভুলিতে পারেন নাই। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায়, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত যশ, সমস্ত সৌভাগ্যে, সম্পদে ও বিপদে তাঁহার মনের ভিতর এই স্মৃতির প্রবাহ তিনি বহন

করিয়াছেন। বাহিরে এই স্মৃতি তিনি কখনও প্রকাশ করেন নাই—কারণ তাহা বঙ্কিমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বঙ্কিম মোহিনীদেবীর ছায়া দেখিতে পাইতেন। মৃত্যুর কয়েকদিবস পূর্বে বঙ্কিমকে বলিতে শোনা গিয়াছিল 'কে এই সধবা মেয়েটি আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।' শেষ জীবনে, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমের সেবা করিতেন এবং বঙ্কিম প্রায়ই সুরেন্দ্রনাথকে বলিতেন 'তোর সেজদিকে দেখছিরে, এবার আর উঠবো না, আমিও এবার তাঁর কাছেই যাব।' মৃত্যুর বৎসর ভিন্ন মোহিনীদেবী সম্বন্ধে বঙ্কিম কাহারও সঙ্গে কোন আলোচনা করেন নাই।

মোহিনীস্মৃতি বঙ্কিমের 'উত্তর চরিত' আলোচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইখানেও রামের আদর্শের প্রতি ভক্তির পশ্চাতে আছে বঙ্কিমের মোহিনীদেবীর প্রতি প্রেম ও তাহার অক্ষয় স্মৃতি। তিনি লিখিতেছেন :

> যে বাল্যকালে ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবনসুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী। যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্যের প্রতিমা, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ভালবাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জন করিতে পারে? আর যে ভালবাসে; পত্নীবিসর্জন তাহার পক্ষে যে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা; আবার যে রামের ন্যায় ভালবাসে, যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত, যাহার বাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহে, কি বনে সর্বত্রই, শৈশাববস্থায় এবং যৌবনাবস্থায়, উপাধানের কার্য করিয়াছে, তাহার কি কষ্ট, কি সর্বনাশ, কি জীবনসর্বস্ব ধ্বংসাধিক যন্ত্রণা।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় পত্নী, যিনি তাঁহার আজীবন ও আমরণ সহধর্মিণী হইলেন, তিনি রাজলক্ষ্মীদেবী। বিবাহের পর যদিও রাজলক্ষ্মীদেবী বহু অলংকারে ভূষিতা হইলেন, তথাপি মোহিনীদেবীর কানের দুল দুইটি ও সোনার কাঁটাটি পাইলেন না। বঙ্কিম তাহা সযত্নে নিজের কাছে রাখিলেন কিন্তু নবপরিণীতা রাজলক্ষ্মীদেবীর নিকট তাহা গোপন করিলেন না। শুধু এইমাত্র বলিলেন :

'এই দুইটি জিনিষ আমার কাছে রহিল। যেদিন তোমায় ভালবাসিব, সেই দিন দিব।'

এই সরল গাম্ভীর্য ও মাধুর্য বঙ্কিমের দাম্পত্য প্রণয়ের একটি বৈশিষ্ট্য এবং যখনই দাম্পত্য প্রণয় তাঁহার উপন্যাসের বিষয় হইয়াছে, তখনই ইহার প্রভাব প্রকট হইয়াছে। বঙ্কিম মোহিনীদেবীর কানের দুল ও সোনার কাঁটা রাজলক্ষ্মীদেবীকে বিবাহের চারি বৎসর পরে দিয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে এক

মধুর ঘটনা আছে। কন্যা শরৎকুমারীর জন্মের তিন মাস পরে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, নদীবক্ষে নৌকায় যাইতে যাইতে, বঙ্কিম স্বহস্তে রাজলক্ষ্মীদেবীকে এই অলঙ্কার পরাইয়া দেন।

এই রাজলক্ষ্মীদেবীর প্রভাব বঙ্কিমজীবনে এত গভীর ছিল যে তিনি বলিয়াছিলেন 'আমার জীবনী লিখিতে হইলে, ইঁহার জীবনী আগে লিখিতে হয়। আমার দোষ ত্রুটি সবই জানেন ইনি। ইনি না থাকিলে, আমি যে কি হইতাম তাহা বলিতে পারি না।'

রাজলক্ষ্মী দেবীর প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছে সূর্যমুখীর চিত্রে। যেখানে নগেন্দ্রনাথ বলিতেছেন 'সূর্যমুখী কি কেবল আমার স্ত্রী' এই উক্তি আমরা বঙ্কিমের নারী চরিত্র সমালোচনায় উদ্ধৃত করিয়াছি। বঙ্কিমের বিভিন্ন স্ত্রী-চরিত্রে রাজলক্ষ্মীর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বলা হইয়াছে যে 'বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসের যোল আনাই তাঁহার স্ত্রী'। নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় 'আমার জীবন' দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়াছেন :

'আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রগুণই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে। তিনিই তাঁর সূর্যমুখী।'

কিন্তু বিষবৃক্ষের সূর্যমুখীতেই যে একমাত্র রাজলক্ষ্মীর ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। বঙ্কিমের 'ইন্দিরা' উপাখ্যানের সুভাষিণী চরিত্রও রাজ-লক্ষ্মীর প্রতিবিম্ব বহন করে। রাজলক্ষ্মীদেবীর ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ তাঁহার কপাল ও গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িত। সুভাষিণীর বর্ণনায় বঙ্কিম রাজলক্ষ্মী-দেবীর মুখশ্রী ও কেশরাশির সৌন্দর্য অঙ্কিত করিয়াছেন। ইন্দিরা বলিতেছে :

এমন মুখ দেখি নাই। যেন পদ্মটি ফুটিয়া আছে। চারিদিক হইতে সাপের মতন কোঁকড়া চুলগুলি ফণা তুলিয়া যেন পদ্মটি ঘেরিয়া আছে। খুব বড় বড় চোখ, কখনও স্থির, কখনও হাসিতেছে, ঠোঁট দুখানি পাতলা, রাঙ্গা টুকটুকে, ফুলের পাপড়ির মতন উল্টানো, মুখখানি ছোট। সর্বশুদ্ধ যেন একটি ফুটন্ত ফুল। গড়ন পিটন কি রকম তাহা বলিতে পারিলাম না। আমগাছের যে ডাল কাঁচিয়া যায়, সে ডাল যেমন বাতাসে খেলে, তাহার শরীরে তেমনি কি একটা খেলিতে লাগিল—আমি কিছু ধরিতে পারিলাম না, তার চোখে কি যেন একটা মাখান ছিল, তাহাও আমাকে যাদু করিয়া ফেলিল।

ইহাই রাজলক্ষ্মী দেবীর রূপবর্ণনা। তাঁহার আনুগত্য, অক্লান্ত সেবা, নিষ্ঠা, প্রেম, পতিপরায়ণতা বঙ্কিমের জীবনে ও সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। সীতারামে বঙ্কিম বলিয়াছেন যে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসাই

দাম্পত্য সুখ নহে এবং তাহাদের একাভিসন্ধি সহৃদয়তাই যথার্থ দাম্পত্য সুখ। বঙ্কিম সেই একাভিসন্ধি সহৃদয়তা তাঁহার দাম্পত্য জীবনে রাজলক্ষ্মীদেবীর নিকট পাইয়াছিলেন। এই সীতারামেই বঙ্কিম তাঁহার দাম্পত্য জীবনের এক অধ্যায়ের ছবি আঁকিয়াছেন এই বলিয়া :

মাতার মতন স্নেহ, কন্যার মতন ভক্তি, দাসীর মতন সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন, কিন্তু সহধর্মিণী কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ভাল, কিন্তু সমরে সিংহ-বাহিনী কই? তাই নন্দার ভালবাসায়, সীতারামের পদে পদে শ্রীকে মনে পড়িত।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম দেহত্যাগ করেন এবং তাহার পরও ২৫ বৎসর কাল রাজলক্ষ্মীদেবী জীবিত ছিলেন এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তিরোধান হয়।

উভয় স্ত্রীর আদর্শ ও প্রেরণা বঙ্কিম-সাহিত্যের কাহিনী ও চরিত্রের পিছনে প্রধানত রসদ যোগাইয়াছে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অফুরন্ত উৎস হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও, তাঁহার উপন্যাসের ষোল আনাই তাঁহার স্ত্রীর ছায়া বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে। আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসে বহু বিচিত্র নারীচরিত্র দেখিয়াছি যাহা কোন প্রকারেই বঙ্কিমের দাম্পত্যজীবনের দ্বারা প্রভাবিত, অথবা তাহার মধ্যে তাঁহার স্ত্রীর কোন প্রতিচ্ছবি আছে বলা যাইতে পারে না। বীরাঙ্গনা বহুবলধারিণী নারীর যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি, সন্ন্যাসিনী নারীর যে চিত্র দেখিয়াছি, অরণ্য বিহারিণীর যে আলেখ্য আমরা দেখিয়াছি সে সকল আদর্শের উপর তাঁহার স্ত্রীর প্রভাব বা দাম্পত্যজীবনের কোন ছাপ আছে বলিয়া মনে করা ভুল হইবে। যেখানে আদর্শ গৃহিণী ও সহ-ধর্মিণীর চিত্র আছে শুধু সেই ক্ষেত্রে তাঁহার দাম্পত্যজীবনের প্রভাব পরিস্ফুট। নারীর কর্মকেন্দ্র সার্থক কোথায়, গৃহে না গৃহের বাহিরে—এই প্রশ্নের সমালোচনা বঙ্কিমের উপন্যাসে যেখানে করা হইয়াছে, সেখানেও তাঁহার দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন আছে। আর তাঁহার দাম্পত্য প্রণয়ের প্রেরণা আছে সেইখানে যেখানে বঙ্কিম আলোচনা করিয়াছেন, নারীর প্রেম কি, তাহার স্বরূপ কি, তাহার বিকাশ ও ব্যবহার কি এবং সে প্রণয়ে যখন মলিনতা বা ব্যভিচার আসে তাহার অভিসম্পাত বা শাস্তি কি।

৯

॥ বঙ্কিমের জীবন-দর্শন ॥

আত্মজীবনী লেখার মোহ অনেক লেখকের ভিতরই দেখা যায়। বঙ্কিম সে মোহ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছিলেন। এমন কি তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর তাঁহার জীবনী যেন কেহ না লেখেন। বঙ্কিম তাঁহার আত্মজীবনী লেখেন নাই। তবে সাহিত্যের অন্তরালে সাহিত্যিকের স্বীয় জীবনযাত্রার ধারা অন্তঃসলিলা প্রবাহিনীর মতো থাকিয়া যায়। বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও তাহার অন্যথা হয় নাই। তাঁহার উপন্যাসের কাহিনীতে, সাংসারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চিত্রে নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা লুক্কায়িত আছে। যথাস্থানে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং উদাহরণসহ দেখানো হইয়াছে।

যদিও বঙ্কিম তাঁহার 'আত্মজীবনী' লেখেন নাই তথাপি ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, যে সেই আত্মজীবনীর খানিকটা স্থান তাঁহার সাহিত্য লইয়াছে। তাঁহার অতুলনীয় কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচীরাম গুড়ের জীবন চরিত ইহার প্রমাণ। বঙ্কিমের জীবনদর্শন এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায়। বঙ্কিমের নিজের অভিমত এই যে কমলাকান্তের দপ্তর তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বঙ্কিম স্বয়ং কমলাকান্তের জবানীতে কথা বলিয়াছেন।

কমলাকান্তের দপ্তর প্রথম ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ ইং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে। পুস্তকের প্রথমেই এই তারিখ বা বৎসর পাওয়া যায়। ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) 'কমলাকান্ত' নামে ইহার পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, ইহা কেবল 'কমলাকান্তর দপ্তরের' পুনঃ সংস্করণ নহে। 'কমলাকান্তর দপ্তর' ব্যতীত আরও দুইটি নূতন রচনা যথা 'কমলাকান্তর পত্র' ও 'কমলাকান্তর জবানবন্দী' ইহাতে অন্তর্গত করা হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে দুইটি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। প্রথমটি বঙ্কিমসুহৃদ্ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'চন্দ্রালোক' আর দ্বিতীয়টি তাঁহার অন্য সুহৃদ্ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'স্ত্রীলোকের রূপ'। এই দুই সুহৃদ্ বঙ্কিমের রচনানীতি ও ভাবধারা এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম এই দুই প্রবন্ধকে কমলাকান্তর অন্তর্গত করিতে

কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। কমলাকান্তর তিনখানি মাত্র পত্র কমলাকান্তর নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। যদিও এই সংস্করণে 'বুড়া বয়সের কথা' পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি ইহা কমলাকান্তর পত্রের অন্তর্গত হইয়াছে। পরবর্তী সংস্করণে ১২৮৯ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে 'ঢেঁকী' নামক এক নূতন প্রবন্ধ সংযুক্ত হইয়াছে।

কমলাকান্তর নিজের স্বভাব কি, তাহার প্রকৃতি কি, তাহার মতবাদ ও দর্শন কি, তাহা বঙ্কিম নিজেকে অন্তরালে রাখিয়া এক অভিনব কলা কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। কমলাকান্ত নিজের সম্বন্ধে ও নিজের সীমা সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ ও সচেতন। পরের সমালোচনা করিতে সে যেমন নিপুণ, তেমনি সে আত্মসমালোচনায়ও নিরস্ত নহে। অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কমলাকান্ত যেন সমস্ত কিছু হইতে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অন্য সমস্ত মানুষ হইতে পৃথক। কমলাকান্ত যেমন সাধারণ জগতের মানুষের কৌতুকের বিষয়, সেও তেমনি সাধারণ মানুষকে লইয়া কৌতুক করিতে ব্যস্ত। এই কৌতুকপ্রিয়তা, বঙ্কিমের নিজের জীবনের ও চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

কমলাকান্ত প্রায় মুক্ত পুরুষ। সে কোন বন্ধন বা বিধিনিষেধের ভিতর আবদ্ধ নহে। জীবনে তাহার নিজের বন্ধন বলিতে দুইটি। একটি প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি আর দ্বিতীয়টি অহিফেন। প্রসন্ন গোয়ালিনীর চরিত্রে কাব্যরস ও গব্যরস, দুয়েরই সংমিশ্রন আছে। অহিফেন কমলাকান্তকে দিব্যদৃষ্টি দিয়াছে। কমলাকান্তর উদারদর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে মন্তব্যে অনেক সময় বঙ্কিমের নিজের অভিমত প্রকাশ পাইয়াছে।

কমলাকান্তর প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার নিকট বাহ্য সম্পদের কোন বিশেষ মূল্য নাই এবং তাহার দ্বারা যথার্থ সুখবৃদ্ধি হয় না। ইহা ভারতের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি ও বঙ্কিমের নিজের জীবন-দর্শন। কমলাকান্তর দ্বিতীয় অভিমত এই যে, সামাজিক জীবনে প্রচলিত জাতিবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক ও অর্থহীন। এমনকি স্ত্রী পুরুষের ভেদও সাধারণ মানদণ্ডে পরিমেয় নহে। স্ত্রী-চরিত্র পুরুষগুণের দ্বারা অলংকৃত বা বিকৃত হইতে পারে এবং পুরুষ-চরিত্রও সেইরূপ স্ত্রীসুলভ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে কমলাকান্ত জাগতিক নীতিশাস্ত্রের প্রচলিত মান উল্টাইয়া দিয়া নূতন মানদণ্ড ও প্রথার প্রচারে প্রবৃত্ত। এক্ষেত্রেও বঙ্কিমের

নিজের জীবনের দর্শন ও আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। কমলাকান্ত বলিতেছে, যে বিড়াল দুধ চুরি করে সে মূলতঃ 'সোস্যালিষ্ট' আর যে মানুষ বিড়ালকে তাড়াইয়া দুধ রক্ষা করে সে মূলতঃ 'ক্যাপিটেলিষ্ট'। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের উপর ইহা বঙ্কিমের একটি সুন্দর ব্যঙ্গ। প্রসন্ন গোয়ালিনীর বিখ্যাত উত্তর 'আমার দুধ, দই চেনো আর আমাকে চিনতে পার না?'—সমাজে শ্রেণীবিভাগের ও সমাজতত্ত্বের এক বিরাট প্রশ্ন। যাহাদের শ্রমে ও সেবায় সমাজের দেহ গঠন ও পরিপুষ্ট হয় সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণ যখন তাহার যথাযোগ্য স্বীকৃতির দান করিতে পরান্মুখ হন তখন আরম্ভ হয় সমাজের পতন ও বিশৃঙ্খলা। ঢেঁকীশালে কমলাকান্তর এই জ্ঞাননেত্র খুলিয়াছে এবং সেই কারণে সে বলিতেছে, এই সংসার যেন ঢেঁকীশালা। জমিদার, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, আইন-কারক, বিচারক, বাবু, লেখক কেহই কমলাকান্তর দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই, সকলেই ঢেঁকীশালে পিষিতেছে ও নিস্পিষ্ট হইতেছে। যে সমাজবাদ (Socialism) আগামী যুগে ধনী দরিদ্রের সংঘর্ষের রূপ লইয়া দেখা দিবে কমলাকান্ত তাহারই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া 'পতঙ্গ' ও 'বিড়াল' প্রবন্ধে তাহার মতবাদ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে। দেশের ও কালের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকিয়া, তাহা অতিক্রম করিয়া অনাগত ভবিষ্যতে এই সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে, দেশকে ও সমাজকে কিভাবে সচেতন ও আত্মস্থ হইতে হইবে, বঙ্কিম তাহাই কমলাকান্তর জবানীতে বলিতেছেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র, কমলাকান্তর 'বড়বাজার স্বপ্নদর্শনে' উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। কমলাকান্ত ইহার ভিতর কোন নীতি খুঁজিয়া পাইতেছে না। সকল জায়গায় সে দেখিতেছে এক সওদাগরী সভ্যতা ও মনোহারী বিপনীর আবহাওয়া। রমণীর রূপসজ্জা, পণ্ডিতের বিদ্যাদান, ইংরাজের রাজ্যশাসন, সাহেবের সংস্কৃত আলোচনা, চাকুরিজীবীর উমেদারী, সাহিত্যিকের সাহিত্য-চর্চা, যশোলোভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক আত্মবিজ্ঞাপন, বিচারকের শাসন ও দণ্ড, সকল বিষয়ের ভিতরেই কমলাকান্ত শুধু ক্রয়-বিক্রয়, লাভ-লোকসানের সম্বন্ধ দেখিতেছে। রূপসীর রূপবিক্রয়ের যে চিত্র, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া কমলাকান্ত বলিতেছে যে রমণী 'মৎস্যধর্মী'। তাহার নিজের ভাষায়—'দেখিলাম ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ, চুনোপুঁটি, কই, মাগুর, খরিদ্দারের জন্য লেজ আছরাইয়া ধড়ফড় করিতেছে।' রূপের বাজারের সহিত যদিও সাহিত্যের বাজারের সাদৃশ্য নাই তথাপি কমলাকান্তর নিকট দুই-ই বাজার বিশেষ। কমলাকান্তের চোখে 'মনুষ্য সকল ফল বিশেষ, মায়া বৃন্তে,

সংসার বৃক্ষে ঝুলিতেছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে।'

কমলাকান্ত নির্লিপ্ত কিন্তু নিরাকাঙ্ক্ষী নহে। এই দর্শন বঙ্কিমের জীবন দর্শন। যখন কমলাকান্ত বলিতেছে, 'তুমি কি তাহা আমি জানি না। তুমি আমার বাসনার বস্তু, জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, জীবনের আশা—মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখনও জানিতে পারিব না—জানিতে চাহিও না—কাম্যবস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?' ইহাতে বঙ্কিমের চিন্তাধারায় বৈষ্ণব দর্শনতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। তিনি লীলাবাদী। কাম্য, কাম, কামনা ও কামনাকারী যখন এক তখন আর দ্বৈত নাই, লীলা নাই—তখন জগত অন্তর্লীন। কমলাকান্ত দারিদ্র্য ও চির-কৌমার্যে কাতর হইয়া এই কথা বলে নাই। অর্থ ও কাম সাধারণ মানুষের ধ্যান। কিন্তু কমলাকান্ত অর্থ ও কাম জয় করিলেও মানুষের আর এক কাম্যের কথা বলিয়াছে, যাহা শাশ্বত কাম্য এবং যাহার অন্য নাম ধর্ম।' তবে ইহা মোক্ষ নহে। বঙ্কিমের জীবনদর্শনে এই ধর্ম, মোক্ষ বা নির্বান নাই। কমলাকান্তের মুখ দিয়া এইস্থলে বঙ্কিম ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এই ধর্মের ভিত্তি বিশ্ব-প্রীতি ও মানব-প্রীতি। বঙ্কিমের মানবধর্মের আদর্শ কমলাকান্ত ব্যাখ্যা করিতেছে এই বলিয়া—'মনুষ্যজাতির প্রতি যদি আমার প্রীতি থাকে তবে অন্য সুখ চাহি না।' ইহাই বঙ্কিমের মানবতা, সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রতি এই প্রীতি ও সৌহার্দ্য। এই ভাব ও আদর্শ তিনি ব্যক্ত করিতেছেন এমন এক সময়ে যখন পৃথিবীতে কোন উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারা বিদ্যমান ছিল না। সকল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া ছিল বঙ্কিমের এই সার্বভৌমিক মানবতার আদর্শ ও ধর্ম। ইহা চন্ডীদাসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

কমলাকান্তর জবানবন্দী হাস্য ও বিদ্রূপের আড়ালে ইংরাজশাসিত ফৌজদারী আদালতের ও অন্যান্য বিচারালয়ের বিচার পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করিয়াছে। কমলাকান্ত দেখিতেছে বিচারালয় বড়বাজারের একটি কসইখানা আর তাহার মধ্যে হাকিম হইল মনুষ্যরূপ কুষ্মান্ড। কমলাকান্ত কোন বিশেষ হাকিম বা উকিলকে লইয়া ব্যঙ্গ করে নাই এবং সাধারণভাবে আইনের প্রকৃত উপযোগিতার বিরুদ্ধে তাহার কোন আক্রোশ ছিল না। কমলাকান্তর প্রতিবাদ ছিল যুক্তিহীন কার্যপদ্ধতির উপর; মিথ্যা প্রতিজ্ঞা ও শপথ পাঠ, অর্থহীন প্রশ্নোত্তর এবং শূন্যগর্ভ আস্ফালন ইত্যাদি দ্বারা অকারণ জটিলতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে।

কমলাকান্ত তাই এই আইনযন্ত্র ও আইনের ব্যাপার হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিত। ভারতবর্ষের জটিল আইনপদ্ধতি ও আইনের শাসন যন্ত্রের নিষ্পেষণে যে কত লোক সর্বস্বান্ত হইয়াছে, এবং অকারণ হয়রান হইয়াছে তাহার সীমাসংখ্যা নাই। ইহার বিরুদ্ধেই কমলাকান্তর অভিযান।

কিন্তু এ অভিজ্ঞতা কাহার? কমলাকান্তর না বঙ্কিমের? বহুস্থলে বহুবার, বহুভাবে বঙ্কিম এই আইন পদ্ধতির ও যান্ত্রিকভাব আইন প্রয়োগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের হাকিম জীবনের অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতা কমলাকান্তের উক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট। কমলাকান্ত মামলার যে চূড়ান্ত মীমাংসা করিল তাহা আধুনিক সভ্যতার কঠোর সমালোচনা। যে সভ্যতা প্রবলের অধিকার স্বীকার করিয়া তাহার ভিত্তির উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে, যে দুর্বলকে অনাহারে ও দারিদ্রের ভিতরে রাখিয়া বাহিরে সৌষ্ঠব গঠন করিতে ব্যস্ত, যাহাতে সওদাগরী মানদণ্ডই একমাত্র ন্যায়দণ্ড, তাহা যদি নীতি বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে কমলাকান্তর বিচারে, ধেনুও তস্করভোগ্যা হইবে না কেন? অর্থাৎ কমলাকান্ত এক কথায় বলিতে চাহিয়াছে, যে আধুনিক অর্থনৈতিক শোষণভিত্তিক বণিকসভ্যতা 'তস্কর-সভ্যতার' নামান্তর মাত্র। যখন কমলাকান্ত বলিল 'গরু আমার' প্রসন্ন গোয়ালিনী স্বাভাবিক কারণেই তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল যে গরুটি তাহার সম্পত্তি এবং সেই এই গরুর দুধ বিক্রয় করিয়া থাকে। কমলাকান্ত তীব্রতর প্রতিবাদ করিয়া যে উক্তি করিয়াছিল তাহা বঙ্কিমসাহিত্যে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এবং তাহা একই সঙ্গে একদিকে যেমন ধনতান্ত্রিক শোষণনীতির উপর সূক্ষ্ম কশাঘাত তেমনি অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী অধিকার বোধের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ। সে উক্তি এই : 'গরু আমার নয় ত কার? আমি ওর দুধ খেয়েছি, দই খেয়েছি, ছানা খেয়েছি, মাখন খেয়েছি, ননী খেয়েছি। ও গরু আমার হ'ল না, আর তুই বেটী পালিস বলে কি তোর বাবার গরু হলো!' এইখানেই ইহার শেষ নহে। কমলাকান্ত আরও মন্তব্য করিয়াছে 'গরু তিনজনের। প্রথম বয়সে গুরু-মহাশয়ের, মধ্য বয়সে স্ত্রীজাতির ও শেষ বয়সে উত্তরাধীকারীর। দড়ি ছিঁড়িবার সময় কাহারও নহে।' কমলাকান্ত কাহার গরু, এই প্রশ্নের শেষ মীমাংসা করিল 'যে দুধ খায়, তার'। ইহাকে শুধু ব্যঙ্গ ও কৌতুক মনে করিলে ভুল হইবে কেননা ইহার ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে সাম্রাজ্যবাদীর ন্যায়-নীতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং ইহার বিচার ও আইন পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা।

কমলাকান্ত স্বদেশবাৎসল্য ও স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ। কমলা-

কান্ত জাতীয় জাগরণের মন্ত্রদাতা ঋষি। সেই ঋষি স্বয়ং বঙ্কিম, কমলাকান্ত এখানে তাহার সাহিত্য আশ্রমের নাম বলা যায়। সেই স্বদেশপ্রেম বিদেশীয় সংজ্ঞায় আমরা যাহাকে স্বদেশপ্রীতি বলি তাহা নহে। ইহাতে আছে ভারতের যুগযুগান্তরের সাধনার ধর্মাদর্শ। কমলাকান্তর দেশপ্রেম একাধারে দেশান্তর্গত ও দেশাতীত। তাই দেখি কমলাকান্ত দুঃখ করিতেছে সেই বঙ্গলক্ষ্মীর জন্য যিনি ১২০৩ বঙ্গাব্দ হইতে চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না এবং আবার দেখি কমলাকান্ত সেই বঙ্গলক্ষ্মীকে বঁধুরূপে আহবান করিতেছে এবং বৈষ্ণব বিরহের চেয়েও তীব্রতর বেদনা অনুভব করিতেছে। কমলাকান্ত এই তীব্র অনুভূতির প্রেরণায় বলিতেছে : ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষ্ণা—অন্য হৃদয়ের কামনা। মনুষ্য হৃদয় নিরন্তর হৃদয়ান্তরকে ডাকিতেছে 'এস এস বঁধু এস'। ক্ষুদ্র প্রবৃত্তি মহৎ প্রবৃত্তিকে ডাকিতেছে সেই একই মন্ত্রে। সৌরপিণ্ড ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে সেই একই মন্ত্রে ডাকিতেছে। অনু পরমাণুকে ডাকিতেছে সেই একই মন্ত্রে। সর্বকর্মের মন্ত্র এই আকর্ষণ 'এস এস বঁধু এস'। এইভাবে কমলাকান্ত সকল সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর অনুভূতির স্পর্শ আকর্ষণ করিতেছে।

হিন্দুর দুর্গোৎসব বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের পূর্ণ-প্রতীক। ইহা কমলাকান্তর, বাঙ্গালীর ও সমগ্র ভারতবাসীর উপাস্য। এই মূর্তিতে দেবী শুধু হিন্দুর দেবী নহেন, সকল বাঙ্গালীর ও সকল ভারতবাসীর জননী, তিনি বহুবলধারিণী, বিচিত্ররূপিণী, নবনবদর্পে দর্পিণী, তিনি স্বপ্নবিহবলা কিন্তু জাগ্রতা, তিনি রামপ্রসাদের কথায় 'অসুর দরদা, সমরে বরদা ও নিকটে প্রমদা।' তিনি কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অর্চনীয়া নহেন, তিনি দেশী বিদেশী সমগ্র মানবজাতিরই আরাধ্যা ও প্রণম্যা যদিও আকারে দেশকাল ভেদে বিভিন্ন হইতে পারেন। তবে তাঁহাকে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, হিংসাদ্বেষকে হত্যা করিতে হইবে—কারণ ইহার প্রথম দাবী ভ্রাতৃবাৎসল্য, যাহাতে নিহিত রহিয়াছে সকল মানবজাতির কল্যাণ মন্ত্র। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কমলাকান্তর প্রার্থনা বাংলাসাহিত্যের অমর-সৃষ্টি এবং জাতীয় জাগরণের মন্ত্রবিশেষ। কমলাকান্ত দেবীদুর্গার মধ্যে দেশ-জননীকে মূর্ত ও জীবন্ত দেখিয়াছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেনথাম প্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য 'ইউটিলিটেরিয়ান দর্শন-বাদে'র তীব্র সমালোচনা ও ব্যঙ্গ করিয়া কমলাকান্ত ইহাকে 'উদরদর্শন' বলিয়াছেন। এই কথার অর্থ করিয়াছেন : 'ইউ টিল, ইট আই'—অর্থাৎ 'তোমরা

খাট, চাষ কর, আমরা খাই'। ইহা ভাষ্য আকারে বর্ণিত হইয়াছে, কারণ কমলাকান্তর মতে ইহা ভারতবর্ষের ষড়দর্শনের অতিরিক্ত 'সপ্তম দর্শন শাস্ত্র'। এই সমালোচনা শুধু ব্যঙ্গ নহে। ইহার পশ্চাতে কমলাকান্তের একটি দর্শন আছে। 'ইউটিলিটি' বাদের অন্তরালে এক অখণ্ড অর্থনৈতিক ও বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি রহিয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে 'বাজার'-সভ্যতায় পরিণত করিয়াছে। ইহারই বিরুদ্ধে কমলাকান্তর এই প্রতিবাদ।

ভীষ্মদেব খোশনবীশ এই ছদ্মনামে বঙ্কিম তাঁহার সৃষ্ট ব্রাহ্মণ চরিত্র কমলাকান্ত শর্মার পরিচয় নিজেই দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কমলাকান্তকে অনেকে পাগল বলিত, কিন্তু সে লেখাপড়া না জানিত এমন নহে। তিনি বিদ্রূপ করিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, 'যে বিদ্যায় অর্থোপার্জন হয় না সে বিদ্যা কি বিদ্যা? আসল কথা এই, সাহেবসুবোর কাছে যাওয়া আসা চাই। কত বড় বড় মূর্খ কেবল নাম দস্তখত করিতে পারে—তাহারা তালুক মুলুক করিল—আমার মতে তাহারাই পণ্ডিত। আর কমলাকান্তর মতন বিদ্বান, যাহারা কেবল কতকগুলি বই পড়িয়াছে, তাহারা আমার মতে গণ্ডমূর্খ।' অনেকে মনে করেন বর্তমান সভ্যতা বা অর্ধসভ্যতার যুগে কমলাকান্তর বাক্যের সত্যতা আজও অম্লান এবং অক্ষুণ্ণ। এই অভিমতের উপর বঙ্কিমের নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছায়াপাত আছে। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিদ্যা সম্পর্কে কমলাকান্তর কৌতুকের অন্তরালে বহু সত্য আছে। এক জায়গায় কমলাকান্ত বলিতেছে 'বিদ্যা কি তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন লিখিতে বা পড়িতে শিক্ষার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ লিখিতে, সংবাদপত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না সে পত্রাদি লিখিবে কি প্রকারে। আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীর শাবক ডিম্বকোষ ভেদ করিবামাত্র জলে সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালীর স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখাপড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।' যাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আজ কর্ণধার তাঁহারা অবসরমত ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, কমলাকান্তর এই চিত্র বর্তমান সময়ে আরও অধিক সত্য হইয়া উঠিয়াছে। দেশে যে বিদ্যার সংকট ও শিক্ষার বিড়ম্বনা আগামী যুগে সমস্ত সমাজকে বিধ্বস্ত করিবে তাহারই ভবিষ্যৎ ছবি বঙ্কিম যেন কমলাকান্তর চক্ষু দিয়া দেখিতেছেন।

বঙ্কিম তাহার যুগের ও তাহার সমসাময়িক ভাবধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই নিশ্চেষ্ট ছিলেন না এবং তাহারই প্রতিচ্ছবি কমলাকান্তের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমলাকান্তের পরিচয় দিতে গিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন, 'অনেকদিন সে আমার বাড়ীতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। একদিন প্রাতে উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মতন গেরুয়াবস্ত্র পরিয়া কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় চলিয়া গেল আর তাহাকে পাইলাম না। সে এপর্যন্ত আর ফেরে নাই।' এই কমলাকান্তর একটি দপ্তর ছিল। কোন ছেঁড়া কাগজ পড়িতে পাইত না, দেখিলেই তাহাতে কি মাথামুণ্ড কমলাকান্ত লিখিত, কিন্তু বুঝিতে পারা যাইত না। কাগজগুলি একখানি পুরাতন বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা থাকিত। কমলাকান্ত যাইবার আগে তাহা বঙ্কিমকে দান করিয়া গিয়াছিল। কমলাকান্তর দপ্তর সেই কারণে বঙ্কিমেরই দপ্তর হিসাবে প্রচারিত। এই দপ্তরের লেখাগুলি বঙ্কিমের জীবনের ও মনের আলেখ্য।

কমলাকান্ত ধর্মবক্তা। কমলাকান্তর পত্রে 'বুড়া বয়সের কথা' বলিতে গিয়া সে বলিতেছে 'আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধক্যে—সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই। ইহার জন্য কোন কার্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে ঈশ্বর-ভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।' সহজভাষায়, সরল-কথায় কমলাকান্ত প্রকৃত ধর্ম কি তাহা বলিতেছে। ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বর ভক্তি বঙ্কিমের কমলাকান্তর ধর্মতত্ত্ব। ইহাতে দার্শনিক জটিলতা নাই এবং পাণ্ডিত্যের গুরুভার নাই।

কমলাকান্ত রাজনীতি লইয়া ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। সেই ব্যঙ্গের পশ্চাতে যে অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান আছে তাহা আধুনিক রাজনীতিকেও পরাস্ত করিতে পারে। যাঁহারা রাজনীতি লইয়া জীবন যাপন করেন কমলাকান্ত তাঁহাদের উদ্দেশে যে সতর্কবাণী দিয়াছিল তাহা পড়িলে আজিকার কথা ও আজিকার চিত্র চোখে ভাসিয়া উঠে। কমলাকান্ত বলিতেছে :

> ভাই পলিটিক্সওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদের হিতবাক্য বলিতেছি। পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহার পলিটিক্স নাই। জয় রাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো—ইহাই তাহাদের পলিটিক্স। তদভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এদেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

কমলাকান্তের এই রাজনীতি আজও সত্য। পরাধীন জাতির কোন রাজনীতি ছিল না কারণ তখন একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্তব্য ছিল পরাধীনতা হইতে মুক্তির উপায় উদ্ভাবন। রাষ্ট্রীয় স্বরাজ লাভের পরই কেবলমাত্র সুষ্ঠু বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল রাজনীতির প্রয়োজন দেখা দেয়। কমলাকান্ত তাই বলিতেছে যে পরাধীন জাতির রাজনীতি ভিক্ষাবৃত্তি ও পরানুকরণেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু অনেকে আজও একথা মনে করিতে পারেন যে, বর্তমান ভারত আজ যে জগতের সমস্ত দেশের নিকট ভিক্ষা করিতেছে এবং সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থে তাহার জাতি গঠনের প্রচেষ্টা করিতেছে তাহা কমলাকান্তর 'জয় রাধে ভিক্ষা দাও গো'—রাজনীতিরই রূপান্তর। বঙ্কিম কমলাকান্তের মাধ্যমে দেশবাসীকে ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে, প্রকৃত রাজনীতির প্রধান ও প্রথম সোপান হইল স্বাবলম্বন, ভিক্ষা নহে। ঋণ গ্রহণের দ্বারা বা পরানুকরণ দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধান কখনও সম্ভব হয় না। যে রাজনীতির ভিত্তি ভিক্ষা, কর্জ ও পরাণুকরণ তাহা আত্মোদ্ধারের পথ নহে, তাহা আত্মঘাতীর পথ এবং সে রাজনীতি পরিত্যাজ্য। কমলাকান্ত এই বলিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল রাজনীতির ব্যাখ্যা করিয়া আরও বলিয়াছে, 'দুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম, এক কুকুর জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক ও গর্শাকফ এই বৃষের জাতের পলিটিশ্যান। আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচীরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুকুরজাতীয় পলিটিশ্যান।' আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি কমলাকান্তের উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহার নিজের রাজনীতির ধারণা ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

যাঁহার জীবনে কোন মৌলিক চিন্তা আছে, তাঁহার আবার নানারূপ ব্যর্থতার বেদনাও আছে। যে-জীবনেই কোন বিরাট প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে, সেখানেই এই বেদনার ভার দেখা যায়। কমলাকান্তরও তাই ছিল। বঙ্কিমের জীবনে ও রচনায় সে বেদনার পরিচয় আছে। কমলাকান্ত তাহার 'বিদায়ের অধ্যায়ে' লিখিতেছে :

বিদায় লইলাম, আর লিখিব না। বনিল না, আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এই বাঁশী বাজে। বাঁশী বাজে বাজে করে, তবু বাজে না—বাঁশী ফাটিয়াছে। এখন সে বয়স নাই, সে রস নাই। আর সে বসন্ত নাই—এখন গলাভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

এই দেহ পচিয়া উঠিল—ছাইভস্ম মনের বাঁধনগুলা পচিবে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল, আগুন নেভে না কেন? পুকুর শুকাইয়া গেল, এ পঙ্কে পঙ্কজ ফোটে না কেন? ঝড় থামিয়াছে, দরিয়াতে তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে, এখনও গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে, এখনও আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে, যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে, পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে, যে-কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত। এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবামাত্র কাঁদিয়াছিলাম। কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

এই যে কমলাকান্তর প্রশ্ন তাহা মানবাত্মার যুগ-যুগান্তরের প্রশ্ন। ইহা বঙ্কিমের জীবন-দর্শন। এই প্রশ্ন কোনোপনিষদে ও প্রশ্নোপনিষদে ঋষিরা করিয়াছেন, বুদ্ধদেব করিয়াছেন, শঙ্কর করিয়াছেন, বঙ্কিম ও কমলাকান্ত করিয়াছেন। গতি থামিলেও গতিবোধ থাকে। ইহাই আবেশ ও মোহান্ধকার। রবীন্দ্রনাথও এই প্রশ্ন করিয়াছেন 'এখনও নিজেরি ছায়া রচিছে কত যে মায়া, এখনও কেন গো মিছে, ডাকিছে কেবলি পিছে।'

কমলাকান্তের ভাষা ও সাহিত্য বঙ্কিমের অন্যান্য রচনা হইতে ভিন্ন। এই ভাষার ও সাহিত্যের এক স্বচ্ছন্দতা ও সরলতা আছে যাহা একান্ত মর্মস্পর্শী। ভাষার আড়ম্বর নাই, কিন্তু এক তীক্ষ্ণতা আছে, এক একাগ্রতা আছে যাহা বোধের জড়তা, মনের আলস্য ও সাহিত্যের অগভীরতাকে সকল সময় অতিক্রম করিতেছে। বঙ্কিমের পূর্বে বা পরে এই রকম সাহিত্য রচনা আর হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

এখানে একটি সমালোচনার উত্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কমলাকান্তর জবানবন্দীর সহিত চার্লস্ ডিকেন্সের শ্যাম ওয়েলারের জবানবন্দীর কোন সাদৃশ্য আছে কিনা এবং বঙ্কিমের এই ভাব-চিত্রের জন্য ডিকেন্সের নিকট কোনরূপ ঋণী কিনা ইহা লইয়া অনেক তর্ক হইয়া গিয়াছে। সাদৃশ্য থাকিলেও ঋণ আছে বলিয়া মনে হয় না। জবানবন্দীর ভিতর দিয়া জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ বঙ্কিমের জীবনে নূতন নহে। তাঁহার কর্মক্ষেত্রে আদালতের জবানবন্দীর ভিতর দিয়া মনুষ্যচরিত্রের ও মানবমনের পরিচয় বহুভাবে তিনি পাইয়াছিলেন। সুতরাং কমলাকান্তের জবানবন্দী ও তাহার সাক্ষ্য কাহারও অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না, পরন্তু তাহা বঙ্কিমের দৈনন্দিন কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ছবি। শ্যাম ওয়েলার ও কমলাকান্তের ভিতর প্রভেদ ও বৈষম্য অনেক। কমলাকান্ত সমাজদর্শনে চতুর ও

অভিজ্ঞ এবং তাহার সমাজের সহিত পরিচয় ব্যাপক ও নিবিড়। শ্যাম ওয়েলারের সে দৃষ্টি ও সে পরিচয় নাই। ডিকেন্সের শ্যাম ওয়েলার চরিত্রে সাক্ষ্য মুখ্য বিষয় নহে, কিন্তু কমলাকান্তের সাক্ষ্য হাকিম, আদালত, বাদিনী প্রতি-বাদিনী ও আসামী সকলকে অভিভূত করিয়াছে। কিন্তু কমলাকান্ত কি রকম সাক্ষী। সে সাধারণ বিচারালয়ের সাক্ষী নহে। কমলাকান্ত গুরু আদর্শে সাক্ষী। সে 'সর্বধী সাক্ষীভূতম্' নির্লিপ্ত অথচ জ্ঞানী। কমলাকান্তের ভিতর আমরা একাধারে যে দিব্যদৃষ্টি, ধর্মদৃষ্টি, সমাজবোধ ও রাষ্ট্রচেতনা দেখি, তাহা ডিকেন্সের শ্যাম ওয়েলার চরিত্রে নাই। চরিত্র হিসাবে কমলাকান্ত শ্যাম ওয়েলার অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চস্তরের সৃষ্টি।

কোন সাহিত্য সমালোচক যেন এই কথা মনে না করেন যে, যেহেতু কমলাকান্ত অহিফেন সেবক, সেই কারণে কমলাকান্ত ডি-কুইন্সির 'ডন কুই-ক্সট' চরিত্রের মতন। ডন্ কুইক্সটের চরিত্রে অস্বাভাবিকতা আছে, যাহা কমলাকান্তে নাই। বিশেষ করিয়া কমলাকান্তের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য তাহার শাশ্বত আদর্শে নিষ্ঠা ও সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টি যাহা 'ডন্ কুইক্সটের' চরিত্রে নাই। কমলাকান্তের সকল রহস্যের ও কৌতুকের মধ্যে সব সময়ে একটা অপ্রকট গাম্ভীর্য আছে যাহা 'ডন কুইক্সটে' লক্ষ্য করা যায় না।

এইখানে বলা প্রয়োজন যে, সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, কমলাকান্ত সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের এক অভিনব ব্যবহার দেখাইছেন। বঙ্কিমের রচনায় ও সাহিত্যে সাধারণতঃ গাম্ভীর্য ও গভীরতা বেশী, হাস্যরস অপেক্ষাকৃত কম। যদিও তাঁহার উপন্যাসে বহু কৌতুকপূর্ণ, হাস্যোজ্জ্বল সরস চিত্র আছে এবং গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ প্রভৃতি কৌতুককর ও হাস্যময় চরিত্র আছে, তথাপি কমলাকান্তে যে ভাবে ও যেরূপে এই রসের ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা প্রকৃতই সাহিত্যে নূতন। বঙ্কিম-সাহিত্যে ব্যঙ্গ, কৌতুক, বা বিদ্রূপ কখনও তরল নহে, এবং কখনও নিরর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন নহে। বঙ্কিমের ব্যঙ্গে, কৌতুকে, বিদ্রূপে ও হাস্যরসে সকল সময়ে এক অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থ ও অনুক্ত বিরাট উদ্দেশ্য রহিয়াছে। শুধু 'ক্লাউন' (Clown) বা 'জেস্টার' (Jester) বা বিদূষক সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি তাঁহার সাহিত্যে কোন চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমকে সেক্সপীয়ার বা অন্যান্য সাহিত্যিক ও নাট্যকারের সহিত তুলনা করা ভুল হইবে। এইখানে আমাদের রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করা কর্তব্য। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'বঙ্কিম সর্ব-প্রথম হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনি প্রথম

দেখাইয়াছেন যে কেবলই প্রহসনের সীমার মধ্যে হাস্যরস বদ্ধ নহে। উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে।'

বঙ্কিমের জীবনদর্শন পর্যালোচনা করিতে গিয়া আমরা কমলাকান্তের নানা বিষয়ে মন্তব্য ও অভিমত দেখিলাম। এইবার আমরা আলোচনা করিব মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিত।

মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিত জাতীয় চরিত্রের এক অদ্ভুত আলেখ্য ও ইতিবৃত্ত। ইহা একাধারে ইতিহাস, উপন্যাস ও সমাজতত্ত্ব। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হাওড়ায় থাকিতে বঙ্কিম এই চরিত্র সৃষ্টি করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়।

মুচীরাম মূর্খ, অশিক্ষিত, ও চরিত্রহীন। কিন্তু এমনি অনুকুল পরিবেশ, যে তাহার সাহায্যে মুচীরাম সর্বত্রই জয়ী। যাহাকে সাধারণভাবে সামর্থ্য, সম্বল বা গুণ বলে তাহার কোনটাই মুচীরামের ছিল না। তবে তাহার ছিল বর্তমান সভ্যতার একমাত্র সম্পদ, স্বার্থসিদ্ধির পঙ্কিল নীতিহীনতা এবং চাটুকারীতা। তাহার প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি নাই কিন্তু সেই নির্বুদ্ধিতাই তাহার সমাজে সমাদরের এবং রাজসরকারে উচ্চপদলাভ ও খেতাবলাভের কারণ হইল। তদানীন্তন শাসনতন্ত্র ও সরকারী মহল সম্বন্ধে বঙ্কিমের ইহাই হইল অভিমত। মুচীরামের তুলনায় ভজগোবিন্দ অধিকতর কর্মতৎপর ও চতুর কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের এমনি ব্যবস্থা যে তাহার ভাগ্যে মুহুরীর নিম্ন কার্যের সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নতি করা সম্ভব হইল না। তবে তাহাকেই ব্যবহার করিয়া, মুচীরাম নিজে কর্মে অপটু ও অনুপযুক্ত হইয়াও, শীর্ষে আরোহণ করিলেন। অনেকে মনে করেন যে আজও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে এবং মুচীরাম গুড়ের যুগ এখনও অব্যাহত আছে। তাহার সংখ্যা বাড়িয়াছে বই কমে নাই এবং এখন পথে-ঘাটে, ঘরে-বাহিরে সর্বত্রই তাহার দেখা মিলিতে পারে।

পরাধীন জাতির নৈতিক অবনতির জাজ্বল্য উদাহরণ মুচীরাম গুড়। ক্রুরমতি রামচন্দ্র মুচীরামকে ধ্বংস করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিলেন, কারণ সেই রামচন্দ্রকে ব্যবহার করিয়া শ্রীমুচীরাম, 'অনারেবল মুচীরাম রায় হইয়া বাংলার কাউন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।' মুচীরাম তালুকে গেলেন টাকা আদায় করিতে, দান করিতে বা পরোপকার করিতে নহে তথাপি পরাধীন জাতির নৈতিক অধোগতি, ইংরাজের নির্বোধ শাসননীতি আর সর্বোপরি মীনওয়েল সাহেবের বাংলা ভাষার নিদারুণ অজ্ঞতার ফলে বাংলার কৃষকের কথা তিনি এমনি উল্টা বুঝিলেন যে, এই

সব ঘটনা একত্রে মিলিয়া একটি প্রচন্ড মিথ্যা সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া গেল। যথা—মুচীরাম নাকি দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতের জন্য সাহায্য করিতে ওষ্ঠাগত-প্রাণ। তাহার উপাধিলাভ হইল। তাহার উন্নতি হইল। রাষ্ট্র তাহাকে তাহার অলীক বদান্যতার জন্য রাষ্ট্রবন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মূর্খতা, অপমান-সহিষ্ণুতা ও খোসামুদির অসাধারণ নৈপুণ্যে মুচীরাম দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের অন্যতম গণ্যমান্য লোক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

মুচীরাম চরিত্রে বঙ্কিম তাঁহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার একটি করুণ দিক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্রীয় অবিচারে, বিশেষ করিয়া বিদেশীয় ইংরাজ-শাসনে, যাহারা মূর্খ, যাহারা গোলামী ও সেলামীতে সর্বপ্রকার কুণ্ঠা-হীন ও সদাপ্রস্তুত, যাহাদের কোন আত্মসম্মানবোধ নাই, তাহারাই দেশের নায়ক হইয়া দাঁড়ায়। বঙ্কিম আর এক ক্ষেত্রে বলিতেছেন যে, 'যাহারা বানর-শ্রেণীর মানুষ, পরতন্ত্ররাজ্যে তাহাদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' ইংরাজ রাজ-কর্মচারীগণকে মুচীরামের পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখাইয়া, বঙ্কিম ইংরাজ শাসনের ও রাজত্বের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন।

মুচীরাম চরিত্রের ও জীবনের ভিতর দিয়া, পরজাতি প্রাধান্যের যে কত কুফল বঙ্কিম তাঁহার নিজের জীবনে ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা অভিব্যক্ত করিয়াছেন। কর্মক্ষেত্রে বঙ্কিম বহুভাবে প্রতিহত হইয়াছিলেন ও মনব্যথা পাইয়াছিলেন। বহু অন্যায় তাঁহার মতন লোককেও সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় মনীষী, ন্যায়নিষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিকেও চাকুরিক্ষেত্রে নির্বোধের ও মূর্খের উন্নতি ও প্রাধান্য এবং কাপুরুষ, কুচক্রী ও নির্গুণের সমাদর লাভের নীরব দর্শক হইতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় চাকুরী করার এই মর্মপীড়া বঙ্কিম অন্তরে অন্তরে বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বঙ্কিম কলিকাতা গেজেটে দেখিলেন কতিপয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদোন্নতি ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু সেই তালিকায় তাঁহার নিজের নাম নাই। ইহাতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। ডায়মণ্ড হারবারে ও বারুইপুরে তাঁহার কার্য সকলের প্রশংসার্হ হইয়াছিল। তাই গেজেটে নাম না দেখিয়া বঙ্কিম যেমন বিস্মিত তেমনি মর্মাহত হইলেন। এই অবহেলা ও অন্যায় তিনি নীরবে সহ্য না করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন, কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে যাহা হয়, তাহাই হইল; সেই প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। চাকুরীর প্রতি বঙ্কিমের এই প্রথম বিরাগ জন্মিল। এই চাকুরীর জন্য সমগ্র সাধনা, জীবন, উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও তাহার এই প্রতিদান!

আর যাহারা অলস, কর্মে অপটু, তোষামোদকারী তাহাদের কারণে অকারণে পদোন্নতি। তিনি মনে মনে অনুভব করিলেন এবং বলিলেন যে, চাকুরী তাঁহার জীবনের অভিশাপ। বঙ্কিম চাকুরী ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। বঙ্কিমের একদল শত্রুর সৃষ্টি হইল যাহারা বঙ্কিমের যশে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া অকারণে বঙ্কিমের নিন্দা করিয়া সাহেবদের কান ভারী করিতে লাগিলেন। ফলে, যে সকল উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীবর্গ বঙ্কিমের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিরূপ সুর ধরিলেন। এই নিন্দুক শত্রুদের লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিম তাঁহার 'দীনবন্ধু জীবন' শীর্ষক সমালোচনায় এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

যেখানে যশ সেইখানেই নিন্দা, সংসারে ইহাই নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না। যিনি বহুগুণবিশিষ্ট, তাহার দোষগুলি গুণসান্নিধ্যহেতু কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, সুতরাং দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির শত্রু হয়। তৃতীয়, কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্যের গতিতে অনেক শত্রু হয়। শত্রুগণ অন্যপ্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইয়া নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাব এই যে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে। সামান্য ব্যক্তির নিন্দা অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম। অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দুকই অনেক—বিশেষ করে বঙ্গদেশে।

বাঙ্গালী চরিত্রের এই পরশ্রীকাতরতা বঙ্কিম নিজের জীবনে দেখিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য মানসিক অশান্তি ভোগ করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমকে চক্রান্ত করিয়া জাজপুরে বদলী করা হয়। এই সম্বন্ধে বঙ্কিম তাঁহার সুহৃদ ঢাকার °কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে ২৯শে পৌষ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত মর্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন :

এখন জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী, স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ, আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব আর আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন। এই ঈর্ষাপরায়ণ, আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল 'বন্দে উদরম্।'

বাঙালী চরিত্রের এই দোষ, এই মন্থরার দল এবং তাহাদের ঈর্ষাপরায়ণতা বঙ্কিমহৃদয়ে কতখানি দুঃখ ও আঘাত দিয়াছিল তাহা এই কতিপয় ছত্রে সুস্পষ্ট। বাঙালী চরিত্রের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ক্রমে এত তীব্র হইয়াছিল যে বঙ্কিম অকৃত্রিম ভাবেই লিখিয়াছিলেন যে, 'বাঙালীদিগের চরিত্র অতি মন্দ। তাহারা অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, বিনা কারণে মিথ্যাকথা বলে।'

এই অভিজ্ঞতার ফলেই, বাঙালী চরিত্রের অবনতি তিনি মুচীরাম গুড়ের জীবন চরিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। বঙ্কিমের স্বীয় জীবনে ইহা এক মর্মান্তিক অধ্যায়। বঙ্কিমের ন্যায় ব্যক্তিকে সারা জীবন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটগিরি করিতে হইয়াছিল এবং অনুপযুক্ত বিদেশী ও স্বদেশী উপরওয়ালার নীচে কর্ম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পদোন্নতিও বন্ধ করা হইয়াছিল। তাহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল মুচীরামের জীবন কথা পড়িলে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে :

> এই মুচীরাম প্রথম 'দুই তিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি করিল; তাহার পর কালেক্টরীর পেস্কারী খালি হইল, বেতন পঞ্চাশ টাকা, আর উপরি উপার্জনের ত' কথাই নাই। মুচীরাম ভাবিল কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব। সেই দরখাস্তে গোটা কুড়িক 'মাই লর্ড' আর 'ইওর লর্ডসিপ' ছিল। তাহাতেই কার্য হাসিল হইল।

মুচীরামের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্কিম তাহার পঞ্চগুণের কথা বলিয়াছেন। এই বিশ্লেষণ জাতীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ। বঙ্কিম লিখিতেছেন :

> প্রথম, মুচীরাম গণ্ডমূর্খ, কাজে কাজেই সাহেবদের প্রিয়। দ্বিতীয়, মুচীরাম অতি সামান্য ইংরাজী জানিত। ইহাতে সাহেবরা বলিতেন যে, মুচীরাম ইংরাজী জানে কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমান নাই। তৃতীয়, মুচীরাম নির্বিরোধী লোক, সাহেবরা অপমান করিলেও সম্মানবোধ করিত। চতুর্থ, খোসামোদে মুচীরাম অদ্বিতীয়। পঞ্চম, মুচীরাম ডেপুটির হাতে প্রায় সপ্তম-পঞ্চমের কাজ হইত। তিনি চোখ বুঁজিয়া ডিক্রী দিতেন, বিচারের প্রয়োজন হইত না। সুতরাং 'ফাইল' আর বাকী থাকিত না। সাহেবরা ধন্য ধন্য করিতেন। এই পঞ্চগুণের বলে মুচীরাম দিক্‌পাল হইলেন, নেতা হইলেন, জমিদার হইলেন, রায়-বাহাদুর হইলেন, রাজা হইলেন, বেঙ্গল কাউন্সিলের অনারেবল্ মেম্বর হইলেন।

জীবনে বঙ্কিম এই চিত্র দেখিয়াছেন নিজের কর্মক্ষেত্রে। এই সকল কারণে বঙ্কিম শেষকালে চাকুরীতে এতই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে এক সময়ে চাকুরী ছাড়িয়া ওকালতি করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে

চাকুরী-জীবনে উপরওয়ালারা অধিকাংশই খোসামুদের পক্ষপাতী, কর্মকুশলতা বা জ্ঞানের কোন পুরস্কার নাই, কিন্তু চাটুকারিতার পুরস্কার আছে। এমনকি ওকালতি করিবার জন্য বঙ্কিম অনেকের পরামর্শও গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে হাইকোর্টে দ্বারকানাথ মিত্র (পরে বিচারপতি), নীলকুটীর কৃষ্ণ-কিশোর ঘোষ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, কালীমোহন দাস, চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীনাথ দাস, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবীগণ ছিলেন এবং বঙ্কিম পরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। তবে শেষকালে ভূদেব-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত বঙ্কিমের এই বিষয় লইয়া দীর্ঘ ও গভীর আলোচনা হয় এবং তিনি বঙ্কিমকে চাকুরী ছাড়িয়া ওকালতি করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্কিম ওকালতি করিলে বাংলাদেশ ও বাংলা-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ভূদেববাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া বঙ্কিম ব্যবহার-জীবীর বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই।

মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিতের ভাষা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা ব্যঙ্গ ও কৌতুকের সীমা অতিক্রম করিয়া বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপরসের ব্যবহারের নূতন ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে তীব্র বিদ্রূপ ও শ্লেষ, বিশেষ করিয়া শাসন ও কর্মতন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিতের ন্যায় ব্যঙ্গরচনা বাংলা-সাহিত্যে প্রথম সমুজ্জ্বল ও সার্থক উদাহরণ, যাহা পরবর্তী সাহিত্যের পথপ্রদর্শক হইয়াছে। মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিতের ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা বলিষ্ঠ অথচ সরল, কোথাও আড়ষ্ট ভাব নাই; তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা ও তেজস্বিতা ইহার প্রতি ছত্রে। ইহাতে ভাষার সেই আড়ম্বর বা সমারোহ নাই, যাহার কিছু কিছু কমলাকান্তর দপ্তরে মধ্যে মধ্যে আছে। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ কথ্য ভাষায় বিবরণ হিসাবে লেখা, কিন্তু কোন স্থলে পাঠকের আগ্রহ ক্ষুণ্ণ হয় না এমনি তীব্র গতিবেগ ও ভাবের সুতীক্ষ্ণ অনুভূতি। ইহা নিরাভরণ ভাষা, কোন পরিচ্ছদ ধারণ না করিয়া মর্মের কথা—প্রচ্ছন্নভাবে বঙ্কিমের জীবনের কথা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা বলিয়া গিয়াছে।

কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিত হইতে ইহা দেখা যায়, যেমন সাহিত্যে তেমনি জীবনদর্শনে, তাঁহার উদ্দেশ্য ও সাধনার দুইটি ধারা, প্রথম, স্বদেশ ও সমাজের লুপ্ত চৈতন্য উদ্ধার এবং দ্বিতীয়, পূর্ণ মানবতার বিকাশ এবং এই দুই উদ্দেশ্য সাধনে যে সকল বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বাধা তাহার উপর তীব্র কশাঘাত।

১০

॥ বঙ্কিম-সাহিত্যে বিদ্রূপ ॥

বঙ্কিমের স্বভাব গম্ভীর হইলেও তিনি ছিলেন আজন্ম রসিক। যিনি তাঁহার 'কথকঠাকুরের নাক বড় পেটুক' নামক উপাখ্যানটি পড়িয়া দেখিয়াছেন তিনি এই কথার মর্ম বুঝিবেন। বঙ্কিম-সাহিত্যে বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও কৌতুক-রসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

রসিকতা বাঙালী জাতির চরিত্রের অলঙ্কার। বাঙালী মনে প্রাণে রসিক। গৃহে, সংসারে, সমাজে, গ্রামে, সহরে, প্রান্তরে, চন্ডীমন্ডপে, কৃষিক্ষেত্রে, শিল্পে—সর্বত্র বাঙালী রসিক। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, দারিদ্র্যে, সৌভাগ্যে, বিপদে বাঙালী কখনও তাহার রসিকতা হারায় নাই। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই রসিকতার বহু বিকাশ দেখা যায় সেইকথা বলিয়াছি। সে রহস্য বা রসিকতা শুধু মানুষের অক্ষমতা, অসহায়তা বা অজ্ঞানতা লইয়া নহে, তাহাতে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে, বিদ্রূপের কঠোরতা আছে, ক্ষমার মধুরতা আছে, প্রতিবাদের তীব্রতা আছে এবং তিনি নিজেকে লইয়াও কৌতুক করিয়াছেন।

কমলাকান্তের দপ্তরে ও মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিতে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ উভয়ই আছে। যখন আমরা তাহা আলোচনা করিয়াছি তখন বঙ্কিমের ইংরাজ-স্তোত্রে, কমলাকান্তর আক্ষেপে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে এই বিদ্রূপের উদাহরণ লক্ষ্য করিয়াছি। বঙ্কিমের বিদ্রূপ সম্বন্ধে একটি কথা স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। গোপালভাঁড়ের রসিকতা বা ঈশ্বরগুপ্তের সামাজিক ব্যঙ্গ কবিতা যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমের রসিকতা সে অর্থে লঘু নহে। বঙ্কিমের ব্যঙ্গের ও বিদ্রূপের পশ্চাতে সর্বদাই জাতির অভিমান ও লাঞ্ছনার জ্বালা, ধর্মের ও সমাজের কুসংস্কার এবং শাসনতন্ত্রের ব্যভিচার ইত্যাদির প্রতি শ্লেষ বর্তমান। সাধারণ সাহিত্যে, রচনায় ও উপন্যাসে বঙ্কিম যে-কথা সোজাসুজি বলিতে পারেন নাই, বিদ্রূপের ও ব্যঙ্গের আবরণে তাঁহার লেখনি সেই স্বাধীনতার পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছে।

কমলাকান্তের দপ্তর ও মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিত বঙ্কিমের পরিণত বিদ্রূপাত্মক রচনার নিদর্শন। রসিকতার ছলে লিখিবার সহজ উপায় বঙ্কিম সর্বপ্রথমে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহার 'লোকরহস্যে'। 'ইংরাজস্তোত্র', 'গর্দভ'

ও 'বাবু'—এই তিনটি বিশিষ্ট প্রবন্ধে বাঙগালীর বাবুগিরি, গোলামীর প্রবৃত্তি, ইংরাজের পদলেহন, নৈতিক অবনতি এবং মনুষ্য সমাজের নির্বুদ্ধিতার উপর বঙ্কিম বিদ্রূপ করিয়াছেন। সাধারণ বিষয় লইয়া রসিকতা করা এবং সেই রসিকতার ভিতর এক আদর্শের ছবি তুলিয়া ধরা বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য। ইহা বঙ্কিমের উপন্যাসেও চিত্রিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিম লাঠির মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। সেই লাঠির বর্ণনায় ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও আদর্শের সমন্বয় হইয়াছে। সেই আদর্শ হইল আত্মবিশ্বাস ও বাহুবল। শক্তিহীনতার উপর বিদ্রূপ ও কাপুরুষতার ব্যঙ্গ করিয়া 'বাংলার কলঙ্কে'ও লাঠির মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন :

'হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে। কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে, তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙিগয়া ফেলিয়াছ; কত ঢাল, খাঁড়া খন্ড খন্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! একদিন বন্দুক আর সংগীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাংগা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাংলার আব্রু-পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে।'

ইহার ভিতর রসিকতা আছে, ব্যঙ্গ আছে, ইতিহাস আছে ও আদর্শ বাহুবল ও বীর্য আছে। যখন ইংরাজ শাসনে পরাধীন জাতিকে অস্ত্রশস্ত্র ও বন্দুক ব্যবহার করিতে দেওয়া হইত না তখন গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে লাঠিখেলা শিক্ষা দেওয়া হইত এবং সেই যুগ ছিল বিখ্যাত লাঠিয়ালদের যুগ। লাঠি ছিল তখন পরাধীন জাতির একমাত্র অস্ত্র। তাহার নৈপুণ্যে ও চাতুর্যে জাতি নিজেকে বহু অত্যাচার ও অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহাতে শ্লেষ নাই, আক্ষেপ আছে কিন্তু ভাষা সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দগতি, আড়ম্টতাহীন ও সাবলীল।

অন্য প্রকারের বিদ্রূপ বঙ্কিমের রচিত 'বাবু' প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। ফাল্গুন মাসে ১২৭৯ বঙ্গাব্দের 'প্রচারে' বঙ্কিম 'বাবু' কাহাকে বলে তাহার বর্ণনা করিতেছেন :

যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত, কলহে সহস্র তিনি বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য তিনি বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে তিনিই

বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ বিদেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' তিনিই বাবু। যিনি মিশনারীর নিকট খ্রীষ্টান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তেলে ঘৃণা, আহার কালে আপন অঙ্গুলিতে ঘৃণা এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারীতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপর, নিঃসন্দেহে তিনি বাবু। হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বুল চর্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

বঙ্কিমের এই বিদ্রূপে, জাতীয় চরিত্রে এইরূপ 'বাবু'-য়ানার প্রতি তীব্র শ্লেষ আছে, তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ আছে, তদানীন্তন সমাজের চিত্র আছে, কাপুরুষতার প্রতি ঘৃণা আছে এবং ভারতের উদ্ধারের জন্য তাহার আমূল পরিবর্তনের নির্দেশ আছে। ইহা প্রহারোপম ভাষা, কশাঘাতের ভাষা, এ বিদ্রূপে কোন আক্ষেপ নাই; এ বিদ্রূপের ভাষাও সহজ যদিও পূর্বোক্ত উদাহরণ অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর। বাংলা সাহিত্যকে এইভাবে বিদ্রূপের বাহন করার পথ বঙ্কিমই প্রথম দেখাইয়াছেন। ইহার আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে বঙ্কিম যখন ভাষা গম্ভীর ও শুদ্ধ করিয়াছেন তখনও তাঁহার বিদ্রূপের তীব্রতা ম্লান হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিম-সাহিত্যে শুদ্ধ ভাষায় তীক্ষ্ণ ও তীব্র বিদ্রূপের একটি উদাহরণ দিব। ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম 'গর্দভ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। ইহার বিষয়—কিভাবে দেশ ও সমাজ গর্দভে পরিণত হইতেছে। গর্দভ জীবকে উপলক্ষ্য করিয়া মানুষ ও তাহার সমাজ কিভাবে গর্দভে পরিণত হইতেছে, কিভাবে সর্বত্র গর্দভের আবির্ভাব ও পূজা হইতেছে তাহারই এক আশ্চর্য বিবরণ। এক অতুলনীয় রূপকের মাধ্যমে বঙ্কিম দেখাইতেছেন, কিভাবে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই গর্দভের প্রাদুর্ভাব ও সমাদর হইতেছে। বঙ্কিম বলিতেছেন :

হে মহাভাগ! আপনার পূজা করিব ইচ্ছা হইয়াছে, কেননা আপনাকেই সর্বত্র দেখিতে পাই। অতএব হে বিশ্বব্যাপিন্! আমার পূজা গ্রহণ করুন।

হে গর্দভ! কে বলে তোমার পদগুলি ক্ষুদ্র। যেখানে সেখানে তোমারই বড় পদ

দেখিয়া থাকি। তুমি উচ্চাসনে বসিয়া স্তাবকগণ পরিবৃত হইয়া, মোটা মোটা ঘাসের আঁটি খাইয়া থাক। লোকে তোমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের প্রশংসা করে।

তুমিই বিচারাসনে উপবেশন করিয়া মহাকর্ণদ্বয় ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতেছ। তোমার অগাধ গহবরে দেখিতে পাই উকীল নামক কবিগণ নানাবিধ কাব্যরস ঢালিয়া দিতেছে। তখন তুমি শ্রবণ তৃপ্তি সুখে অভিভূত হইয়া নিদ্রা গিয়া থাক। হে বৃহন্মুণ্ড! তখন সেই কাব্যরসে আদ্রীভূত হইয়া, তুমি দয়াময় হইয়া, অসীম দয়ার প্রভাবে, রামের সর্বস্ব শ্যামকে দাও, শ্যামের সর্বস্ব কানাইকে দাও। তোমার দয়ার পার নাই।

হে রজকগৃহভূষণ! কখনও দেখিয়াছি তুমি লাঙ্গুল সঙ্গোপন পূর্বক কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া সরস্বতীমণ্ডপমধ্যে বালকগণকে গর্দভলোক প্রাপ্তির উপায় বলিয়া দিতেছ। বালকেরা গর্দভলোকে প্রবেশ করিলে 'প্রবেশিকায়' উত্তীর্ণ হইল বলিয়া মাথা তুলিয়া গর্জন করিতে থাকে।

হে প্রকাণ্ডোদর। তুমিই চতুষ্পাঠীমধ্যে কুশাসনে উপবেশন করিয়া তৈলনিষিক্ত ললাট-প্রান্তরে চন্দনের নদী অঙ্কিত করিয়া তুলটহস্তে শোভা পাও। তোমার কৃত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা ধন্য ধন্য করিতেছি। অতএব হে মহাপশো! আমার প্রদত্ত কোমল তৃণাঙ্কুর ভোজন কর।

তুমিই গায়ক। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরণ করিয়া দীর্ঘশ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক কাশি অভ্যাস করিয়া তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

তুমিই ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলে সন্দেহ নাই, নহিলে নবমীতে লাউ খাইতে নাই কেন? আলঙ্কারিক সাহিত্যদর্পনাদি তোমারই সৃষ্টি। কিঞ্চিৎ ঘাস খাও।

তুমিই নানারূপে নানা দেশে আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যাবলে, ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। হে লোমশাবতার! আমার সমাহৃত কোমল নবীন তৃণাঙ্কুরসকল ভক্ষণ কর, আমি আহ্লাদিত হইব।

হে মহাপৃষ্ঠ। তুমি কখন রাজ্যভার বহ, কখনও পুস্তকের ভার বহ, কখনও ধোপার গাঁটরা বহ। হে লোমশ! কোন্‌টি গুরুভার আমায় বলিয়া দাও। তুমি কখন ঘাস খাও, কখন ঠেঙ্গা খাও, কখনও গ্রন্থকারের মাথা খাও। হে লোমশ! কোনটি সুভক্ষ্য অর্বাচীনকে বলিয়া দাও।

বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই, এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নাই এজন্য সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই—এজন্য তুমি বিদ্বান, এবং মোট না বহিলে তুমি খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী। আমি তোমার যশ গান করিতেছি, ঘাস খাইয়া সুখী কর।

বঙ্কিমের এই বিদ্রূপে বহু জিনিস লক্ষ্য করিবার আছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে, কি বিদ্যায়, কি শিক্ষায়, কি বিচারালয়ে, কি রাজনীতিতে, কি ধর্মে, কি সংগীতে, কি সমালোচনায়, কিভাবে নির্বোধের ও অর্বাচীনের প্রতিষ্ঠা হয়, ও তাহার পূজা ও সমাদর হয়, তাহা বঙ্কিমের এই চিত্রে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষার কৌশল দেখিবার মতো। ভাষা শুদ্ধ কিন্তু সে শুদ্ধতায় ভাষা তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা হারায় নাই। এইখানে বিদ্রূপ করিতে গিয়া বঙ্কিম রূপকের সাহায্য লইয়াছেন, সোজাসুজি সমালোচনা করেন নাই। কিন্তু রূপকের যাহা দোষ তাহা নাই, কেননা রূপককে এমনভাবে বঙ্কিম ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহার অর্থ বুঝিতে পাঠকের বুদ্ধির ও শ্রমের কোন প্রয়োজন হয় না, অথচ ইহাতে বিষয়বস্তুর চিত্রটি আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। পৃথিবীর সাহিত্যে এইপ্রকার বিদ্রূপ-সাহিত্য বিরল। এমন কি, ভল্টেয়ারের বিদ্রূপও বঙ্কিমের এই বিদ্রূপের নিকট পরাজিত। ভল্টেয়ারের বিদ্রূপে মানুষের প্রতি এবং তাহার প্রকৃতির উপর একটা অশ্রদ্ধা ও আস্থাহীনতা ছিল, কিন্তু বঙ্কিমের বিদ্রূপে ছিল বিপুল আত্মবিশ্বাস ও মানুষের প্রকৃতির উপর একটা চরম আস্থা। মনুষ্য প্রকৃতি যতই না অধম হউক, তাহার ব্যবহার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম যতই অবনতিগ্রস্ত হউক, বঙ্কিমের বিদ্রূপে ছিল একটা আশার বাণী : কালে সাধনার দ্বারা মানুষ ও তাহার প্রতিষ্ঠান আবার উন্নত হইবে। ভল্টেয়ার যেরূপ নিষ্করুণ ছিলেন, বঙ্কিম তদ্রূপ নহেন।

কমলাকান্তর দপ্তর ও মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিতে বঙ্কিমের যে বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও রসিকতার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় তাহা 'লোকরহস্য' হইতে ভিন্ন ও পৃথক। লোকরহস্য কোন একটি বিষয় লইয়া লিখিত হয় নাই। ইহা কতিপয় পৃথক প্রবন্ধের সমষ্টি। বিভিন্ন বিষয় বলিয়া ইহাতে বঙ্কিম লঘু কৌতুক, তীব্র ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের এক অভিনব সমন্বয় ঘটাইয়াছেন। কমলাকান্তর দপ্তরে ও মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিতে বঙ্কিম স্বয়ং বক্তা; যদিও ছদ্মনামে, এই বক্তব্য আসলে বঙ্কিমের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। সুতরাং যাহাকে আমরা সাধারণভাবে কৌতুক বা রসিকতা বলি তাহার সুযোগ সেখানে কম। কিন্তু 'লোকরহস্যে' এ বাধা নাই। বিদেশী মূর্খ ও অজ্ঞকে বিজ্ঞ সাজাইয়া তাহার দৃষ্টিতে ভারতীয় সাহিত্য, সমাজ ও সভ্যতার আলোচনা বঙ্কিম করিয়াছেন। প্রতি বিষয়ে এইরূপ মূর্খ কি বিকৃতভাবে দেখে এবং তাহার বুদ্ধি ও কল্পনা কিরূপ মিথ্যার মায়াজাল সৃষ্টি করিতে পারে তাহার অপূর্ব বর্ণনা এই লোকরহস্যে দেখা যায়। যেমন, ইউরোপীয় মূর্খ সাহিত্যের দিক

দিয়া রামায়ণকে নিম্নশ্রেণীর কাব্যমাত্র মনে করেন। আবার তাঁহারাই বলেন যে, 'বাঙালীরা হাইকোর্টকে হাইকোর্ট বলে, গবর্নমেণ্টকে গবর্নমেণ্ট বলে, ডিক্রীকে ডিক্রী বলে, সেইজন্য নাকি ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বাংলাভাষা ইংরাজীভাষার শাখামাত্র। কোন 'স্পেশালে'র পত্র ইহার নানারকম উদাহরণ দিয়াছে। বলা হইয়াছে, তাহারা হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন জাতির বিভীষিকা দেখে, এবং জাতি বলিতে তাহারা বলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বৈষ্ণব ও কুলীন ইত্যাদি। বঙ্কিমের এই সাহিত্যে বিদ্রূপের চেয়ে ব্যঙ্গ অধিক।

কৌতুক ও ব্যঙ্গ প্রধান ও মুখ্য এবং বিদ্রূপ গৌণ—ইহার উদাহরণ 'লোকরহস্যে' বঙ্কিমের দুইটি প্রবন্ধ 'ব্যাঘ্রাচার্য্য' ও 'বৃহল্লাঙ্গুলের কথা'। ইহাতে ব্যাঘ্র দ্রষ্টা। দৃশ্য হইল মনুষ্যসমাজ। যদিও মনুষ্যসমাজ সম্বন্ধে ব্যাঘ্র অজ্ঞ তথাপি তাহার অজ্ঞতা প্রায় দার্শনিক নির্লিপ্ততার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। আধুনিক যুগে ইংরাজী সাহিত্যে জর্জ অরওয়েলের 'অ্যানিম্যাল ফার্মে'র সহিত অনেক বিষয়ে বঙ্কিমের 'ব্যাঘ্রে'র তুলনা হইতে পারে। ব্যাঘ্র মনে করে মনুষ্য তাহাদের চেয়ে নিকৃষ্ট পশু এবং মনুষ্য-ফাঁদে পড়া ব্যাঘ্রের মতে তাহার পরাজয় নহে। যুক্তি এই, তস্করের হাতে পড়া যেমন বুদ্ধিমানের বুদ্ধিহীনতার বা পরাজয়ের পরিচয় নহে। ব্যাঘ্রের মনুষ্যভক্ষণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বটে, কিন্তু সে ভক্ষণ যুক্তিসিদ্ধ করা হইয়াছে মনুষ্যকে সভ্য করিবার জন্য। এই যুক্তির পশ্চাতে, পাশ্চাত্য জাতিসমূহের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করা এবং শ্বেতজাতির পৃথিবীর ভার গ্রহণ করার প্রতি কৌতুক আছে। ব্যাঘ্রের দৃষ্টিতে মনুষ্যসমাজের বিবাহ সংস্কার ও অর্থনীতি চরম কৌতুকে পরিণত হইয়াছে। 'ব্রানসনিজ্‌ম্‌' নামক প্রবন্ধে ইংরাজী দৈনিক কাগজের সম্পাদক, ইংরাজ হাকিমের পেণ্টুলেন-পরা নিম্নশ্রেণীস্থ লোককে 'নেটিভ' বলা এবং তথাকথিত সাহেব ও খোসামুদে দেশী হাকিমদের লইয়া ব্যঙ্গ ও কৌতুক আছে। 'সুবর্ণ গোলক' ও 'গ্রাম্যকথা' কৌতুক চরিত্রে পরিপূর্ণ। উপন্যাসের বহুস্থলে যদিও কৌতুক রসের পরিচয় আছে কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীতে গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ ব্যতীত বঙ্কিম আর কোন বিশিষ্ট কৌতুক-চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই।

কি বিদ্রূপে, কি ব্যঙ্গে, কি কৌতুকে বঙ্কিম কোনস্থলেই উদ্দেশ্যবিহীন বা লক্ষ্যহীন বা আদর্শহীন নহেন। কোন কোন সমালোচক সেই কারণে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে বঙ্কিমের বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে ও কৌতুকে কোন করুণা নাই। এই সমালোচনা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কমলাকান্তর ভিতর এক গভীর সমবেদনা ও করুণা আছে। করুণ রস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও কৌতুককে ক্ষুণ্ণ করে

এবং তাহাদের সংমিশ্রণ করুণা ও কৌতুক উভয়কে দুর্বল করে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বরং ভল্টেয়ারকে নিষ্করুণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বঙ্কিম নিষ্করুণ নহেন; তবে বিদ্রূপে বা ব্যঙ্গ-কৌতুকে তিনি করুণার কোন আতিশয্য বা ভেজাল মেশান নাই।

ইংরেজী সামাজিক সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙালীর সংসারে মেয়েদের কিরূপ অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল তাহা লইয়া বঙ্কিম 'স্পেশিয়ালের পত্রে' কৌতুক করিয়াছেন :

> বাঙালীরা স্ত্রীলোককে পরদানশীন করিয়া রাখে শুনা আছে। ইহা সত্য বটে, কিন্তু সর্বত্র সত্য নহে। যখন কোন লাভের কথা না থাকে, তখন স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুরে রাখে, লাভের সূচনা দেখিলেই বাহির করিয়া আনে। আমরা যেরূপ 'ফাউলিং পিস্' (Fowling Piece) লইয়া ব্যবহার করি, বাঙালীরা পৌরাঙ্গনা লইয়া সেইরূপ করে। যখন প্রয়োজন নাই, বাক্সবন্দি করিয়া রাখে, শিকার দেখিলেই বাহির করিয়া তাহাতে বারুদ পোরে। বন্দুকের শীসের গুলিতে ছার পক্ষীজাতির পক্ষচ্ছেদ হয়, বাঙালীর মেয়ের নয়ন বাণে কাহার পক্ষচ্ছেদের আশা করে, বলিতে পারি না। আমি বাঙালীর কন্যার অঙ্গাভরণের যে গুণ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে, আমরাও ফাউলিং-পিসটিকে দু'একখানি সোনার গহনা পরাইয়া দেখি পাখী আসিয়া বন্দুকের উপর পড়ে কিনা। আমি এমত বলিনা যে, সকল বাঙালীর মেয়ে এরূপ ফাউলিং-পিস্ অথবা সকলেই এরূপ পুষ্প ক্ষেপণী প্রেরণে সুচতুরা। তবে কেহ কেহ বটে, ইহা আমি জনরবে অবগত আছি। শুনিয়াছি তাহারা নাকি ভর্তৃনিয়োগানুসারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুদের যে চারিটি বেদ আছে তাহার মধ্যে চাণক্য-শ্লোক নামক বেদে লেখা আছে 'আত্মানং সততং রক্ষ্যেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।'

কৌতুকের এই উদাহরণে, ভাব ও ভাষা দুই-ই সরল এবং ইহাতে করুণা যে নাই তাহা বলা যায় না। তবে সে করুণা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়া কৌতুককে বিড়ম্বিত করে নাই। বঙ্কিম ইহা লিখিয়াছিলেন একটি বিশেষ সামাজিক ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া। রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড যখন রাজকুমার, তখন ভারত পরি-ভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় আসেন। সেই সময়ে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় যুবরাজকে অন্তঃপুরে অভ্যর্থনা করেন এবং অন্তঃ-পুরের মহিলারা যুবরাজকে বরণ করেন। জগদানন্দবাবুর সহধর্মিণী দশ হাজার টাকার একটি স্বর্ণহার যুবরাজকে পরাইয়া দেন এবং একজোড়া বালা যুবরাজপত্নীকে উপহার দেন। তখনকার সমাজে ইহা লইয়া বহু সমালোচনা

হয়। উপরোক্ত ঘটনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্কিম কৌতুকের আবরণে এই সমালোচনা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমের স্বভাবে একটা সহজ কৌতুকপ্রবণতা ছিল এবং তাঁহার সকল গাম্ভীর্য ভেদ করিয়া কি বাল্যে, কি যৌবনে, কি বার্ধক্যে, যখনই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই কৌতুকপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। এই 'স্পেশিয়ালের পত্রে' তাহার অনেক উদাহরণ আছে। কলিকাতা নাম কিরূপে হইল, ইহার উত্তরে তিনি কৌতুক করিয়া লিখিয়াছেন : এই নগরীতে কাল কাটাইবার কোন কষ্ট নাই, তাই উহার নাম 'কালিকাটা'।

বিদ্রূপ, কৌতুক, ব্যঙ্গ, রসিকতা বঙ্কিম-সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ সেই কারণে এই বিষয়ে বঙ্কিমের বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

এই হাস্যরস বা কৌতুক বঙ্কিম-সাহিত্যে সর্বত্রই মার্জিত রুচি ও শিল্পের পরিচয় দেয়। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :

> আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত। এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না। কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরাজশাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই এমন নহে,—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুনে-ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভারে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং।

রস-সাহিত্যে বঙ্কিমের এই মন্তব্য রসিকতার কয়েকটি বিশেষ দিকদর্শন করিয়াছে। প্রথম হইল রসিকতায় রুচি প্রয়োজন। সেইজন্য বঙ্কিম 'সরু' রসিকতায় লাঠির বদলে লান্‌সেটের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রুচিসম্পন্ন রসিকতা সাহিত্যের অলঙ্কার। দ্বিতীয় হইল রসিকতার বিষয় ও কৌশল। রসিকতা নির্ভর করে বিষয় নিরূপণের ও প্রয়োগের কৌশলের উপর। প্রথমটির জন্য প্রয়োজন প্রকৃত সাহিত্যদৃষ্টি এবং দ্বিতীয়টির জন্য দরকার সাহিত্য-কলায় ও শিল্পে নিপুণতা। বঙ্কিমের বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে, কৌতুকে ও রসিকতায় আমরা তাহারই নিদর্শন পাই।

১১

॥ বঙ্কিমের পত্রাবলী ॥

পত্র লেখকের জীবনের কথা বলে, মনের কথা বলে, সমসাময়িক সমাজ ও সংসারের কথা বলে। পত্র হইতে পত্রলেখকের চিন্তাধারা, তাহার অভিমত, সিদ্ধান্ত ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য অনুধাবন করিতে পারা যায়। শুধু তাহাই নহে, পত্র লেখাতে এবং পত্রে লিখিত মন্তব্যে একটা স্বাধীনতা থাকে যাহা সাধারণতঃ প্রকাশিত সাহিত্যে থাকে না। প্রকাশিত সাহিত্যে অনেক সময়ে যে অভিমত ও আলোচনা থাকে তাহাতে সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষণের একটা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন আগ্রহ থাকে যাহার জন্য সেই অভিমত ও আলোচনা সম্পূর্ণ নির্ভীক, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে পারে না। ইতিহাসের মৌলিক ও যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় এই পত্রাবলী। সেইজন্য আমরা অনেক বিখ্যাত লেখকের পত্রাবলীর সংগ্রহ প্রকাশিত হইতে দেখিতে পাই যাহা লেখক সম্বন্ধে বহু বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাংলাদেশের ও বাংলাভাষার দুর্ভাগ্য যে আজ অবধি বঙ্কিমের পত্রাবলীর বিষয় বা কাল লইয়া কোন সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক সঙ্কলন ও সংগ্রহের প্রচেষ্টা হয় নাই। যৎকিঞ্চিৎ যাহা হইয়াছে তাহাকে প্রকৃত সংগ্রহ বলা চলে না। কালের গতিতে হয়ত বহু পত্রই আজ সংগ্রহের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; তথাপি এখনও যাহা উদ্ধার করা যায় তাহা সংগ্রহের জন্য যত্নবান হইলে দেশের ভাষার ও জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে।

বঙ্কিমের পত্রাবলীতে সমাজের, সংসারের, রাষ্ট্রের, ধর্মের, শিক্ষার, সাহিত্যের, সমালোচনার ও জাতীয় চরিত্রের সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ ও অমূল্য মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত আছে। ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বঙ্কিমের পত্রাবলীর তাৎপর্য গভীর। বঙ্কিমের পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া তাহা লইয়া গবেষণা করিলে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, যাহা আমাদের বর্তমান ধারণার বাহিরে। ইহার দ্বারা ইতিহাসের নূতন দিক্‌দর্শন হইতে পারে।

বিষয় বিশেষে ও ব্যক্তি বিশেষে বঙ্কিমের পত্রের ভাব ও ভাষা বিভিন্ন।

বঙ্কিমযুগের পত্রলেখার ভাষা ও সম্বোধন, প্রারম্ভ ও উপসংহার বর্তমানের তুলনায় পৃথক ছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তি কি সামান্য ব্যক্তি, গভীর বিষয়ে, কি লঘু বিষয়ে, বঙ্কিম যখনই কোন পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পারিবারিক পত্রাবলীতে বঙ্কিমকে এক নূতন রূপে দেখা যায়। সেখানে পণ্ডিত বঙ্কিম বা ঐতিহাসিক বঙ্কিম, বা মনীষী বঙ্কিম বা সাহিত্যিক বঙ্কিমকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার পরিবর্তে বিষয়ী ও বিচক্ষণ বঙ্কিমের পরিচয় আছে। সেখানে কল্পনা নাই, কবিত্ব নাই, ভাষার আড়ম্বর নাই। সেখানে আছে বিষয়ের যথার্থ বাস্তবোচিত কথা এবং তাহার প্রতি সচেতন ও সজাগ দৃষ্টি। বঙ্কিম মনে করিতেন সাংসারিক বিষয়ে অবহেলা করাও কর্তব্যপালনে ত্রুটি।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বঙ্কিম তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রকে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা এই :

বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেবক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র শর্মণঃ

প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চবিশেষ,—

আপনি যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছেন তাহার উত্তর আমি বাংলায় লিখিলাম। ইহার কারণ এই যে, আবশ্যক হইলে বা উচিত মনে করিলে পিতাঠাকুরকে পড়িতে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীযুক্ত.........আপনাকে যতীশের বিবাহ সম্বন্ধে ১৬০০৲ শত টাকা কর্জ করিতে বলিয়াছেন। কর্জ পাওয়া আশ্চর্য নহে। আপনি না পান, শ্রীযুক্ত......আজ্ঞা করিলে অনেকে কর্জ দিবে। কর্জ করিলে আপনার বর্তমান ৫০০০৲ টাকার ঋণের উপর ৭০০০৲ টাকা হইবে। ইহার পরিশোধের সম্ভাবনা কি? আপনি কত করিয়া মাসে কর্জ শোধ করিয়া থাকেন? কোন মাসে ২০৲ টাকা, কোন মাসে কিছুই নয়। অদ্য কুড়ি বৎসর আপনি ঋণগ্রস্ত, কখনও ঋণের বৃদ্ধি ব্যতীত পরিশোধ করিতে পারেন না। ভবিষ্যতে যে অন্য প্রকার হইবে তাহার কি লক্ষণ দেখা যায়? কিছুই না।

......যে ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবেন না মনে জানিতেছেন, তাহা গ্রহণ করা পরকে ফাঁকি দিয়া টাকা লওয়া হয়। আপনি যদি এক্ষণে ১৬০০৲ টাকা কর্জ করেন, তবে ঋণ গ্রহণ করাকে বঞ্চনা বলিতে হইবে। বরং ভিক্ষাবৃত্তি ভাল তথাপি বঞ্চনা ভাল নহে। পিতৃ-আজ্ঞা পালনার্থ অথবা পিতার সুখরঞ্জনের জন্য তাহা কর্তব্য নহে। এরূপ অধর্মাচরণ

অপেক্ষা পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর্তব্য। আপনি যদি ঋণ বৃদ্ধি করেন তবে যতীশের যাবজ্জীবনের জন্য যে কি গুরুতর অনিষ্ট করিবেন তাহা বলা যায় না।

......যতীশের বিবাহে আপনি বা শ্রীযুক্ত...এক পয়সাও ঋণ করিতে পারিবেন না। আমার বিবেচনায় যতীশের বিবাহ দুই বৎসর পরেও ভাল, তথাপি ঋণ কর্তব্য নহে।

যদিও এই পত্র সামান্য সাময়িক ব্যাপারে লেখা সাংসারিক পত্র হিসাবে অগ্রজকে লিখিত তথাপি ইহাতে কতকগুলি বিশেষ সাংসারিক ও পারিবারিক সমস্যা সম্বন্ধে বঙ্কিমের অভিমত সুদৃঢ়ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা, ঋণ করিয়া বিবাহদান তিনি সমর্থন করিতেন না, যে ঋণ সারাজীবন ধরিয়া পরিশোধ করা যাইবে না সে ঋণ গ্রহণ করাকে তিনি প্রবঞ্চনা বলিয়াছেন এবং যথার্থ কর্তব্য পালনে পিতৃআজ্ঞাও লঙ্ঘনীয় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই যতীশকে বঙ্কিম অত্যন্ত স্নেহ করিতেন কিন্তু স্নেহান্ধ হইয়া তাহার প্রকৃত কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি হারান নাই।

আর একটি সাংসারিক পত্র হইতে বঙ্কিমের ভ্রাতৃস্নেহ, কর্তব্যজ্ঞান, দেশীয় অনুষ্ঠান ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাসন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সহিত বঙ্কিমের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতীশচন্দ্রের বিশেষ পরিচয় ছিল এবং সেই কারণে ভ্রাতুষ্পুত্র দেবমহাশয়কে এক ভোজ দিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায় বঙ্কিম তাহাকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন :

'প্রিয়তমেষু

মুরলী যে কাঁটালপাড়ায় যায় এমন কোন সম্ভাবনা নাই। বড়বাবুর চাকর নাই। চাকর যাহাকে বহাল করিয়াছিলেন সে পালাইয়াছে। কেহ থাকিতে চাহে না। আজ তিনি পৃথক বাসা করিয়াছেন। তাঁহার বাসায় অটল মোতায়েন আছে। অতএব মুরলীকে পাঠাইলে আমার বাসার কাজ চলিবে না। অটল, মুরলী উভয়ে না থাকিলে বড়বাবুর কার্য চলিবে না। কারণ তাঁহার বাসায় জনপ্রাণী নাই। আমার কাঁটালপাড়ায় যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বড়বাবুর অবস্থা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তন হইতেছে, কখন কি রকম হয় তাহার স্থির নাই। তিনি আমায় কোথাও যাইতে দেন না। রাত্রে উঠাইয়া আনেন। সুতরাং তাঁহাকে ফেলিয়া আমি কাঁটালপাড়া যাইতে পারিব না।

তোমার জ্যেষ্ঠতাতের মরণাপন্ন অবস্থা, আর তোমার পিতা শয্যাগত, এই অবস্থায় যে তুমি ভোজের ঘণ্টা বাজাইয়াছ, তাহা অতি বিস্ময়কর। তোমার বালকবুদ্ধি আজও যায় নাই।

যাহা হউক সেখানে মুরলীর যাওয়া হইল না। এখানে লোকাভাবে অটলকে পাঠান হইল না। আমার ছুরি কাঁটা যাহা ছিল তাহা ঝিনাইদহ হইতে আসিবার সময় Shirres সাহেবকে দিয়া আসিয়াছি। বে-সেট যাহা আছে তাহা টেবিলে বাহির করা যায় না।

আমার বিবেচনায় যদি গোপেন্দ্রকৃষ্ণকে খাওয়াইতেই হয়, তবে আমাদের দেশী ব্যঞ্জনাদি উত্তম করিয়া খাওয়াইলে ভাল হইতে পারে। তুমি যে ২॥০ পাঠাইয়াছিলে তাহা ফেরৎ পাঠাইলাম। ইতি তাং বুধবার...

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই পত্রে সংসারের খুঁটিনাটির দিকে দৃষ্টি, ভৃত্যের অভাব, খাওয়ার খুঁটিনাটি আয়োজন ও সরঞ্জাম, ভ্রাতার প্রতি লক্ষ্য ও সংসারের কর্তব্য ও সুবিধা-অসুবিধার বিষয়, ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাসন ইত্যাদি সবই আছে। সংসারের এই অবস্থায় কি সংগত ও অসংগত তাহা এই পত্রে সোজা কথায় ব্যক্ত হইয়াছে।

আর একটি পত্রে পারিবারিক ও গ্রাম্য দলাদলি ও স্বার্থের উল্লেখ আছে। এই গ্রাম্য দলাদলি ও স্বার্থের জন্য বঙ্কিম কাঁটালপাড়ার উপর বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করিয়া মেদিনীপুর হইতে ১৭ই আগষ্ট ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন :

শ্রীচরণেষু

কাঁটালপাড়ায় স্কুল বা কলেজ বা ইউনিভার্সিটি যাহাই হৌক তাহাতে আমি কোন সাহায্য করিব না। কাঁটালপাড়ার পূজায় আমি টাকা দিব না। এবৎসর আমি ও আমার পরিবার পূজার সময় মেদিনীপুরেই থাকিব। সুতরাং কলিকাতাতেও পূজা করিতে পারিলাম না।

যেখানে বরদা ভট্টাচার্যের মত ব্যক্তি আমাকে জুয়াচোর বলে, যে স্থানে রামকৃষ্ণ ও ব্রজনাথের মত লোক আমার পিতাকে জালসাজ বলে, যে দেশে বসন্ত ও চণ্ডী ভট্টাচার্যের মত লোকের সংগে দলাদলি, এবং যেখানে বড়বাবুর মত সহোদরের মুখ দেখিতে হয়, সে দেশের সংগে আমি আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না। সেখানে আমার দুর্গোৎসব হইবে না।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ্রাম্য সংকীর্ণতার যে চিত্র এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কাঁটালপাড়া উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত কিন্তু তখনকার দিনে বহু গ্রামের অবস্থা ও আবহাওয়া

এইরকমই ছিল, যাহা পরবর্তীযুগে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'পল্লীসমাজে' অঙ্কিত করিয়াছেন।

উপদেশপূর্ণ পত্রের আর একটি উদাহরণ বঙ্কিমের লেখা হইতে দেওয়া অসংগত হইবে না। যাহারা নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে সেই সব যুবকদের কি রকম কর্মনীতি ও জীবনধারা হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বঙ্কিমের একটি পত্র বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে। জ্যোতিষচন্দ্রের পুলিশ ইন্সপেক্টরের চাকুরী হওয়াতে বঙ্কিম তাহাকে দু-একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন তারিখে জ্যোতিষকে লিখিত পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে। আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম। এই সাতটি *Golden Rule* বিবেচনা করিবে, বিশেষ প্রথম পাঁচটি। ইহার অনুবর্তী হইলে সর্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি ১লা আশ্বিন

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশেষ উপদেশ—

১। প্রথম প্রয়োজনীয় কথা—সত্য ভিন্ন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখনও মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকুরী থাকে না। নিতান্তপক্ষে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হইবে না।

২। দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা—পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখনও উন্নতি হয় না। কখনও যেন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।

৩। উপরওয়ালার আজ্ঞাকারীতা। তাঁহাদের নিকট বিনীতভাব। চাকুরী রাখার এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না।

৪। আপনার কাজের *Rules and Hours* বিশেষরূপে অবগত হইবে।

৫। কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিশের লোক আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস তাহা না হইলে কাজ চলে না, তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখনও করিবে না; বা অধীনস্থ কাহাকেও করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

৬। সকলের সংগে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে সদ্ব্যবহার দ্বারা

বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্তব্য কর্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। উহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

৭। নিষ্কারণে ভীত হইও না।

উপদেশ হিসাবে ইহা আদর্শ সত্য এবং বাস্তবক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ইহা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এইসকল উপদেশের পশ্চাতে আছে বঙ্কিমের নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা।

সাংসারিক ও পারিবারিক পত্রে বঙ্কিমের এক রূপ আমরা দেখিলাম। বঙ্কিমের অন্য বিষয় সংক্রান্ত পত্র আলোচনা করিলে তাঁহার ভিন্ন রূপ আমরা দেখিব। তিনি নিজের উপন্যাস বা সাহিত্য লইয়া পত্রে সবিশেষ আলোচনা করিতেন না। তাহা সত্ত্বেও কয়েকখানি পত্রে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১৯শে পৌষ বঙ্কিম স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার নিজের সাহিত্য ও উপন্যাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। পত্রটি বাংলা ভাষায় লিখিত ও নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য :

নমস্কারপূর্বক সবিনয় নিবেদন,

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন। তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন ইহা আমার সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত। কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর এরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব; কারণ উহাতে আপনি আমাকে যাহা বলিয়াছেন—আপনার সম্মানে বঙ্গবাসীমাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে—অন্যে একথা বলিলে তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী, সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার উক্তি চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয় তখন একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন যে, ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যগুলির সহিত তুলনীয় এবং আর একজন বলিয়াছিলেন যে Sophocles প্রণীত Antigi চরিত্রের পর ইহার তুল্য স্ত্রী চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্টি হয় নাই। এ সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি ১৯শে পৌষ ১৩০০।

দুঃখের বিষয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দুর্লভ পত্রখানি কোথাও রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না, কারণ বহু অন্বেষণ করিয়াও ইহা বাহির করিতে পারি নাই। বোধ হয় কালে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যাহার কথা রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই অমূল্য পত্রখানিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে মনে হয়। ইহার উল্লেখ আমরা বঙ্কিমের জীবনদর্শন অধ্যায়ে করিয়াছি।

বঙ্কিমের পত্রাবলীর মধ্যে বাংলাভাষা ও বাংলা পত্রিকা লইয়া আলোচনা আছে। তখনকার সময়ে ইংরেজী পত্রিকার উপর অনেক আকর্ষণ ছিল। কিন্তু বাংলাভাষা, বাংলা সংস্কৃতি ও দেশের উন্নতির জন্য বঙ্কিম মনে করিতেন বাংলায় পত্রিকা ও বাংলায় সমালোচনা ও বিতর্ক বিশেষ প্রয়োজন। বঙ্কিমের মতে ইহা দ্বারাই শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ভেদ ইংরাজ শাসনে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং যাহার জন্য দেশের অনিষ্ট ও অকল্যাণ হইতেছিল, তাহা দূর হইবে। এই মর্মে বঙ্কিম তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ ইংরেজী দ্বৈমাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'মুখার্জি'স ম্যাগাজিনের' সম্পাদক ও প্রকাশক শম্ভুচন্দ্র মুখার্জিকে এই পত্র লেখেন :

"My dear Sir,

I am very happy to acknowledge your favour of the 11th. You are mistaken in considering me a stranger. I claim the honour of being acquainted with you. We have met more than once.

I scarcely know how to thank you for the many things you are kind enough to say of me. But as I know that my obligations to you in this respect are of long standing, I will not seek to diminish their weight by a tardy return of thanks.

I wish you every success in your project. I have myself projected a Bengali Magazine with the object of making it the medium of communication and sympathy between the educated and the uneducated classes. You rightly say that the English for good or evil has become our vernacular but this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali Society. This I think is not exactly what it ought to be.

I think we ought to disanglicise ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to the masses in language they understand. I therefore projected a Bengali Magazine.

But this is only half the work, we have to do. No purely vernacular organ can completely represent the Bengali culture of the day. Just as we ought to address ourselves to the masses of our own race and country, we have also to make ourselves inteligible to the other Indian races and to the governing race. There is no hope for India until the Bengali and the Punjabi understand and influence each other and can bring their joint influence upon the English man. This can be done only through the medium of the English language and I gladly welcome your projected periodical. . . . .

After this, I need not tell you that I shall not want in inclination to co-operate with you and if my literary services are worth enlisting on your side, they are at your disposal. . . . .

I am
My dear Sir
truly yours
Bankim Chandra Chatterjee"

এই অভিমত বোধহয় আজও সত্য এবং সেইজন্য এই পত্রের ঐতিহাসিক মূল্য এবং বর্তমান গুরুত্ব যথেষ্ট। আজও আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, কতিপয় সহরবাসী ইংরেজী পড়িতে ও বুঝিতে জানে বলিয়া ইংরেজী পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হয় তাহাই দেশের কোটী কোটী নরনারী বুঝিতেছে ও পড়িতেছে। এই ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে বঙ্কিম তাঁহার অভিযান চালাইয়াছিলেন এবং বঙ্কিমের সেই বাণী আমাদের বহু অবহেলিত ও উপেক্ষিত বাংলা পত্রিকাগুলি আজ শত বাধা সত্ত্বেও গৌরবের সহিত বহন করিতেছে। গণচেতনা জাগরণের জন্য বাংলায় পত্রিকার প্রয়োজনের কথা বঙ্কিম বহুপূর্বেই বুঝিয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই বহরমপুর হইতে বঙ্কিম ২৭শে মার্চ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শম্ভুচন্দ্রকে আর একটি পত্র লেখেন। ইহাতে সাহিত্য ও উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের মতামতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সেই পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নীচে দেওয়া গেল।

"My dear Sir,

. . . For the English Magazine, I can undertake to supply you with novels, talks, sketches, and squibs. I can also take up

political questions, as you wish. Malicious fortune has made me a sort of Jack of all trades, and I can turn up any kind of work from transcendental metaphysics to verse making. The quality, of course, you cannot expect to be superior but I will do all I can for you. The novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the cultural idea.

I am yours truly
Bankim Chandra Chatterjee

এই পত্রের বিশেষ তাৎপর্য ও মর্যাদা দুইটি। প্রথম, বঙ্কিম সকল রকম সাহিত্যের পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং সকল রকম সাহিত্য লিখিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন এবং লিখিয়াও ছিলেন। রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম, উপন্যাস, সমালোচনা কোন বিষয়ই তাঁহার সাহিত্যের বাহিরে ছিল না। দ্বিতীয়, বঙ্কিম, উপন্যাসলেখা যে কত সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য তাহা দেখাইয়া বলিয়াছেন যে উপন্যাসের পশ্চাতে একটা মূল ধারণা থাকা প্রয়োজন এবং শিল্পের দিক দিয়া বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্র এমনভাবে সংযোজনা প্রয়োজন যে তাহারা যেন কেন্দ্রীয় ধারণার অনুগত হয়।

১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে পৌষ বঙ্কিম তাঁহার সুহৃদ্বয় *কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে বন্দেমাতরম ও বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা 'জীবনদর্শন' অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সুতরাং এই স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্কিমের উল্লেখযোগ্য পত্রাবলীর অন্যতম হইল সেই সকল পত্র যেখানে তিনি দেশী ও ইংরাজ খৃষ্টানদের সহিত হিন্দুধর্ম লইয়া নানা তর্ক-বিতর্ক করিয়াছিলেন। 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে ষ্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকায় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং রেভারেণ্ড হেষ্টি ও কালীমোহন ব্যানার্জির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'পজিটিভিষ্ট' দার্শনিক যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখিত বঙ্কিমের পত্রগুলি Letters on Hinduism-এর অন্তর্গত। যাঁহারা এই সকল পত্র পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারা ইহার চারিটি পত্র Letters on Hinduism নামে বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'বঙ্কিম প্রতিভায়' মুদ্রিত পাইবেন। এই সকল পত্রের বৈশিষ্ট্য, হিন্দুধর্মের সার কথা সহজ সরল অথচ

তেজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা এবং হিন্দুধর্মের উপর অজ্ঞানতাপ্রণোদিত ও অযৌক্তিক সমালোচনার নিরসন ও খণ্ডন। ইহার পূর্বে ইংরেজী ভাষায় হিন্দুধর্মের এইরূপ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ কোন ভারতীয় বা বাঙ্গালী করেন নাই। ৬ই অক্টোবর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় 'দি মডার্ন সেণ্ট্‌পল্‌' শীর্ষক পত্রে রেভারেণ্ড হেষ্টিকে প্রতিবাদ করিয়া বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন :

"Let Mr. Hastie take my advice and obtain some knowledge of Sanskrit scriptures in the original. Let him not study them under European scholars for they cannot teach what they do not understand. The blind cannot lead the blind."

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আর একটি পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র স্টেট্‌স্‌-ম্যান পত্রিকায় 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে রেভারেণ্ড হেষ্টিকে লিখিয়াছিলেন :

"Here too, however, the student must distinguish between the essentials of Hinduism and it's non-essential adjuncts. Much of the ethical portions is pure ethics and not religion. The social polity is also non-essential. Caste, therefore, which is the most prominent feature of that polity, is non-essential. There have been and there still are many Hindu sects who discard caste distinctions. The Chaitanyayiti Vaishnavas furnish an instance on the point. Mr. Hastie may turn round upon me here and say—you strip Hinduism of its rites, its idolatry, its caste: what do you then leave it? I leave the kernel without the husk.

'Letters on Hinduism' -এর Bankim Chandra Chatterjee—Centenary Edition, (Editors—Brajendra Nath Banerji and Sajanikanta Das) অন্তর্গত আর একটি পত্রে ১২ পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"Principles are immutable but the modes of their application vary according to time and circumstances. The great principles of Hinduism are good for all ages and all mankind—for they are based on what Carlyle would call the 'eternal verities', but its non-essential adjuncts have become effete and even pernicious in an altered state of society. It will be one of the objects of these letters to show what these non-essential adjuncts are. I shall describe what true Hinduism is by showing what false and corrupt Hinduism pretends to be.

পরবর্তী পত্রে এই বিষয়ে বঙ্কিম প্রকৃত হিন্দুধর্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহার মূলকথা বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসার অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

কি ইংরেজীতে, কি বাংলাতে বঙ্কিমের পত্রলেখার এক বিশেষ রীতি ও ভঙ্গি ছিল। পত্র-সাহিত্যে বঙ্কিম কোন বিশেষ আড়ম্বর বা অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন না। ভাষা ও ভাব দুই-ই স্পষ্ট, সহজ ও সরল। যেমন কুণ্ঠাহীন তাঁহার সিদ্ধান্ত, তেমনি স্পষ্টবাদী তেজস্বিতা তাঁহার পত্রের প্রাণ। অকৃত্রিমতা বঙ্কিমের পত্রাবলীর বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য। এই সকল পত্রে, কি পারিবারিক, কি সাংসারিক অথবা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয়, কোথাও মন রাখিয়া কথা বলা বা যাহাতে দুইদিক রক্ষা হয়, সেরূপ লেখা বঙ্কিমের কোন পত্রে নাই।

সেই কালের বহু মনীষীর সহিত বঙ্কিমের পত্র বিনিময় হইয়াছিল। যথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামদাস সেন, জগদীশনাথ রায়, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শশধর তর্কচূড়ামণি, রমেশচন্দ্র দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যিক, দার্শনিক ও চিন্তানায়ক। এই সকল পত্রের বেশীর ভাগই আজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ এবং আশঙ্কা হয় নষ্ট হইয়াছে। তবু যাহা কিছু এখনও থাকিতে পারে তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ইহা ব্যতীত বঙ্কিম লিখিত বহু সরকারী পত্র আছে দুর্ভাগ্যবশতঃ যাহার অনুসন্ধান ও গবেষণা আজ পর্যন্ত হয় নাই। তাহা হইতে রাষ্ট্রীয় ও শাসনতন্ত্রের বহু তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। বঙ্কিমের পত্রাবলীর ঐতিহাসিক সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মূল্য নির্ধারণ করিবার আজ সময় আসিয়াছে। এই সকল পত্রে তাঁহার নিজের মতামত তো প্রকাশিত হইয়াছেই উপরন্তু তখনকার দিনের সমস্যার চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তৎকালীন যে সকল সমস্যা ও ঘটনা দেশে উঠিয়াছিল তাহার আলোচনাও এই সকল পত্রে আছে।

ইহার দুই একটি উদাহরণ দেখিলেই বিষয়ের তাৎপর্য বুঝা যাইবে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিম নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে জানা যায় যে বঙ্কিম তখন আনন্দমঠ রচনা করিতেছিলেন, 'বন্দেমাতরম' সুরমণ্ডিত করিতেছিলেন, এবং ভারতবর্ষের একটি ইতিহাসও রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিম

এই ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই তবে তাঁহার স্বহস্তে লেখা একটি খাতায় এই ইতিহাসের উপকরণ ও বিষয়ের কথঞ্চিৎ উল্লেখ আছে।—যথা :

'Character of the Ancient Hindus. Maritime Power. Habits, External Commerce, Manners Customs, Women and widow remarriage, Dates of authors, Wealth of Ancient India, Government, Military Power, Arab expeditions, Arab Geographers, Historical Miscellaneous.'

এই বিষয়সূচী বঙ্কিমের ঈপ্সীত ইতিহাসের দৃষ্টি ইঙ্গিত করিয়াছে এবং ইহাতে কোন ধারায় তিনি ইতিহাস চিন্তা করিতেছিলেন তাহা ধারণা করা যায়। ২৭শে নভেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম শম্ভুবাবুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকার কি আদর্শ হওয়া উচিৎ তাহার উল্লেখ আছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমের সহিত অমৃতবাজার পত্রিকার যে সংঘর্ষ হয় তাহার উপর কটাক্ষপাত আছে। এই পত্রে বঙ্কিম লিখিতেছেন :

My dear Sambhu,

. . . I cannot congratulate you on your frontispiece ("Modern Avatar" making a caricature of Sir George Campbell) this time. I am no admirer of Sir George Campbell, but I think it was due to yourself that you should not descend to 'Georgy Babu' and 'George Pir' etc. It is folly in me—your junior both in years and reputation—to attempt to dictate to you in these matters, but it seems to my humble judgment that caricatures like "Georgy Babu" etc. though good for my friend of the Amrita Bazar Patrika, suit ill the taste and breeding of our best literary magazine.

এই পত্রে বঙ্কিম দেখাইতেছেন যে সমালোচনা সবল ও সতেজ হইবে কিন্তু তাহাতে যেন ভাষার দুর্ব্যবহার ও অসভ্যতা না থাকে এবং ভাবপ্রকাশের অসংযমতা ও রুচীহীনতা না থাকে। আমরা যখন বঙ্কিম-সাহিত্যে বিদ্রূপের আলোচনা করিয়াছি তখন বঙ্কিমের এই বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে।

এই পত্রে অমৃতবাজার পত্রিকার উল্লেখের পশ্চাতে তখনকার সাময়িক ইতিহাসের একটু যোগাযোগ আছে। স্যার জর্জ ক্যাম্বেল তখন বাংলাদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। সেই সময়ে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দেশীয় সংবাদ-

পত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার সম্বন্ধে বঙ্কিম প্রতিবাদ করিয়া সাংবাদিকদের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৬ই অক্টোবর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমকে আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন :

According to his (Bankim Chandra Chatterjee, the Dy. Collector of Berhampore) opinion 'much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the subject of comment, is due to the action of the native press'. We are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bankim Babu, who holds no inconsiderable position in our society. Certainly in a free country such remarks from a person of Bankim Babu's position, would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country.

অমৃতবাজার পত্রিকা পুনরায় ২৩শে অক্টোবর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিম নাকি বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সহায়ক; এমন কি তিনি নাকি নিজের চাকুরীর উন্নতির জন্য ঐরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন! অমৃতবাজার পত্রিকা বঙ্কিম সম্বন্ধে ঐ তারিখের কাগজে লিখিয়াছিলেন :

Babu Bankim Chander draws but only Rs. 600/- per month and already his zeal has met with the approbation of His Honour (Sir George Campbell) and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold.

যে-বঙ্কিম জাতিকে রাষ্ট্রচেতনা দান করিয়াছিলেন, যিনি সারা জীবন বিদেশী শাসন ও পরাধীনতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দেই কর্ণেল ডাফিনকে লইয়া ব্রিটিশ শাসনের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং যিনি ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দেই গেজেটে তাঁহার পদোন্নতি না হওয়ার জন্য চাকুরী ছাড়িয়া দিবেন স্থির করিতেছিলেন, তাঁহাকে তাঁহারই দেশীয় সংবাদপত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা' জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এই কারণে ২৩শে নভেম্বর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে শম্ভুবাবুকে লিখিত পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অমৃতবাজার পত্রিকার রুচির উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন।

১২

॥ বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন ॥

সার্থক নাম বঙ্গদর্শন। যথার্থই ইহাতে সমগ্র বঙ্গ দর্শন শুধু নয়, এমনকি ভারতদর্শনও হইয়াছে। বাঙ্গালী বাংলাকে জানে না। ভারতবাসী ভারতকে জানে না। ইহাই ছিল বঙ্কিমের আক্ষেপ ও দুঃখ। দেশের ভাষা, দেশের সমাজ, দেশের ধর্ম, দেশের শিক্ষা, দেশের সভ্যতা ও কৃষ্টি, তাহাদের লুপ্ত গৌরব ও স্মৃতি জাগ্রত করা ছিল বঙ্কিম-জীবনের সাধনা। সেই সাধনার সিদ্ধির জন্য বঙ্কিমের অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিল 'বঙ্গদর্শন'।

দেশে প্রকৃত সাহিত্য-পত্রিকা সৃষ্টির অগ্রদূত এই বঙ্গদর্শন। সেই কারণে বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয় এক বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলাভাষায় প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন দিকদর্শন করা—ইহাই ছিল বঙ্গদর্শনের অবিস্মরণীয় অবদান। ইহার পূর্বে যে বাংলাভাষায় কোন পত্রিকা ছিল না তাহা নহে। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'সর্বশুভঙ্করী', রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'সোমপ্রকাশ', 'রহস্য-সন্দর্ভ', কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত 'পরিদর্শক' প্রভৃতি ইহার প্রমাণ। কিন্তু তাহাদের বিষয়ের প্রসার ও পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ। প্রবন্ধ কতিপয় এলোমেলো ইতিবৃত্ত ও সংবাদের সংযোজনা মাত্র নহে; তাহা বিবিধ যুক্তি, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও সরস বর্ণনা সংযোগে কিভাবে স্বাধীন সাহিত্যের রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত ও প্রচারিত হইতে পারে, এবং শিক্ষা, জ্ঞান ও আনন্দের সমন্বয় সাধন করিয়া কিভাবে নূতন চিত্তাকর্ষক সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে 'বঙ্গদর্শন' তাহার প্রথম ও উজ্জ্বল নিদর্শন। ইহাতে বাংলাভাষায় যে সকল নূতন পুস্তক বা গ্রন্থ রচনা হইত, তাহার সমালোচনা থাকিত এবং ইহার দ্বারা বাংলার চিন্তাধারার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান ও সমালোচনা সমস্ত দিক হইতে 'বঙ্গদর্শন' বাংলাকে ও ভারতকে দেখিয়াছিল ও দেখাইতে চাহিয়াছিল। সাহিত্যের আদর্শের পথপ্রদর্শক ছিল এই 'বঙ্গদর্শন'।

বাংলা ১২৭৯ সালের বৈশাখে, ইংরাজী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিম সম্পাদিত বঙ্গদর্শন ১নং পিপুল পট্টী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে সাপ্তাহিক

সংবাদপত্র হিসাবে ব্রজমাধব বসু কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার গোড়াপত্তন হয় যখন বঙ্কিম বহরমপুরে বাস করিতেছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিম বহরমপুরে বদলী হন, এবং সেখানে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে পর্যন্ত অবস্থান করেন। বঙ্কিমের জীবনে বহরমপুরের অবস্থানকাল বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই 'বঙ্গদর্শন'-কে কেন্দ্র করিয়া একটি বাংলা লেখকগোষ্ঠী ও সাহিত্যসেবী সমাজ গড়িয়া উঠে। এই সাহিত্যিক মণ্ডলীতে ছিলেন অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয় সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, বৈকুণ্ঠ-নাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।

'বঙ্গদর্শনের' সূচনায় বঙ্কিম লিখিয়াছেন :

> এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদের উক্তি বহন করিয়া ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।

ইহাই ছিল বঙ্গদর্শনের আদর্শ ও মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই যুগের জ্ঞানের বার্তার বাহক ছিল বঙ্গদর্শন। তবে শুধু বিদ্যা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করা বঙ্গদর্শনের একমাত্র কাজ ছিল না, যদিও সে বিষয়ে ইহার স্থান ছিল অতি উচ্চে। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্যিক বহু সমস্যার বিবিধ সমালোচনা প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বাংলাদেশকে এক নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সেই আত্মচেতনা দেশের সভ্যতা, কৃষ্টি, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ ও শ্রদ্ধার ভিত্তি স্থাপন করিয়া জাতীয় জাগরণে সহায়তা করিয়াছিল। আগামী যুগের বঙ্গসাহিত্যের প্রচার ও আধিপত্য 'বঙ্গদর্শন' সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গদর্শনই প্রথম চিত্রিত করিয়াছিল বিভিন্ন দিক দিয়া বঙ্গের ও ভারতের সমগ্র রূপ।

বঙ্কিমের নিজের বহু উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। যথা—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয়, লোকরহস্য,

বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, এবং আংশিকভাবে 'সাম্য'। বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই বঙ্কিম ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সংগীত, সাহিত্য, সমালোচনা, ব্যঙ্গ ও কৌতুক লইয়া বিবিধ রচনা লোকসমাজে নিবেদন করিয়াছেন। এই বঙ্গদর্শন পত্রিকার ভিতর দিয়া বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ, শিল্প ও শিল্পের প্রসার, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এই সকল বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের প্রতি বঙ্কিম বাংলার ও ভারতের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন।

রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক সাহিত্যে' বঙ্গদর্শনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা ছাড়িত না। কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন যে বর্তমানের কোন উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এইজন্য তিনি অম্লানমুখে চিরকাল বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব করিতে হয় নাই। বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থির-ভাবে পর্যন্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল, সর্বত্রই তিনি তাঁহার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। বিপন্ন বঙ্গভাষা যেখানেই তাঁহাকে আহবান করিয়াছে, সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

'বঙ্গদর্শন' পড়িলে রবীন্দ্রনাথের এই মর্মস্পর্শী কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বঙ্কিম সত্যই বিষ্ণুর মতন সাহিত্যের প্রতি দিকে ও প্রতি বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সাহিত্যদৃষ্টি যে সমগ্র জীবনদর্শন তাহা 'বঙ্গদর্শনে' দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের জ্ঞান ও ব্যবহারিক জীবনের কোন কক্ষই যে সাহিত্যের নিকট রুদ্ধ নহে, তাহার প্রথম পরিচয় বাংলাভাষার 'বঙ্গদর্শন'। এই বঙ্গ-দর্শন শুধু বঙ্গদর্শন নহে, সমস্ত মানবদর্শন ও বিশ্বরূপদর্শন। বৈচিত্র্যে, ব্যাপকতায়, ব্যাপ্তিতে ও গভীরতায় 'বঙ্গদর্শন' অতুলনীয় ও অনুপম।

বঙ্কিমের নিজস্ব সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ অবধি চার বৎসর প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়। নানা কারণে ইহা বন্ধ হইয়াছিল। বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার অব্যবহিত

পরেই বঙ্কিম সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে যত্নবান হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচনা' নামে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরও দশটি প্রবন্ধ লইয়া 'প্রবন্ধ পুস্তক' প্রকাশিত হয়। তখন সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হইতেছে এবং তাহাতে বঙ্কিম আবার নূতন নূতন রচনা পাঠাইতেছেন।

সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাযন্ত্রে ১২৮১ বঙ্গাব্দে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভ্রমর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বৎসরে অর্থাৎ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গ্রাহক সংখ্যা দেড় হাজার হইয়াছিল। এই 'ভ্রমর' ও 'বঙ্গ-দর্শন' পত্রিকা ও বঙ্গদর্শন প্রেস সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন :

> ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন 'বঙ্গদর্শন প্রেস'। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল।
>
> তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানি ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হইলে ভাল। যাঁহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারেন না, অথবা বঙ্গদর্শন যাঁহাদের পক্ষে কঠিন তাঁহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র বাঞ্ছনীয়। তাঁহাকে (সঞ্জীবচন্দ্রকে) অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকত্ব তিনি গ্রহণ করেন। সেই অনুসারে তিনি 'ভ্রমর' নামক মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। প্রায় তিনি একাই 'ভ্রমরের' সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন, আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু এক কাজ তিনি নিয়মমতন অনেকদিন করিতে ভাল বাসিতেন না। 'ভ্রমর' লোকান্তরে উড়িয়া গেল।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের চৈত্র মাসের পর বঙ্গদর্শন আর প্রকাশিত হইল না। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বঙ্কিমবাবুকে বঙ্গদর্শন চালাইবার জন্য বারবার অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে বঙ্কিম নবীনচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—

'কি করবো ভাই। একে আমি দাসত্বভারে পীড়িত। তাহার উপর স্বাস্থ্যের

ও পরিশ্রমের শক্তির একটা সীমাও আছে। ইদানীং তিন ভাগ লেখা আমাকে দিতে হতো। কাজে কাজেই আমি আর পেরে উঠলাম না।'

নবীনচন্দ্র কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি বঙ্কিমকে বলেন 'ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল।' তখন বঙ্কিম বলিলেন :

তা বটে। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচনায় দেশ আমার শত্রু হয়ে উঠেছিল—গালাগালির ত কথাই নেই। কোন কোন গ্রন্থকার আমাকে মারবে বলে সঙ্কল্প করেছিল। I am the worst abused man next only to Sir George Campbell. তোমরা বঙ্গ-দর্শন পুনরায় প্রচার করতে চাও, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হব না।

বঙ্কিমের এই সকল উক্তি হইতে কতিপয় ধারণা সুস্পষ্ট হইতেছে। প্রথম, পত্র বা পত্রিকা চালাইবার জন্য বহু লেখকের প্রয়োজন, কিন্তু লেখক সংখ্যা যথেষ্ট না থাকিলে দুই-একজন উৎসাহীর উপরই সমস্ত ভার আসিয়া পড়ে যাহাতে ক্রমান্বয়ে পত্র চালাইবার সময় ও সুবিধা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে। ইহা বঙ্গদর্শনের যুগে যেমন সমস্যা ছিল, এখনও তদ্রূপ। দ্বিতীয়, পত্রের মূল্য বেশী হইলে বহু পাঠকের সাধ্যাতীত হয় এবং সে অসুবিধার উল্লেখ বঙ্কিম করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদর্শনের যুগে তাহা যথার্থই ঘোরতর সমস্যা ছিল। তৃতীয়, পাঠকবর্গের ও পাঠকশ্রেণীর জ্ঞান, অনুরাগ ও বুঝিবার শক্তি। বঙ্কিম উপরে উল্লেখ করিয়াছেন যে অনেক পাঠকের নিকট বঙ্গদর্শন 'কঠিন' বলিয়া মনে হইত। সাধারণ পাঠকের বিদ্যা-বুদ্ধির উৎকর্ষ বঙ্গদর্শনের যুগে বিশেষ ছিল না। বঙ্গদর্শন যে শুধু 'কঠিন' বলিয়া তখন মনে হইত তাহা নহে, ইহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গির ও অভিনব পদ্ধতির সহিত যথেষ্ট পরিচয় ছিল সময়সাপেক্ষ। সে যুগে পত্রিকায় বা সাহিত্যে শুধু গল্প, কাহিনী বা পুরাণের কথা পড়িতে পাঠকবর্গ অভ্যস্ত ছিলেন। তাহাদের পক্ষে বঙ্কিমের লেখায় সমৃদ্ধ বঙ্গদর্শন 'কঠিন' বলিয়া মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কারণ বঙ্গদর্শনে অন্য অনেক বিষয় ছিল যাহা পাঠ করিতে ও বুঝিতে যথেষ্ট চিন্তা ও বুদ্ধিশক্তির প্রয়োজন ছিল। ইহা গল্প পড়ার মতন তরল পাঠ্য ছিল না বা শুধু অবসর বিনোদনের বিলাসমাত্র ছিল না। ইহা শিক্ষার ও চিন্তার যন্ত্র ছিল। বঙ্গদর্শন পাঠের অভ্যাস, চিন্তাধারার ও জ্ঞানের বিকাশের বহু পথ নূতন করিয়া খুলিয়া দিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও ইহার গ্রাহক সংখ্যা অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকায় ইহাই প্রমাণ করিয়াছিল যে, বঙ্কিম

তাঁহার কার্যে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনের অন্তর্ধানে সেইজন্য বঙ্কিম লিখিয়াছেন :

'আমার যে সকল উদ্দেশ্য ছিল তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।'

দেশ প্রকৃত সমালোচনা বিশেষ করিয়া সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃত মর্ম তখন বুঝিত না। সমালোচনা যতই নৈর্বক্তিক হউক না কেন, আমাদের জাতীয় প্রকৃতি এমনি যে সকল সমালোচনাকেই আমরা ব্যক্তিগত আক্রোশের চক্ষে দেখি। ফলে, যথার্থ নিভীক সমালোচনার ক্ষেত্র দেশে সঙ্কীর্ণ। বঙ্কিম যে-যুগে 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা-সাহিত্যের পথ পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে যুগে এই ক্ষেত্র আরও সঙ্কীর্ণ ছিল। সেই কারণে বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় বহু লোক বঙ্কিমের শত্রু হইয়াছিলেন। ইহাই বঙ্কিম উপরোক্ত কথায় বলিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করিয়াছেন।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের একান্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। বঙ্গদর্শনের পুনরুজ্জীবন স্থির হইল কিন্তু এইবার তাহার সম্পাদনার ও পরিচালনার ভার পড়িল সঞ্জীবচন্দ্রের উপর। পুনরায় ১২৮৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, ইংরাজী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন পুনঃপ্রকাশিত হইয়া চলিতে লাগিল। যদিও বঙ্কিম সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলেন এবং এমনকি স্বত্ব পর্যন্ত সঞ্জীবচন্দ্রকে দান করিলেন, তথাপি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :

সঞ্জীববাবুর সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন আবার বাহির হইল, তবে বঙ্কিমবাবুই কার্যতঃ উহার সর্বময় কর্তা। তিনি নিজে ত লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখাও পছন্দ করিয়া দিতেন। অন্যকে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতেন। অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন, পূর্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, তেমনি চলিতে লাগিল।

ইহার সমর্থন বঙ্কিমের নিজের উক্তি হইতে পাওয়া যায়। বঙ্কিম 'সঞ্জীবনী সুধায়' লিখিয়াছেন :

'ভ্রমর' লোকান্তরে উড়িয়া গেল, আমিও ১২৮২ সালে বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে, তিনি (সঞ্জীবচন্দ্র) আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্বেও আমার সম্পাদকতার সময়ে বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণই রহিল। অনেক নূতন লেখক যাঁহারা এখন খুব প্রসিদ্ধ, তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকান্তের উইল,

রাজসিংহ, আনন্দমঠ, ও দেবীচৌধুরানী তাঁহার সম্পাদকতা কালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে ইহা বলা চলে যে বঙ্গদর্শন প্রায় দশ বৎসর কাল চলিয়াছিল, ইংরাজী ১৮৭২ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ অবধি অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১২৭৯ হইতে ১২৮৯ অবধি। এই দশ বৎসরের ভিতর ১২৮২ বঙ্গাব্দে বঙ্গদর্শন কিছুকাল, প্রায় এক বৎসর মত বন্ধ ছিল। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই বঙ্গদর্শন বাংলা সাহিত্যের রূপ আমূল পরিবর্তন করিয়া দিল। বিখ্যাত সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় এই বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :

সকলেই বঙ্গদর্শনের সম্পাদককে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা করিত, ভয় করিত, সম্মান করিত—স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান গবেষণার প্রভাবে, সর্বোপরি পক্ষপাতশূন্যতা ও সাহিত্যের উন্নতির ঐকান্তিকী কামনাবশতঃ বঙ্গদর্শন একদিন এইরূপ রাজার ন্যায়ই ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম জানিতেন যে বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইবে না। তাহার কারণ শুধু সাময়িক তাহা নহে। তাঁহার দূরদৃষ্টিতে তিনি তাহা প্রারম্ভেই দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিম স্বয়ং বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বলিয়াছেন :

কালস্রোতে সকলই জলবুদ্বুদ মাত্র। এই বঙ্গদর্শন কালস্রোতে নিয়মাধীন জলবুদ্বুদের ন্যায় ভাসিল। নিয়মবলে বিলীন হবে। অতএব ইহার লয়ে আমরা পরিতাপযুক্ত ও হাস্যাস্পদ হইব না। ইহার জন্ম কখনই নিষ্ফল হইবে না।

এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। বঙ্গদর্শনের জন্ম নিষ্ফল হওয়া তো দূরের কথা, ইহার প্রভাব সমাজে, সাহিত্যে ও রাষ্ট্রে কি সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'আধুনিক সাহিত্যে' জাজ্বল্যমান অক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন এই বলিয়া :

যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতন আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল, তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? ইউরোপের দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না,

এমন কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজী শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল—বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। বিশ পঁচিশ বৎসর পরে দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত। বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। বঙ্গদর্শনের প্রভাবে শিক্ষিত লোকে বাংলাভাষায় ভাব প্রকাশের জন্য স্থায়ী উৎসাহী হইয়া উঠিল, বুঝিল স্থায়ী সাহিত্য একমাত্র বাংলাভাষায় সম্ভব। বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতন 'সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনিঃ' এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী ও পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।

বঙ্গদর্শনের প্রভাব শুধু সাহিত্যে নহে। চিন্তায় ও চেতনায় বঙ্গদর্শন নূতন ভাব ও নূতন আদর্শ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে আসন্ন সমরে প্রস্তুত করিয়াছিল।

সেই কারণেই বোধ হয় বঙ্গদর্শন পুনরায় চালাইবার জন্য আর একটি শেষ চেষ্টা হয়। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় নাই। দ্বিতীয়বার বঙ্গদর্শন বন্ধ হইবার বহু বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সঞ্জীববাবুর পুত্র জ্যোতিষের সম্মতি লইয়া রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন পুনরুজ্জীবিত করেন। কয়েক বৎসর চলিয়া ইহা আবার বন্ধ হয়। এমনকি ১৩৬১ বঙ্গাব্দে, ইংরাজী ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও সুধীরকুমার মিত্র মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন আবার কিছুকাল বাহির হইয়াছিল এবং তাহাতে বঙ্কিমের অপ্রকাশিত শেষ উইল প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও স্থায়ী হয় নাই। প্রতি যুগ, প্রতিটি কাল তাহাদের নিজের একটি প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা লইয়া আসে, এবং তাহা যখন উত্তীর্ণ হয় তখন আর তাহার আবশ্যকতা থাকে না। বঙ্গদর্শন সম্বন্ধেও তাহা সত্য। ইহা সত্য জানিয়াই বঙ্কিম নিজে পূর্বোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য উদ্যানে যে বহুবিধ পত্রিকা ও সমালোচনা বর্তমানে গৌরবের বিষয়, তাহাও বঙ্গদর্শনের প্রচেষ্টায় অক্ষয় অমৃত ফল। বঙ্গদর্শন অমর, তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে মাত্র।

১৩

॥ বঙ্কিম ও রাজনীতি ॥

আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। যদি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ভারত না শুনিত, তাহা হইলে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কি রূপ লইত তাহা কল্পনা করা কঠিন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ও স্বদেশী আন্দোলনের অনির্বাণ অগ্নি কোথা হইতে আসিত? জাতীয় কংগ্রেস কাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইত? কে শ্রীঅরবিন্দ ও সুরেন্দ্রনাথকে স্বাধীনতাযুদ্ধে দীক্ষিত করিত? কাহার মুখের মন্ত্র লইয়া, কাহার মুখ চাহিয়া লালা লাজপত রায়, গোখলে, মহাত্মা গান্ধী জাতিগঠনে প্রবৃত্ত হইতেন? জাতিগঠনে, স্বাধীনতা আন্দোলনে, জাতীয় কংগ্রেসকে সৃষ্টি করিতে ও উদ্দীপনা দিতে, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে ও জাগরণে, প্রধান ও অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্র। বঙ্কিমের আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম, বঙ্কিমের দিবস-গণনা ও আমার দুর্গোৎসব—সকলই এই আন্দোলনে প্রেরণা যোগাইয়াছে। জাতীয় আত্মচেতনা সৃষ্টির মূলে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যেমন ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক ছিলেন 'রুসো', তেমনি ভারতীয় বিপ্লবের ও স্বাধীনতা আন্দোলনের দার্শনিক ছিলেন বঙ্কিম। যেমন 'রুসো'কে বাদ দিয়া ফরাসী বিপ্লব কল্পনা করা যায় না, তেমনি বঙ্কিমকে বাদ দিয়া ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন কল্পনাতীত।

যে-সকল প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় জাগরণে সহায়তা করিয়াছিল তাহাদের অগ্রণী ছিল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়া লিগ' এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্'। বঙ্কিম ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের এবং তাহাদের নেতাদের বিশেষ সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও তাঁহার 'বন্দেমাতরম্' সমগ্র দেশে জাতির ভিতরে এক নূতন জাগরণ ও নূতন প্রাণের জোয়ার আনিয়াছিল। তাঁহার প্রেরণায় জাতীয়তার এক বিরাট তরঙ্গস্রোত যেন সমস্ত বন্ধন ভাঙিয়া সারা দেশে প্লাবন আনিয়া দিল। বঙ্কিমের ভবিষ্যদ্বাণী : 'বন্দেমাতরম্' সমস্ত দেশে আগুন জ্বালাইবে—তাহা সত্যে পরিণত হইল। নবযুগের নূতন চেতনায় রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির জন্য ভারত

ও বাংলা প্রস্তুত হইল। সাহিত্যশিল্পী বঙ্কিম নবরূপে নবরাষ্ট্রশিল্পীর ভূমিকায় আবির্ভূত হইলেন। জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চলিতকথায় 'পলিটিসিয়ান্' ছিলেন না। রাজনীতি তাঁহার নিকট ধর্মনীতির ও সমাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; যেমন তাহা ছিল মনুর মনুসংহিতায়। দেশপ্রেম বঙ্কিমের নিকট ছিল ধর্ম। ভারতবর্ষে যাহার ভিত্তি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এমন কোন নীতি, এমনকি রাজনীতি স্থায়ী হয় নাই। ইহাই ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষা। ইহাই বঙ্কিমের রাজনীতি। পরবর্তীযুগে মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতি ইহারই ভিন্নরূপ প্রকাশ।

এই রাজনীতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমের মতে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যসাধন। সেই ঐক্যসাধনের প্রথম মন্ত্র বঙ্কিম দিয়াছিলেন তার 'বন্দোমাতরম্' সংগীতে। সেই মন্ত্র কি জাতীয় সম্মেলনে, কি সাহিত্য সভায়, কি সভ্যতার ও কৃষ্টির কোন আয়োজনে, ভারতের সর্বত্র কোটি কোটি কণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হইল—

'ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে
দ্বিত্রিংশ কোটি ভুজৈধৃত খর করবালে
অবলা কেন মা এত বলে।'

তাই আনন্দমঠে মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল 'এত কালী নয়, দুর্গা নয়, এত দেশ।' ভবানন্দ উত্তর করিলেন—'আমরা অন্য মা জানি না' এবং গাহিতে লাগিলেন :

'বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'।

ভবানন্দ আরও পরিষ্কার করিয়া এই স্বদেশ কি তাহা বুঝাইতেছেন :

জন্মভূমিই আমাদের জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, তিনিই আমাদের দুর্গা—সর্বশক্তির আধার। তাই বলি, তুমি যে হও, ভারতবাসী হইলেই মায়ের সন্তান, আমার ভাই—আর তুমি আমি সমগ্র ভারতবাসী একই জাতি। তবে এস ভাই, এই শক্তিরূপিণী গান গাহিতে গাহিতে আমরা অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই, মাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া মাতৃপূজায় আত্মনিয়োগ করি। এস মা, যুক্ত করে ডাকি, এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব,—ওঠ মা, এবার প্রকৃত আপন

ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম আলস্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ত্যাগ করিব, এসো ভাইসকল, মাকে সত্যকার আসনে প্রতিষ্ঠিত করি—সকলে এক কণ্ঠে বলি—'বন্দেমাতরম্'।

স্বদেশপ্রেম, স্বদেশপ্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের সহিত বঙ্কিম প্রথম ধর্মের সংযোজনা করিলেন, যাহার ফলে ভারতীয় রাজনীতি ও স্বদেশপ্রেম শাশ্বত সত্য ও সার্বজনীন মানবতার সহিত এক ও অভিন্ন হইল এবং বেদ উপনিষদ ও ভারতীয় কৃষ্টির ও সভ্যতার সহিত সমতানে যুক্ত হইয়া ঝঙ্কৃত হইল। বঙ্কিমের রাজনীতির ইহাই শ্রেষ্ঠ ও অমূল্য দান। সেই কারণে তিনিই ভারতীয় জাতির প্রকৃত জনক। বঙ্কিম আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রগুরু। বঙ্কিমের এই মর্মস্পর্শী বাণী স্বামী বিবেকানন্দকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কথায় বঙ্কিমের ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন :

হে বীর—সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। আর বল জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর—আমায় মানুষ কর।

স্বদেশকে বঙ্কিমই প্রথম 'মা' বলিতে শিখাইলেন। তিনি স্বদেশপ্রেমকে ধর্মে রূপান্তরিত করিলেন। বঙ্কিমই জাতীয় ঐক্য গঠনের ও সংরক্ষণের স্থায়ী ভিত্তি প্রথম স্থাপনা করিলেন। ইহাই প্রকৃত রাষ্ট্রধর্ম ও যথার্থ রাজনীতি। প্রেম, সেবা, স্বার্থত্যাগ ও ভক্তির দ্বারা এই ভিত্তিকে বঙ্কিম দৃঢ় করিলেন। তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্কিম সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 'তিনি আমাদের আচার্য, তিনি আমাদের ঋষি, তিনি আমাদের মন্ত্রকৃৎ, তিনি আমাদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সে মন্ত্র—বন্দেমাতরম্।'

ভারতীয় জাতির ঐক্য ও সংহতি ছিল বঙ্কিমের ধ্যান ও স্বপ্ন এবং তাঁহার রাজনীতির প্রধান উৎস। কমলাকান্তে ইহার উজ্জ্বল প্রকাশ। বঙ্কিম স্বয়ং কমলাকান্ত। সুতরাং স্বদেশ সম্বন্ধে কমলাকান্তর কথা বঙ্কিমেরই কথা। বঙ্কিম প্রথম এই কমলাকান্তর ভিতর দিয়া জাতীয়তার ও স্বদেশপ্রেমের বাণী দেশকে শুনাইয়াছিলেন। কমলাকান্তর প্রসিদ্ধ 'দিবস গণনা' প্রবন্ধে বঙ্কিম বলিতেছেন :

গনি, আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৬ হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গুণি। যেদিন সপ্তদশ

অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছে, সেইদিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গনিব। দিন গনিতে গনিতে মাস হয়, মাস গনিতে গনিতে বৎসর হয়, বৎসর গনিতে গনিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দী ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গনি। কই অনেক দিবসে মনের মানস, বিধি মিলাইল কি? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই, ঐক্য কই, বিদ্যা কই, গৌরব কই, শ্রীহর্ষ কই, ভট্টনারায়ণ কই, হলায়ুধ কই, লক্ষ্মণ সেন কই, আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মেলে, কমলাকান্তর কি মিলিবে না?

বঙ্কিমের এ কিসের প্রতীক্ষা? ইহা ভারতীয় স্বাধীনতার ও ঐক্যের প্রতীক্ষা। গভীর নিশীথে জগতের স্তব্ধ অন্ধকারে যখন সকলে নিদ্রায় আচ্ছন্ন, বঙ্কিম তখন নিষ্পলক নয়নে সদাজাগ্রত সংযমী ঋষির ন্যায় কি উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন? কি তাঁহার 'মনের মানস'? বঙ্কিমের মনের মানস ঐক্যবদ্ধ সংহত স্বাধীন ভারত।

বঙ্কিমের এই ভাবাবেগই কমলাকান্তের কথায় স্পষ্টতর রূপ ধারণ করিয়াছে। তিনি বলিতেছেন :

আর বঙ্গভূমি, তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিলাম না। তোমায় সুবর্ণ আসনে বসাইয়া, হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকায়, মিশরে, চীনে, লোকে দেখিত তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি।

দেশকে এমন নিকট করিয়া পাওয়া, এত প্রিয় করিয়া দেখা, তাহাকে এত স্নেহের ও গর্বের সঙ্গে বোঝা, ইহা বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রথম ও অতুলনীয়। বঙ্কিমের প্রতি ছত্রে, তাঁহার প্রতি শিরা-উপশিরায় এই হৃদয়াবেগ প্রবাহিত। বঙ্কিম-সাহিত্যের মূলমন্ত্র ও মূল ভাব হইল এই স্বদেশপ্রেম। বঙ্কিমের এই স্বদেশপ্রেম যে বুঝিবে না, সে তাঁহার রাজনীতি বুঝিবে না। তাই বঙ্কিমের কমলাকান্ত দুঃখ করিয়াছে যে তাহার মনের কথা বলা হইল না। কমলাকান্ত বঙ্কিমের নিজের কথাই বলিতেছে 'কমলাকান্তর মনের কথা এ জন্মে বলা হইল না। যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই, অমানুষী ভাষা পাই, নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি।' বঙ্কিমের এই 'মনের কথা' স্বাধীন ভারতের কথা, তাহার জাতীয়তার ঐক্যের ও সংগঠনের কথা, সমাগত কিন্তু তখনও অঘোষিত ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনীতির কথা।

এই 'মনের কথা' কমলাকান্ত আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে তাহার 'দুর্গোৎসবে'। এইখানে দেশমাতৃকার জাজ্জ্বল্যমান স্বরূপ বর্ণনা আছে। মনে হইবে যেন কমলাকান্ত ভবিষ্যৎ ভারতের রূপ ও রাজনীতি বর্ণনা করিতেছে :

'রত্নমণ্ডিতা দশভুজ দশদিকে প্রসারিত। তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরজন কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত'। 'মা' যাহা হইবেন তাহা বর্ণনা করিতে করিতে কমলাকান্ত বলিতেছে :

'দিগভুজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুবিমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।'

বন্দেমাতরমে এই রূপই সঙ্গীতে মুখরিত হইল 'ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী, কমলা কমলদল বিহারিণী, বাণী বিদ্যাদায়িনী।'

এই মূর্তিই বঙ্কিম দেশকে ও জগতকে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। শুধু রূপ বর্ণনায়ই বঙ্কিম ক্ষান্ত হন নাই। তাহা পাইতে হইলে কি করিতে হইবে, তাহার উপায় তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। রাজনীতির এক ভাগ দর্শন এবং আর এক ভাগ কার্যতন্ত্র। ভাবপ্রবণ ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া বাঙালী অনেক ক্ষেত্রে দর্শন ও যুক্তি লইয়া ব্যস্ত হইয়া কার্যতন্ত্র উপেক্ষা বা অবহেলা করে। এই মনোভাবের ফলে বহু সুন্দর দর্শন ও অকাট্য যুক্তি বাস্তবক্ষেত্রে ভাসিয়া গিয়াছে। যখন প্রশ্ন হইল এই 'মা' কবে প্রকাশিত হইবেন, তখন আনন্দ-মঠের সত্যানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন—'যখন মায়ের সকল সন্তান মা বলিয়া ডাকিবেন।' সেই জাতীয় ঐক্য বঙ্কিমের নবভারতের ভিত্তিস্বরূপ। সেই ভিত্তির জন্য প্রয়োজন আত্মোৎসর্গের। কমলাকান্ত 'আমার দুর্গোৎসবে' তাই আবার বলিতেছে—'না হয় ডুবিব। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?'

সন্তানের সেবা, আত্মত্যাগ, সংযম, সাধনা, বীর্য, শৌর্য, নিষ্ঠা, প্রেম, শৃঙ্খলা ও কর্ম হইতেছে বঙ্কিমের রাজনীতির উপকরণ, উপায় ও মাধ্যম। স্বদেশপ্রেম সেই রাজনীতির প্রাণ। সে রাজনীতিতে দেশ বড় না দল বড় এ প্রশ্ন নাই। সেখানে স্বদেশপ্রেম শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

বঙ্কিমের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ভারত হইবে সকলের আশ্রয়, 'ধরণীম্, ভরণীম্, সুস্মিতাং, ভূষিতাম্'। যাহাকে দেখিয়া সকল বিশ্ব আশ্বস্ত হইবে, চীন, মিশর, ইউরোপ, আমেরিকা পূজা করিবে। বঙ্কিম বলিতেছেন 'কত দেশী, বিদেশী, ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামী দিবে। কত দীন দুঃখী প্রসাদ

খাইয়া উদর পূরিবে।' পরবর্তী যুগে ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' বলিয়াছেন।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেম ইংরাজী 'পেট্রিয়টিজম' নহে। ইহা পরের দেশ ও সমাজ লুণ্ঠন করিয়া নিজের দেশ ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি করা নহে। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য অন্য জাতির ও দেশের সর্বনাশ করিব—তাহা বঙ্কিমের স্বদেশপ্রেম নহে। বঙ্কিম শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন; প্রয়োজনে যুদ্ধ কর্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিতেন। বঙ্কিমের রাজনীতির সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মরক্ষা প্রধান ধর্ম, তাহার চেয়ে বড় ধর্ম স্বজনরক্ষা এবং সবচেয়ে বড়ো ধর্ম হইল দেশরক্ষা। সেই দেশরক্ষার জন্য যেমন আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন, তেমনি বাহুবলের প্রয়োজন। এই দুই শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারই বঙ্কিমের স্বদেশ প্রেম ও ধর্ম। এই দুই শক্তি রক্ষা করিবার জন্য যে যুদ্ধ তাহাই বঙ্কিমের মতে ধর্মযুদ্ধ এবং তাহা সকলের অবশ্য পালনীয় ও রাজনৈতিক কর্তব্য। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের রাষ্ট্রনীতি ও ভারতের আদর্শ। এই রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানের যখন অভাব হয়, দেশ তখন তাহার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারায়। তখন জাতীয় চরিত্রে যে কি নৈতিক ও সামাজিক অবনতি ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় পরাধীনতায় ও দাসত্বে যে কি কুফল ও দুর্গতি হয় তাহা মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে বঙ্কিম জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত দেশবাৎসল্য যে কত বড় ধর্ম তাহা বঙ্কিম বার বার ধর্মসাহিত্যে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় ও উপন্যাসে বহুভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্কিমের রাজনীতিতে ভিক্ষাবৃত্তির ও অনুকরণ বৃত্তির কোন প্রশ্রয় নাই। আমরা যথাস্থানে এই বিষয়ে কমলাকান্তর উক্তি আলোচনা করিয়াছি। কমলাকান্ত কিভাবে এই প্রবৃত্তির উপর কশাঘাত করিয়াছিল নীচে তাহার আর একটি উদাহরণ দেওয়া হইল। কমলাকান্ত দেখিতেছে—কতকগুলি সাহেব দোকনদার ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারীফল বিক্রয় করিতেছে।

'দোকানদার ডাকিতেছে—আয় কালা বালক—এক্সপেরিমেণ্টাল সায়েন্সের ঘুষি খাবি আয়। দেখ এক নম্বর এক্সপেরিমেণ্টাল ঘুষি, ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে—এবং হাত ভাঙে। আমরা এসকল এক্সপেরিমেণ্ট বিনা মূল্যে দেখাই।'

তখনকার যুগে বাঙ্গালী যুবক নূতন পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া মহা

সমারোহে সদলবলে আমলাতন্ত্রে যোগ দিয়া চাকুরী ও কেরাণীর দ্বারা ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত। এই দাস-মনোবৃত্তির মূলে আঘাত করিয়া বঙ্কিম একদিকে ইংরাজশাসনের ভিত্তি যেমন শিথিল করিয়াছিলেন, অন্যদিকে জাতীয় চেতনার নব উন্মেষের পথও দেখাইয়াছিলেন। বঙ্কিমের এই দৃষ্টিভঙ্গি দেশের পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনকে সার্থকতার পথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল।

বঙ্কিম পাইয়াছিলেন বহু শতাব্দীর নিদ্রামগ্ন এক দেশ ও তাহার অচেতন আত্মবিস্মৃত এক জাতি। বঙ্কিমের রাজনীতি ভারতের সেই নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিল, জাতিকে তাহার চেতনা ও স্মৃতি ফিরাইয়া দিয়াছিল। এই যে রাজনীতি, যাহা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিল, তাহার নীতি ও কৌশল ছিল অভিনব এবং তখনকার দিনে অভাবনীয়। বঙ্কিমের রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য এই ক্ষেত্রে ছিল ইংরাজশাসনের উজ্জ্বল মূর্তিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা। ইংরাজ শাসনের মূল নীতি ছিল শাসিতের নিকট সেই শাসনের রূপ ও চিত্র এমন-ভাবে অতিরঞ্জিত করিয়া লোকচক্ষুতে তুলিয়া ধরা যাহাতে তাহার শক্তির ও স্পর্ধার মাহাত্ম্য জনমনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারে। ইহার কৌশল ছিল ইংরাজের সব কিছুই মহৎ ও বিরাট; ইংরেজী ভাষা, ইংরাজী আচার ব্যবহার, ইংরাজী আহার-বিহার, ইংরাজী সামাজিকতা, ইংরাজের শাসন, ইংরাজী শিক্ষা—সবই ভারতীয়দের তুলনায় শতগুণে ভাল। ইংরাজশাসকগণ মনে করিয়াছিল যে ইহার ফলে ভারতবাসী ভালবাসায় না হউক, অন্ততঃ ভয়ে ইংরাজ শাসনকে সমর্থন করিবে। বঙ্কিম তাহা বুঝিয়া ইহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। যে-বিগ্রহ ইংরাজ ছলে-বলে কৌশলে গড়িয়া তুলিতেছিল, বঙ্কিম তাহাকে ছারখার করিয়া দিয়াছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইহা বঙ্কিমের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। রাজা যখন প্রজার সকল শ্রদ্ধা হারায় তখন সেই রাজত্বের পতন অবশ্যম্ভাবী। বঙ্কিমের এই রাজনীতি ইংরাজ রাজত্বের পতনের এক প্রধান কারণ। জাতীয় আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে এই মানসিক বিদ্রোহ যে কতদূর সুদূর প্রসারী হইয়াছে, তাহা বহু আধুনিক রাষ্ট্রনায়কেরা বিস্মৃত হইয়াছেন। যাঁহারা বঙ্কিমের প্রসিদ্ধ 'ইংরাজস্তোত্র' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন কিভাবে কি তীব্রভাষায় বঙ্কিম দাসমনো-বৃত্তির উপর কশাঘাত করিয়াছেন এবং ইংরাজ বিগ্রহ কিভাবে দেশের সমক্ষে ধূলিসাৎ করিয়াছেন। বঙ্কিমের রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি হতাশা-জর্জরিত আবিল আবহাওয়া ভেদ করিয়া যেন বিশ্লেষণের প্রখর আলোক সম্পাতে ভারত-

বাসীর ভিতরে নূতন চেতনার ও প্রাণের সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্কিম 'ইংরাজ স্তোত্রে' বলিতেছেন :

হে ইংরাজ। আমি তোমাকে প্রণাম করি। হে বরদ! আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব, তুমি আমায় চাকুরী দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমাকে খোসামদ করিব; তোমায় প্রিয় কথা কহিব, তোমার মনরাখা কাজ করিব, আমায় বড় কর। আমি তোমায় প্রণাম করি।

হে মানদ! আমায় টাইটেল দাও, খেতাব দাও, খেলাত দাও, আমাকে তোমার প্রসাদ দাও, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে ভক্ত বৎসল! আমি তোমার পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, তোমার কর-স্পর্শে লোকমণ্ডলে মহামানাস্পদ হইতে বাসনা করি। তোমার স্বহস্ত লিখিত দুএকখানা পত্র বাক্সমধ্যে রাখিবার স্পর্ধা করি। অতএব হে ইংরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

আমি তোমার ইচ্ছামত ডিস্‌পেনসারী করিব, তোমার প্রীত্যর্থে স্কুল করিব, তোমার আজ্ঞামত চাঁদা দিব।

হে সৌম্য! যাহা তোমার অভিমত আমি তাহাই করিব, আমি বুট, পেণ্টুলেন পরিব, নাকে চশমা দিব, কাঁটা চামচ ধরিব, টেবিলে খাইব।

হে মিষ্টি ভাষিণ! আমি মাতৃভাষা পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব, পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম অবলম্বন করিব, বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টার লিখাইব। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

হে ভগবন্! আমি আকিঞ্চন, আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও, আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি মনে রাখিও।

পরাধীন জাতির দাস্য মনোবৃত্তির এই যে পূর্ণাঙ্গীণ চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সমকালীন সাহিত্যে আর কোথাও নাই। ইহা কেবল বর্ণনা মাত্র নহে। ইহার প্রতি বাক্য, প্রতি পরিচ্ছেদ বঙ্কিমের রাজনীতি ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় বহন করে। পরাধীন জাতির মানসচিত্র, তাহার চিন্তার ও কর্মের ধারা ও তাহার ব্যাপক অধোগতি ইহার প্রতি বর্ণে প্রতি ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম তাঁহার এই বিখ্যাত 'ইংরাজ স্তোত্রের' দ্বারা শাসকগণ যে মূর্তি ভারতবাসীর অন্তরে গড়িয়া তুলিতেছিল এবং যাহার দ্বারা শাসিতের শ্রদ্ধা অর্জন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা চিরতরে

ভাঙিয়া দিলেন। নবজাতি, নূতন জাতীয় চেতনা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার-বোধে চালিত হইয়া, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন করিয়া স্বাধীন ও স্বাবলম্বী স্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য এই স্তোত্রের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল।

পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের চিন্তাই শুধু বঙ্কিমের সমগ্র রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নাই। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তার প্রথম স্তর মাত্র। কেবলমাত্র বিপ্লবের দ্বারা রাজনীতি সম্পূর্ণ হয় না। বিপ্লব ও বিদ্রোহই রাজনীতির শেষ কথা নহে। বঙ্কিম স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে বিদ্রোহ করে শুধু বিদ্রোহের জন্য, সেইরূপ বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। আনন্দমঠের শেষ অধ্যায়ে এই কথা পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে। আনন্দমঠে বঙ্কিম বলিয়াছেন, 'তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ, পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না।' দেবী চৌধুরানীতেও প্রফুল্ল বলিয়াছে, 'তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুতঃ পরপীড়ন। ঠেঙ্গালাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না।'

এই কারণে বঙ্কিমের রাজনীতি বিপ্লবসর্বস্ব নহে। তাঁহার রাজনীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য তিনি 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আছে সুগভীর রাজনৈতিক দৃষ্টি, মর্মস্পর্শী ও বহু যুক্তিসমন্বিত আলোচনা। বঙ্কিম সেখানে বলিতেছেন :

'শাসনকর্তা ভিন্নজাতীয় হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে শাসন কর্তা স্বজাতীয় হইলেই রাজ্য স্বতন্ত্র হয় না।'

ইহা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নবীন রাষ্ট্রীয় তত্ত্ব ও মৌলিক চিন্তা। এই প্রশ্ন বর্তমানে বিশেষ ভাবিবার ও চিন্তা করিবার বিষয়। বিজাতীয় শাসককে বিতাড়িত করাই কি প্রকৃত রাজনৈতিক স্বাধীনতা? স্বজাতীয় শাসনই স্বাধীনতার প্রকৃত ও সমগ্র রূপ ও পরিচয় নহে। বঙ্কিমের এই যে উক্তি : শাসন-কর্তা বিজাতীয় হইলেই যে রাজ্য পরতন্ত্র হইল না—তাহার সমর্থনে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজশাসন সত্ত্বেও ভারতীয় আদর্শ, ধর্ম ও মানুষ, তাহার চরিত্র জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, সাহিত্য ও শিল্প উন্নত করিবার সক্ষমতা ও সুযোগ সম্পূর্ণ হারায় নাই। ইতিহাসে বহু ক্ষেত্রে এইরূপ বিপর্যয় ঘটিয়াছে যে, স্বজাতীয় শাসনসত্ত্বেও রাজ্য যথার্থ স্বতন্ত্র হয় নাই এবং সেই সকল উদাহরণ বঙ্কিমের এই সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন করে।

রাষ্ট্রনীতির আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যে সেই

স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ দেখাইয়াছেন। ইহাই তাঁহার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। এক দিক দিয়া এই স্বাধীনতার অর্থ বাহিরের অধিকার ও অত্যাচার হইতে স্বাধীনতা। ইহাকে বঙ্কিম বলিয়াছেন 'বহিঃ-স্বাধীনতা'। কিন্তু বঙ্কিম বলিয়াছেন স্বাধীনতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যাহাকে তিনি বলিয়াছেন 'অন্তঃ-স্বাধীনতা।' সেই অন্তঃ-স্বাধীনতার অর্থ এই যে, দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী লোকের হাত হইতে জনসাধারণের স্বাধীনতা। ইহার তাৎপর্য কত গভীর তাহা বঙ্কিমের সময় লোকে বুঝে নাই; কিন্তু কালের গতিতে, বিশেষ করিয়া বর্তমান যুগে ইহা ক্রমশই পরিষ্কার হইতেছে। এই উভয় স্বাধীনতাই ছিল বঙ্কিমের রাজনীতি, তাঁহার রাষ্ট্র-চিন্তা ও সাধনা। এই অন্তঃ-স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা আদর্শ ও ভাষার উপর তিনি জনসাধারণের ও চিন্তানায়কগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোকই নিজের দেশে পরবাসীর ন্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বঙ্কিমের রাজনীতিতে ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে বরং যথার্থ স্বরাজ্যের অন্তরায়। যতদিন না এই ব্যবধান ও মনোবৃত্তি দূর হইতেছে ততদিন যথার্থ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য আসিবে না এবং প্রকৃত পক্ষে আসল পরতন্ত্রতা দূর হইবে না। যে পরতন্ত্রতা স্বজাতীয় শাসনের ভিতর লুক্কায়িত থাকে তাহা সূক্ষ্ম, আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য ও অশরীরী, কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় তস্করের ন্যায় তাহাই সকল স্বাধীনতা অপহরণ করে। এই অপহরণ যখন চলিতে থাকে, তাহা এতই নিঃশব্দে, নীরবে ও অলক্ষ্যে হইয়া থাকে যে সাধারণ দেশবাসী তাহা বুঝিতে পারে না এবং যখন বুঝিতে পারে, তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই অমূল্য স্বাধীনতা অন্তর্ধান করিয়াছে।

বঙ্কিমের রাজনীতিতে বর্তমান যুগের নিরামিষ ও তথাকথিত অহিংসনীতি ছিল না। অন্যের হিংসা করা বঙ্কিম সমর্থন করেন নাই বটে, কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদা ও আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ও বিদ্রোহ দুই-ই তিনি রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। যে অপকৃষ্ট ধর্ম পড়িয়া পড়িয়া মার খাওয়াকে, অপমান সহ্য করাকে, দুঃখদারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা নীরবে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করাকে নৈতিক পরাকাষ্ঠা বলিয়াছে তাহাকে বঙ্কিম বলিয়াছেন পাপ ও অধর্ম। মধুমক্ষিকা ভ্রমর যে কথা কমলাকান্তকে বলিয়াছিল, তাহা শুধু ভ্রমর গুঞ্জন নহে; ইহার ভিতর বঙ্কিম নির্দেশ দিতেছেন যে কিভাবে দেশে বলিষ্ঠ রাজনীতি গড়িয়া উঠিবে। ভ্রমর কমলাকান্তকে বলিতেছে :

বাঙালী হইয়া কে ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া? কোন বাঙালীর ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া কি অন্য ব্যবসা আছে? কেহ বা মনে করেন ঘ্যানঘ্যানানির চোটে দেশ উদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জমা করিয়া ঘ্যানঘ্যান করিতে থাকেন। তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত, তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যানঘ্যান করি না,—মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান মধু সংগ্রহ করিতে, না জান হুল ফুটাইতে, কেবল ঘ্যানঘ্যান কর। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ। বাক্যবাণে মানুষ মরে না, আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা সশঙ্কিত। স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্তে ইংরাজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল। মধু সংগ্রহ করিতে শেখ, হুল ফোটাইতে শেখ—তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

অভিযোগ করিয়া, দরখাস্ত করিয়া, সভামঞ্চে ও গৃহপ্রাঙ্গণে বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ ও ঈর্ষা বাড়াইয়া, রাস্তায়-ঘাটে শোভাযাত্রা বাহির করিয়া রাজনীতি হয় না। ইহা হইল বঙ্কিমের কথায় 'ঘ্যানঘ্যানানি'। রাজনীতির মূল কথা কর্ম, শিক্ষা, ধর্ম ও সংগঠন। বঙ্কিমের রাজনীতি সংবাদপত্রের ও বেতারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন নহে। এই রাজনীতির ধ্যান ও আরাধ্য দেশ, দল নহে। ইহার মূল উৎস হইল স্বদেশপ্রেম। ইহার ভরসা, নির্ভর ও আশ্রয় হইল সেবা ও স্বার্থত্যাগ। ইহার তন্ত্র হইল আত্ম-সংযম। ইহার মন্ত্র হইল মানবপ্রীতি। ইহার যন্ত্র হইল সঙ্ঘবদ্ধ সন্তান-সম্প্রদায়। এই রাজনীতির বোধিতব্য হইল সমগ্র জীবনবেদ। বঙ্কিমের রাজনীতিতে যে স্বদেশ-প্রেম দেখিতে পাই তাহার পূর্ণ রূপ বঙ্কিম এই বলিয়া ধর্মতত্ত্বে বর্ণনা করিয়াছেন :

সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বজন-প্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি—এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।

বঙ্কিমের রাজনীতি তাঁহার ধর্মতত্ত্বের ও সমাজতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমের রাজনীতির প্রাণ হইল ধর্ম, অবয়ব হইল সমাজ, যন্ত্র হইল রাষ্ট্র। ইহা গ্রীক দার্শনিক এরিস্‌টটল্‌ বা প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রতন্ত্র (Ideal Republic) অপেক্ষা উচ্চতর ধারণা। গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনে যে আদর্শ চরিত্র গঠন রাষ্ট্রের আদর্শ ছিল তাহার সহিত বঙ্কিমের রাষ্ট্রনীতির সহিত দুইটি বিষয়ে বিশেষ

সাদৃশ্য আছে। প্রথম, মানুষের সমস্ত সদ্‌বৃত্তির স্ফুরণের সুযোগ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। ইহা বঙ্কিম তাঁহার ধর্মতত্ত্বে, অনুশীলনে, কৃষ্ণচরিত্রে, সমাজতত্ত্বে ও রাজনীতির ব্যাখ্যায় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়, বঙ্কিমের চিন্তায় রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ আদর্শ হইল পরিপূর্ণ মানবতা—তাহাও গ্রীক আদর্শের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে এমন এক রাষ্ট্রীয় আদর্শ আছে যাহা সেই আদর্শ ও পরিপূর্ণ মানবের চিত্র বহন করে। বঙ্কিম বলিয়াছেন সার্বজনীন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি-সকল পরম পৌরুষে প্রকাশমান। বঙ্কিমের যে সমাজতত্ত্ব ও সাম্যবাদ আমরা আলোচনা করিয়াছি তাহা হইতে দেখা যাইবে যে বঙ্কিমের রাজনীতি প্রজা-তন্ত্রের ও সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ইহা বলিতে হইবে যে সেই প্রজাতন্ত্র এবং সাম্যবাদ যে পাশ্চাত্য ভাবধারার নির্বাচন বিধি ও ভোটের দ্বারা ধার্য হইবে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিম কোন বিশেষ অভিমত বা সিদ্ধান্ত দেন নাই। বেন্থাম ও মিলের রাষ্ট্রবিদ্যার সহিত বঙ্কিম সুপরিচিত ছিলেন, যদিও রাজনৈতিক বা অন্য কোনরূপ 'ইউটিলিটেরিয়ানিস্‌ম্‌' তিনি পূর্ণ সমর্থন করেন নাই। বঙ্কিমের রাজনীতির পূর্ণাঙ্গ-দর্শন অনুধাবন করিতে হইলে তাঁহার সমস্ত উপন্যাস ও সাহিত্য বিশেষ করিয়া আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজ-সিংহ, কমলাকান্ত, মুচীরাম গুড়ের জীবন চরিত এবং তাঁহার তিনখানি পুস্তক—সাম্য, ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র স্মরণ করিতে হইবে। রাজনৈতিক সকল সমস্যার উপর যে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। 'সাম্য' গ্রন্থটি তিনি নূতন সংস্করণে গ্রন্থরূপে আর প্রকাশ করেন নাই—খুব সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তাহাতে এমন অনেক প্রশ্ন ছিল যাহার যথাযথ উত্তর তিনি তখনও নিজের মনে খুঁজিয়া পান নাই। ইহাও বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রাজনীতির ও সমাজনীতির এমন অনেক অংশ আছে যাহা সকল যুগের ও সকল লোকের ও সমাজের পক্ষে স্থির থাকিতে পারে না। যেটুকু দর্শন, আদর্শ ও তথ্য তাহার কতিপয় ধারণা রাজনীতিতে, রাষ্ট্রবিদ্যায় বা সমাজনীতিতে স্থির থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার কর্মতন্ত্র, প্রকাশরীতি ও কার্যপদ্ধতি কালের গতিতে পরিবর্তিত হইতে বাধ্য। এই পার্থক্য বঙ্কিম বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই হয়ত সাম্যের পুনঃপ্রকাশ করেন নাই। স্বর্গীয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, সংস্কারের নামে যাহাতে সংহার না হয়, সেই জন্যই

বোধহয় বঙ্কিম তাঁহার সাম্যবাদ পুনরায় প্রকাশিত করেন নাই। বঙ্কিমের রাজনীতিকে কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদের ভিতর আবদ্ধ করা যায় না। চলিত কথায় তাঁহার রাজনীতি ইংরেজী ভাষার কোন ism (ইজ্‌ম্‌)-এর অনুগামী নহে। ক্যাপিটেলিজম্‌, সোস্যালিজম্‌, কম্যুনিজম্‌—এই তিনের কোন পর্যায়ে বঙ্কিমের রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, প্রজাতন্ত্র, প্রজাবাৎসল্য, প্রজানুরঞ্জন, জনসাধারণের পূর্ণাঙ্গ কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা তাঁহার রাজনীতির দর্শন ও আদর্শ। ইহার অতিরিক্ত কোন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিধির বিশিষ্ট মতবাদ বঙ্কিম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

এই রাজনীতিক মতবাদের জন্য বঙ্কিমকে অনেক সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতে হয়। তখনকার দিনের ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কর্ম বা চাকুরী করিয়া যে তিনি এই স্বাধীন রাজনীতির আদর্শ ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্বাধীনচিত্ত ও চরিত্রের বিপুল নির্ভীকতার ও সাহসের পরিচয়। ইহার জন্য তিনি ব্রিটিশ শাসকদের রোষের পাত্র হইয়াছিলেন, যাহার সুযোগ লইয়া মুচীরামের দল বঙ্কিমের কর্মক্ষেত্রে বহু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়াছিল। রাজপুরুষের রোষ বা স্বজাতির ঈর্ষা কোনটাই তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গিকে কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ বা দুর্বল করিতে পারে নাই। যেমন সাহিত্যে তেমনি রাজনীতিতে পৌরুষ ছিল বঙ্কিমের রাজতিলক।

১৪

॥ বঙ্কিমের সমাজতত্ত্ব ॥

বঙ্কিমের সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহার মূল তাঁহার সর্বাঙ্গীণ সমাজচিন্তা। সমাজসংগঠন, সমাজনীতি ও সমাজ সংস্কার তাঁহার সাহিত্যের ও জীবনের অন্যতম আদর্শ।

তাঁহার উপন্যাসের আলোচনা করিবার সময় তাঁহার উপন্যাসে যে সামাজিক চিত্র আছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। মৃণালিনীতে বঙ্গাধিকারের পরবর্তী এবং দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলায় আকবরের কালে বাংলাদেশের চারিশত বৎসর পূর্বের অবস্থার বিবরণ আছে। বিধবাবিবাহ সমাজে নিন্দিত ছিল। কিন্তু বহুবিবাহ সমাজে স্বীকৃত ছিল। ব্রজেশ্বর ও সীতারাম ইহার উদাহরণ। ধর্মের কুসংস্কার, তন্ত্রের ব্যাভিচার, যুক্তিহীন আচারের দৌরাত্ম্য—বাংলাসমাজের তৎকালীন সাধারণ অবস্থার বিবরণ আছে বিষবৃক্ষে, কৃষ্ণকান্তের উইলে, রজনীতে ও রাধারাণীতে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রযত্নে ২৬শে জুলাই তারিখে বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। আইনের সাহায্যে সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলন করা বঙ্কিমের অভিমত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সমাজতত্ত্বে, সমাজের উন্নতি সামাজিক প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার দ্বারা করাই শ্রেয়ঃ এবং তাহাতে উপকার যথার্থ হয় ও স্থায়ী হয়। বঙ্কিমের যুগ 'লেসে ফেয়ারের' যুগ, তখন আইনবলে সামাজিক উন্নতি করিবার রেওয়াজ হয় নাই। বিধবা-বিবাহ আইন লিপিবদ্ধ হইবার পর হইতে আজ শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে সাধারণ সমাজ এই আইন অন্তরের সহিত ও কার্যতঃ গ্রহণ করে নাই। বিধবাবিবাহ সমাজ গ্রহণ করে নাই এবং অতি মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিধবাবিবাহ করে কিনা সন্দেহ, এবং যে স্থলে বা ক্ষেত্রে আজ বিধবাবিবাহ হইতেছে তাহা সমাজ শ্রদ্ধার সহিত বা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করে না। যাহা পূর্বে অবৈধভাবে হইত আজ 'বৈধ' ভাবে হওয়া ছাড়া আর কোন সংস্কার এই আইনের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ন। বঙ্কিম ইহা বুঝিতে ও দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল যে আইন করিয়া এবং আইনবলে এই সংস্কার

সম্ভব হইবে না।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমের বিশিষ্ট অভিমত ছিল। ১২৮২ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিম এই বিষয় লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

> সকলেই স্বীকার করেন কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ভাল। একথা এখনও স্বীকার্য হয় নাই যে নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন কেন শিখিবে না? বঙ্গবাসী চাহিলেই তাহা হইতে পারে। কেহ বলেন সেরূপ বিদ্যালয় নাই।

কিন্তু বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশবাসী যদি সত্যই ইহা চায় তাহা হইলে তাহার উপায়ও হইবে। শিক্ষার বিষয়বস্তু লইয়া পুত্র কন্যার ভিতরে বিশেষ কোন ভেদ করা হয় তাহা বঙ্কিমের অভিপ্রেত ছিল না। তবে বঙ্কিম দুইরকম বিদ্যালয় স্থাপনের উল্লেখ করেন, একটি কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় এবং অন্যটি ছেলেদের বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রথমটি বঙ্কিম অনুমোদন করিতেন। দ্বিতীয়টি অনুমোদন করিতেন বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা নাই।

বঙ্কিমের উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্র পর্যালোচনা করিলে প্রমাণ হয় যে বঙ্কিম স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগী ও অগ্রগণ্য ছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা পড়িতে জানিতেন এবং অভিরাম স্বামীর নিকট কাদম্বরী, বাসবদত্তা ও গীতগোবিন্দ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র ও সাহিত্য পড়িয়াছিলেন। সূর্যমুখী ও কমলমণির জন্য নগেন্দ্রনাথের পিতা মিস্ টেম্পল নামে একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। রাধারাণী বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াও পুরুষের সম্মুখে আসিতেন না। মৃণালিনীর মনোরমা জনার্দন শর্মার নিকট অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আনন্দমঠের শান্তি বহু শাস্ত্র ও জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল। দেবী চৌধুরানীতে ভবানী পাঠকের প্রফুল্লকে শিক্ষাদান ও সেই শিক্ষাপদ্ধতি আমরা বঙ্কিমের নারী চরিত্রে আলোচনা করিয়াছি। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বঙ্কিম এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী শিক্ষিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হইবেন। ইহাতে বঙ্কিমের উপর বৈদিকযুগের নারীশিক্ষার আদর্শের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বঙ্কিম যে সমাজে মানুষ হইয়াছিলেন, সে সমাজে স্ত্রীশিক্ষার তখন প্রচলন ছিল না এবং ইহা হইতে লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিমের ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি অতীত ঐতিহাসিক দৃষ্টির

সঙ্গে এক মহাসূত্রে গ্রথিত হইয়া বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত হইয়াছিল।

আধুনিক যুগে জনসংখ্যার বৃদ্ধি লইয়া নানা আলোচনা ও আন্দোলন চলিতেছে। পুস্তকে, পত্রিকায় এবং প্রচারে আকাশ বাতাস আজ ভরিয়া উঠিয়াছে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার কথাবার্তায়। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে বঙ্কিম এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিমতও সুস্পষ্ট ভাষায় বঙ্গদর্শনে প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার একটি উদাহরণ এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১২৮২ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনে আষাঢ় সংখ্যায় বঙ্কিমের নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে এ বিষয়ে তাঁহার চিন্তাধারা অনুধাবন করা যায় :

১। বাঙ্গালীরা বংশবৃদ্ধিতে যেমন পটু এমন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যগণ বিধবা বিবাহের জন্য লালায়িত। অমনিই রক্ষা নাই, আর বাড়াবাড়ি কেন।

২। আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই যে, যাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নাই, তাঁহারাই, স্বয়ং বিবাহ করিতে কিংবা পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে যারপরনাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।...বাঙ্গালীদের ন্যায় নির্বোধ জাতি প্রায় দেখা যায় না। উল্লিখিত লোকসকল যে সুখে আছে তাহা নহে। নির্দয়, স্নেহহীন তাহাও নহে, কিন্তু মহাপুরুষেরা এক ভগবানের উপর মাদার দিয়া বসিয়া আছেন, আর বৎসরান্তে এক একটি কাঙ্গালী বৃদ্ধি করিতেছেন। একবার ভুলেও ভাবেন না যে, সন্তানোৎপাদন বন্ধ হইলে অনেক দুঃখ দূর হইবে।...... পৃথিবীতে পরের ক্ষতি করিলে দণ্ড হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার বুদ্ধির দোষে বা রিপু-সম্বরণের ত্রুটিতে সমস্ত সন্ততিগণকে আজন্মকাল, রুগ্নশরীরে অর্ধাশনে দিনপাত করিতে হয়, তাহার দণ্ড হয় না।

৩। ভগবান, গ্রহ, অদৃষ্ট, ইহাদের কথা যতই বল, জন্মদাতার দোষস্খলন কিছুতেই হয় না। যাঁহারা সংসার মধ্যে পদে পদে ঐশী শক্তির কার্য দেখিতে পান, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে স্ত্রী-পুরুষ আত্মসম্বরণ করিলে বংশবৃদ্ধিজনিত যন্ত্রণার লাঘব হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে আত্মসম্বরণও ঈশ্বরাধীন, সুতরাং মনুষ্যের চেষ্টাতে কিছুই হয় না। কিন্তু এ দেশের কেহ কখনও কি বংশবৃদ্ধির নিবারণের চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন?

এই আলোচনায় বঙ্কিম উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন যে অনেক সময়ে অতিশয় বংশবৃদ্ধির উদাহরণ খতাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে-ছেলেটি 'এগজামিনের সময়ে মালথসের পেপারে ৯৯ মার্ক পেয়েছিলেন—

এখানেও তার ফল হাতে হাতে'। বঙ্কিম এতই আধুনিক মনোভাব লইয়া এই প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি এমন ইঙ্গিত পর্যন্ত করিয়াছেন যে তিনটি সন্তানই একটি সংসারের সাধারণভাবে যথেষ্ট।

যদিও বঙ্কিম বংশের ও জন্মের অতিশয় বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ চাহিয়াছিলেন, ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে তিনি কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার পক্ষপাতী ছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম ও আত্মসম্বরণ এবং শাস্ত্রীয় কতকগুলি নীতিপালন ছিল বঙ্কিমের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। নানা প্রকার ঔষধ ও যান্ত্রিক উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা তিনি অবশ্য চিন্তা করেন নাই।

বঙ্কিমের সমাজদৃষ্টিতে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় হইতেছে তাঁহার কৃষক ও শ্রমিকদের প্রতি অনুরাগ। বঙ্কিমের সময়ে এবং তৎকালীন ভারতীয় ও বঙ্গীয় সমাজে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর উন্নয়নের কথা অতি অল্পলোকেই চিন্তা করিতেন এবং তাহার চেয়েও অল্পসংখ্যক লোক এই বিষয় লইয়া লিখিতেন বা আলোচনা করিতেন। বঙ্কিমের স্থির বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, কৃষকদের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি নাই। বঙ্গদর্শনে 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে তাঁহার দুইটি বিখ্যাত প্রবন্ধে বঙ্কিম লিখিয়াছেন :

> যতক্ষণ জমিদারবাবু সাড়ে সাতমহল পুরীর মধ্যে রঙ্গীন সার্সী প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী-কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণ পরাণ মণ্ডল পুত্রের সহিত দুইপ্রহর রৌদ্রে খালি মাথায় খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁদা হাতে তাঁহার ভোগের জন্য চাষ কার্য নির্বাহ করিতেছে। আধপেটা খাইতেছে। বাড়ী যাইবার সময় হয় জমিদার নয় মহাজনের পক্ষ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না, নয়ত চষিবার সময় জমিদার জমিখানি কাড়িয়া লইবে; তাহা হইলে সে সারা বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস।

বঙ্কিম আবার বলিতেছেন :

> যার ধন তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটাইয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

ইহাতেও বঙ্কিম পরিতৃপ্ত নহেন। তিনি বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিতেছেন :

দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর সেই কৃষিজীবী কয়জন? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের মঙ্গল নাই।

কৃষকের এই চিত্র, তাহার অর্থনৈতিক অবস্থা তাহার জীবনের অসহায়তা এবং সে-ই যে দেশের ভিত্তি ও সম্পদ, ইতিপূর্বে এইভাবে, এইরূপ অনুরাগের সহিত, এমন গভীর অনুভূতির সহিত কেহ বলে নাই। কৃষক যে আসল দেশবাসী, কৃষকের মঙ্গলেই যে দেশের প্রকৃত মঙ্গল, একথাও বঙ্কিম এই যুগে প্রথম বলিলেন। এই তীব্র প্রতিবাদের পশ্চাতে বঙ্কিমের এক গভীর বেদনা ছিল। তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে-সমাজতন্ত্রে কৃষকের দান ও সেবার স্বীকৃতি ও পরিচয় নাই—তাহার ধ্বংস অনিবার্য। সেই কারণে তিনি দেশ-বাসীকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করিতেছেন যাহাতে এই অন্যায়ের আশু প্রতিকার হয়। বহু সমালোচক বঙ্কিমের এই সুগভীর সমাজতত্ব ও সমাজনীতি না বুঝিয়া অনেক সময় এই ভ্রমাত্মক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বঙ্কিমের সমাজনীতি ধনতান্ত্রিক, গরীব ও দুঃখীর সমাজনীতি নহে।

বঙ্কিমের চিন্তায় নিশ্চয়ই জমিদার ও ভূস্বামীও সমাজের অন্তর্ভুক্ত। অত্যাচারী জমিদার বা ভূস্বামীর কথা বঙ্কিমের পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান। কিন্তু বঙ্কিমের এমন একটি সমদর্শী সমাজদৃষ্টি ছিল যাহা তাঁহাকে সকল সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্ব হইতে রক্ষা করিয়াছিল। সেই সমগ্র ও সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টির বলে তিনি ন্যায়পরায়ণ ধর্মনিষ্ঠ ভূস্বামীর কথাও বলিয়াছেন। সে সময়েও যে সকল জমিদারই আত্মসর্বস্ব ছিলেন বা কলিকাতা-বাসী হইয়া প্রজার অর্থে বাবুগিরি বা আমোদপ্রমোদে লিপ্ত থাকিতেন এমন নহে, তাহাও বলিতে বঙ্কিম সাহস পাইয়াছিলেন। জমিদার কৃষ্ণকান্ত দানে মুক্তহস্ত ও কৃষ্টির ও পাণ্ডিত্যের পোষক ও ধারক। নগেন্দ্রের ন্যায় ভূস্বামী, ধর্মনিষ্ঠ ও প্রজাবৎসল। অন্যদিকে দেখা যায় স্বার্থপরায়ণ, অত্যাচারী ও কুকর্মে আসক্ত ভূস্বামী দেবেন্দ্র ও হরবল্লভ।

সমাজতন্ত্রে বঙ্কিমের মনীষা সত্যই অভিনব এবং তাহা বিশ্লেষণ করিলে ইহার আধুনিকতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বঙ্কিম এক নূতন সাম্য সমাজে আনিতে চাহিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে ও বিবিধ প্রসঙ্গে এই বিষয়ে বঙ্কিমের বিভিন্ন উক্তি আজও ধ্রুবতারার মতন পথপ্রদর্শন করিতে সক্ষম এবং চিরদিন তাহা উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিবে।

শ্রেণীহীন সমাজের কথা আজ পথে ঘাটে সকলেই বলে। কিন্তু সেই শ্রেণীহীন সমাজের স্বরূপ কি, তাহার প্রকৃতি কি, তাহা কিভাবে সংঘটিত হইতে পারে, সে বিষয়ে অনেকেরই ধারণা শুধু অস্পষ্ট নহে, তাহা দুর্বোধ্য ও জটিল। এই শ্রেণীহীন সমাজের ধারণা বর্তমান সভ্যতার একপ্রকার চিন্তা-বিলাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধির, বৃত্তির ও চরিত্রের সকল বৈষম্যের ভিতরও কেহ কেহ শ্রেণীভেদের আতঙ্ক দেখিয়া থাকিতেন। ফলে, শ্রেণীহীন সমাজ ত দূরের কথা, নূতন নূতন শ্রেণী সৃষ্টি হইতেছে আর নূতন নূতন দুরতিক্রম্য শ্রেণীবিদ্বেষ শ্রেণী-ঈর্ষার বিকাশ হইতেছে। এই বিষয়ে বঙ্কিমের চিন্তাধারা দেখাইবার জন্য একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্কিম বলিতেছেন :

> এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চশ্রেণীর ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চশ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান কৃতবিদ্যের কোন সুখে সুখী নহেন। এই সহৃদয়তার অভাবই দেশোন্নতির পক্ষে প্রধান প্রতিবন্ধক। এরূপ কখন কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বরং যে সমাজের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে, সেই সেই সমাজের উভয় সম্প্রদায় সমকক্ষ, বিমিশ্রিত এবং সহৃদয়তাসম্পন্ন।

এই শ্রেণীহীন সমাজের বার্তা বাংলা সাহিত্যের কোন সাহিত্যিক এমনকি ভারতীয় কোন রাজনীতিজ্ঞ কিংবা সমাজনীতিবিদ এই যুগে বলেন নাই। বঙ্কিমই দেশের ও সমাজের দৃষ্টি এইদিকে প্রথম আকর্ষণ করেন। এই যে শ্রেণীহীন সমাজের কথা বঙ্কিম বলিতেছেন, ইহার বিরাট তাৎপর্য আজ অনুধাবন করা প্রয়োজন। বঙ্কিম ক্যাপিটেলিষ্ট, না সোস্যালিষ্ট, না কম্যুনিষ্ট ইহা লইয়া তর্ক করা শুধু যুক্তিহীন ও নিরর্থক নহে, তাহাতে বঙ্কিমের বিশেষ সমাজতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে না। শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্কিম ক্যাপিটেলিষ্ট নহেন, সোস্যালিষ্ট নহেন, কম্যুনিষ্টও নহেন। তাঁহার নিজের একটি বিশিষ্ট সমাজনীতি ছিল।

বঙ্কিমের শ্রেণীহীন সমাজ অর্থনৈতিক শ্রেণীহীনতা নহে। পাশ্চাত্যের সাম্যবাদের একমাত্র মানদণ্ড হইল অর্থনৈতিক সাম্য। এই অর্থনৈতিক সাম্যর প্রধান নির্ভর পাশ্চাত্য ও আধুনিক বস্তুতান্ত্রিকতা। সেই বস্তুতান্ত্রিকতার

বর্তমান ভিত্তি হইতেছে আজিকার যুগের রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র। অর্থনৈতিক সাম্য ও বস্তুতান্ত্রিক সাম্য আপাতদৃশ্যমান সাম্য; তাহা যে বর্তমান জগতে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করিতে পারে নাই তাহা আজ বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সভ্যতার ও বিভিন্ন মতবাদের প্রকাশ ও বিকাশ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। হৃদয়ের সাম্য বঙ্কিমের লক্ষ্য। তাই তিনি 'সহৃদয়তার' কথা বলিয়াছেন। বাহ্যিক সকল সাম্য থাকিলেও হৃদয়ের সাম্য যদি না থাকে বঙ্কিম তাহাকে শ্রেণীহীন সমাজ বলেন না। তাই বলিয়া ইহা মনে করা ভুল হইবে যে বাহ্যিক সাম্য একেবারে নিষ্প্রয়োজন। তাহারও প্রয়োজন আছে। বিরাট বাহ্যিক অসামঞ্জস্য থাকিলে তাহা অনেক সময়ে হৃদয়ের সাম্য গঠনের অন্তরায় হয়। তবে বঙ্কিমের বক্তব্য এই যে, বাহ্যিক সাম্যই সব নহে; ইহা একটি উপায় হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র উপায় নহে, এবং উপায় হিসাবেও ইহার যথেষ্ট ত্রুটি আছে। ইহার উপর বেশী জোর দিলে শ্রেণীবিদ্বেষ ও শ্রেণীঈর্ষা বাড়িয়া চলিবে। নৈতিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সাম্য বঙ্কিমের মূলমন্ত্র। শ্রেণী মানিয়া লইয়াও প্রকৃত সাম্য সমাজে আনয়ন করা যাইতে পারে, যদি প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উপযোগিতা ও তাহারা যে সমাজের অপরিহার্য, সম্মানীয় ও স্নেহের অংগ, তাহার পরিচয় ও চেতনা থাকে। বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর উচ্চতা ও নিম্নতা বলিয়া কিছু নাই, সকলের প্রয়োজনীয়তা আছে, এই স্বীকৃতি যে সমাজে আছে তাহাই বঙ্কিমের সাম্যসমাজ। ইহাই ভারতের শাশ্বত বাণী ও ভারতীয় সভ্যতার মর্মকথা। ভারতীয় দর্শনে ও ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টির মূল হইল বৈচিত্র্য ও বৈষম্য। সকল বৈচিত্র্য ও বৈষম্যকে যে-সাম্যবাদ এক করিতে চাহে তাহা নিজেই ধ্বংস হয় এই কারণে যে, তাহা সৃষ্টির কার্য ও কারণের বিরুদ্ধপন্থী। বৈষম্য, বৈচিত্র্য ও ভেদ স্বীকার করিয়াও আর এক সাম্যনীতি আছে যাহা সকল ভেদ অতিক্রম করিয়া প্রকৃত সমদৃষ্টির প্রতিষ্ঠা করে। তাহাই স্বাভাবিক ও তাহাই ক্রম বিবর্তমান সৃষ্টির নীতি। ভারতীয় বেদান্ত ইহার চরম কথা। সেই বেদান্ত বঙ্কিমের সমাজতত্ত্বের একটি মূলনীতি।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'জাতিভেদ' প্রবন্ধে বঙ্কিম এই সামাজিক প্রশ্নের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন এবং এমন কি অর্থনীতির দিক হইতেও বঙ্কিম জাতিভেদের মূল বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার যে লেখনী প্রবন্ধে, উপন্যাসে ও সাহিত্যে এবং তাঁহার গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের চিত্রে, বর্ণবৈষম্যের কথা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়াছিল, তাহাই আবার দেশের কৃষকদের সমাজব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত হইয়াছিল। কৃষকদের কথা

বলিতে গিয়া বঙ্কিম স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে :

> আমাদিগের এই প্রস্তাব শ্রমজীবী প্রজামাত্র সম্বন্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা করিতে হইবে।

বঙ্কিমের সময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্তমান প্রাধান্য অর্জন করে নাই সুতরাং বঙ্কিম এই স্থলে আরও মন্তব্য করেন যে :

> কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবীর মধ্যে কৃষিজীবী এত অধিক যে অন্য শ্রমজীবীর অস্তিত্ব এ সকল কালে স্মরণ রাখা না রাখা এক।

বঙ্কিমের সমাজতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে আর একটি বিষয় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজের ঐক্যবোধ স্থাপনের জন্য বঙ্কিমের অভিমত ছিল, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ও শিল্প প্রসার। বহু রচনায় বহুভাবে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আমাদের সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে সমাজবোধের হানি ঘটিতেছে। এই ব্যবধান যতদিন না দূর হইতেছে ততদিন সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সুদূরপরাহত। বিজ্ঞানের সাহায্যে শিল্পদৃষ্টির ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার বঙ্কিমের বিশেষ কাম্য ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে-যুগ আসিতেছে তাহা বিজ্ঞান ও ব্যবসার যুগ। সেইজন্য দেশকে আগামী যুগের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়াছিলেন। সেই প্রস্তুতি বস্তুতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণের জন্য নহে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য। বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি একদিকে যেমন পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতা ও ধনতান্ত্রিকতা প্রত্যখ্যান করিয়াছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ভারতীয় সনাতন ধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্মকেও সংস্কার করিয়া তাহাকে যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও শিল্পের সাধনায় নিযুক্ত করিয়া নূতন সাম্য, সমাজতন্ত্র ও সমাজ সংগঠন করিবার অভিলাষী ছিলেন। ভারতীয় আর্যসভ্যতার উপর ভিত্তি করিয়া, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পের সাহায্যে ভারতের আগামী সমাজ গঠনের স্বপ্ন বঙ্কিম দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমের সমাজ যেমন নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করিবার সুযোগ দিবে, তেমনি সেই সমাজে আধুনিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সামরিক সম্পূর্ণতাও লাভ করিবে। বঙ্কিমের সমাজ-পরিকল্পনা সর্বতোভাবে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল।

বঙ্কিমের সমাজ সার্বভৌম সমাজ। নাম বদলাইয়া ভাব চুরি করা বর্তমান যুগের এক বৈশিষ্ট্য। আজ হয়ত যাহাকে 'সর্বোদয়' সমাজ বলা হয়, বঙ্কিম

তাহার প্রথম আবিষ্কারক ও প্রবর্তক। সকল শ্রেণীর, সকল স্তরের মানুষের স্থান বঙ্কিমের সমাজে নির্দিষ্ট ও স্বীকৃত। ইহা পাশ্চাত্যের প্রতিযোগিতা-মূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বিড়ম্বিত সমাজ নহে। বঙ্কিমের সমাজ সহযোগিতার সমাজ। এই সহযোগী সমাজ সমন্বয় সাধনকারী এবং অধিকার ও উপযুক্ততার শৃঙ্খলায় আবন্ধ।

বঙ্গদর্শনে ১২৮০ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় 'জাতিভেদ' প্রবন্ধে বহু সারগর্ভ কথা বলা হইয়াছে। তাহার সকল উক্তিই যে বঙ্কিমের স্বীয় অভিমত তাহা না হইলেও তাঁহার চিন্তাধারা যে অনুরূপ ছিল, তাহা ভাবিবার কারণ আছে। ভারতবর্ষে জাতিভেদ লইয়া বহু দেশী ও বিদেশী সমালোচনা হইয়াছে। বঙ্কিমের সমাজতত্ত্ব পরীক্ষা করিতে হইলে বঙ্গদর্শনের 'জাতিভেদ' প্রবন্ধ হইতে বিশিষ্ট ভাবধারাগুলি উল্লেখ করা প্রয়োজন। উক্ত প্রবন্ধে জাতিভেদের চারিটি কারণ দেওয়া হইয়াছে। (১) জনসমাজ কতকগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। (২) প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের জন্য কতিপয় ব্যবসা নির্দিষ্ট আছে, যা দ্বারা তাহাদের জীবিকানির্বাহ হয় এবং এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর ব্যবসা গ্রহণ করিতে পারেন না। লোকে বংশপরম্পরায় পিতৃপিতামহের শ্রেণীভুক্ত হইয়া সেই শ্রেণীর ব্যবসা অবলম্বন করে। (৩) শ্রেণী পরম্পরার মধ্যে ক্রমান্বয়ে প্রাধান্যের তারতম্য আছে। (৪) আর দেখিতে পাওয়া যায় যে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ এবং আহারোপবেশন বিষয়ে নিষেধসূচক কতকগুলি নিয়মকানুন আছে।

কিন্তু এই স্থলে বলা হইয়াছে যে ইহা কেবল ভারতীয় সমাজের দোষ নহে। এই প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে যে—

> ইংরাজদিগের মধ্যে ঠিক চারিটি শ্রেণী না থাকুক, শ্রেণী আছে বটে। আমরা মনে করি যে হিন্দুরাই স্বদেশত্যাগ করিয়া বিদেশ যাইতে চাহে না। কিন্তু ইংরাজেরাও দেশাচারের প্রতি আসক্তিতে আমাদের অপেক্ষা কম নহে। তবে তাঁহারা বলবান, বিদেশেও বাহুবলে জাতীয় ধর্ম রক্ষা করিতে পারেন। আমাদের তাদৃশ ক্ষমতা নাই, সুতরাং স্বদেশেই আবদ্ধ থাকি। আমরা বিজাতীয় লোককে স্বজাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দিই না। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাতেও অন্য উপায়ের দ্বারা ঠিক এই উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হইতেছে। আমরা এই গুরুতর তর্ক মীমাংসা করিবার জন্য উত্থাপন করি নাই। সকল কথারই দুই পক্ষ আছে। জাতিভেদের বিরুদ্ধ পক্ষই এখন বলবান, কিন্তু ইহার স্বপক্ষীয় কথা এখনও পৃথিবীর অনেক সভ্যপ্রধান দেশে গ্রাহ্য হইতেছে।

বঙ্কিম বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন যে পাশ্চাত্ত্য জাতির ভাষায়, 'নেশন্' 'রেস্' এবং 'কাষ্ট' সকলকেই আমরা জাতি বলিয়া ব্যক্ত করি বলিয়া যুক্তির বহু প্রমাদে ও ভ্রান্তিতে পড়িয়া যাই। ইহারই ফলে আমাদের নিকট জাতিভেদ ও বর্ণভেদ এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য ভারতীয় জাতিভেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন। বঙ্কিমের সমাজতন্ত্রে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ, জাতিবিরোধ বা বর্ণবিরোধ নাই। বঙ্গদর্শনের 'পত্র সূচনায় বঙ্কিম সেই কারণে লিখিতেছেন :

> এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে, অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে। সেই পার্থক্যের এক বিশেষ কারণ ভাষাভেদ।

সমস্ত শ্রেণী-বিভাগ তুলিয়া এক শ্রেণী করা বঙ্কিমের সমাজতত্ত্ব নহে, যদিও বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর ঈর্ষাজনিত বা সম্পত্তিমূলক বিভেদের বৈষম্য যত কম হয়, ততই সমাজের কল্যাণ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধ, সমালোচনা, সাহিত্য ও চরিত্র পরীক্ষা করিলে দেখা যায় বঙ্কিমের বিশেষ সিদ্ধান্ত এই যে—(১) সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী থাকিবে। (২) কিন্তু তাহাদের মধ্যে হানিকর ও ক্ষতিজনক বৈষম্য দূর করিতে হইবে। (৩) প্রতি শ্রেণীর মর্যাদা, প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা স্বীকৃত হইবে। (৪) কোন এক শ্রেণীর প্রাধান্য বা দৌরাত্ম্য থাকিবে না, সে ধনী শ্রেণী হউক, কি শিক্ষিত শ্রেণী হউক, কি শ্রমিক শ্রেণী হউক, কি কৃষক শ্রেণী হউক, এবং (৫) সেই সমাজ শৃঙ্খলার ভিত্তি হইবে সেই সকল শ্রেণীর সমবায় এবং সহযোগিতা। সমাজতত্ত্বে বঙ্কিমের বিশিষ্ট অবদান এই সমবায় সমাজের তত্ত্ব। ইহাই বঙ্কিমের মতে সমাজনীতি ও প্রকৃত সামাজিক গণতন্ত্র।

১২৮৫ বঙ্গাব্দের বঙ্গদর্শনের কার্তিক সংখ্যায় 'সমাজ সংস্কার' শীর্ষক প্রবন্ধে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—'জাতীয় ভাব রক্ষা করিব, অথচ জাতীয় ভ্রম, কুসংস্কার কদাচারের বিরুদ্ধে নিরন্তর খড়্গহস্ত থাকিব। পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া সমাজ সংস্কার হয় না। সংসারে কখন তাহা হয় নাই।......সত্যপালন করিতেই হইবে, তাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজ, আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশবাসীর প্রসন্নতা পাওয়া যায় ভালই, নতুবা পরমেশ্বরকে স্মরণ, ফলাফলের বিচার ছাড়িয়া দিয়া, সকল যন্ত্রণা সকল বিপদ শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে।' যদিও এই প্রবন্ধ বঙ্কিমের নিজের নামে লিখিত হয়

নাই, তথাপি সমাজ সংস্কারক বঙ্কিমের ইহাই সাধনা।

বঙ্কিমের সমাজতত্ত্বে আর একটি ভাবিবার বিষয় আছে। সে বিষয়টি এই যে, সমাজ ও রাষ্ট্র কি এক পর্যায়ভুক্ত, তাহারা কি একই প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন এবং তাহাদের শৃঙ্খলাবিধি, কার্য ও উদ্দেশ্য কি একরূপ? আজ রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী হইতে বসিয়াছে, সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেছে, আহারে, বিহারে, জ্ঞানে, ব্যবসায়, দৈনন্দিন জীবন যাত্রায়, শিক্ষায়, ক্রীড়ায়, কলায়, সাহিত্যে, যাত্রাপথে, বিশ্রামে, শ্রমে, এমন কি চিন্তাধারায় পর্যন্ত নায়কত্ব করিতেছে। প্রশ্ন হইতেছে, এ সকলই কি রাষ্ট্রের কাজ না ইহার খানিকটা সমাজের এবং তাহা কতখানি। ভারতীয় সভ্যতা সমাজ ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখিত। ইহার ফলে বিপুল রাষ্ট্রবিপর্যয়েও সমাজ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ভারতের আদর্শ ছিল সমাজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। সমাজনীতি অনুযায়ী সমাজ গঠনের ও সমাজ পরিচালনার রাজনৈতিক পদ্ধতি ছিল না। বিধান সভায় ভোট দিয়া, আইন করিয়া দলীয় বিধান অনুযায়ী সমাজের নীতিগঠন বা পরিচালনা করা হইত না। বঙ্কিম সমাজ সংস্কারকে রাজনীতির ও যাহাকে আমরা বর্তমান যুগে 'আইন' বলি তাহার বাহিরে রাখিয়াছিলেন। সেই কারণে বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা বা সাধারণ শিক্ষা, জীবিকা, বা ধর্মসংস্কার বঙ্কিম রাষ্ট্রগত আইন বা বিধির অন্তর্গত করিতে চাহেন নাই। সমাজের কতকগুলি বিশিষ্ট দায়িত্ব আছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতি, জীবন যাত্রার আদর্শ ও ধর্মরক্ষার সামাজিক কর্তব্য, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় কর্ম নহে। রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য সকল প্রজাকে সমানভাবে দেখা এবং প্রজাদের ভিতর রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ ভূমিকায় স্থাপন করা। রাষ্ট্র যদি পক্ষপাতিত্বদুষ্ট হয় তাহা হইলে অন্যায় ও অবিচার দেখা দিবে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র তখনই সম্ভব যখন একটি সরল, সচেতন ও সুগঠিত সমাজ থাকে। আধুনিক রাষ্ট্রবিদ্যা ও রাজনীতি, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য দেশের, সামাজিক ও কল্যাণ-রাষ্ট্রের কথা বলিতেছে। ইহার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে যে সীমারেখা তাহা ক্রমশই বিলুপ্ত হইতেছে। সেই সীমারেখা বিলুপ্ত হওয়ায় বহু সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে যথা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু, ও বিশেষ ক্ষুদ্রায়তন গোষ্ঠির কৃষ্টি ও কলার রক্ষা। হিন্দুর বহুবিবাহ আইন দ্বারা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু একই রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলমান প্রজার ক্ষেত্রে সে আইন কার্যকরী হইতে পারিতেছে না। হিন্দুর উত্তরাধিকারী কে হইবে, তাহার বিবাহ কিভাবে হইবে, তাহা কিভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে তাহা আইন দ্বারা পরিবর্তিত হইতেছে

কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বী একই রাষ্ট্রের প্রজার ক্ষেত্রে তাহা প্রযুক্ত হইতেছে না। ইহাতে রাষ্ট্রীয় নিরপেক্ষতার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় লইয়া, শ্রমিক লইয়া, কৃষক লইয়া, এই রকম বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় ইতিহাসে ও সভ্যতায় হিন্দু ধর্মনীতি ও সমাজনীতি কখনই রাষ্ট্রীয় সাহায্যে রূপ গ্রহণ করে নাই এবং রাষ্ট্রমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে নাই। পাশ্চাত্য দেশে খৃষ্টধর্ম রাষ্ট্রের সাহায্য লইয়াছে, ইসলাম ধর্মও রাষ্ট্রের সহায় লইয়াছে। ভারতীয় আদর্শ এই বিষয়ে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র। সমাজ ও রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার পশ্চাতে এক বিশিষ্ট যুক্তি আছে। রাষ্ট্রবিধান ও সমাজবিধান বিভিন্ন প্রকৃতির। জীবনের অনেক সমস্যা আছে যাহা রাজনীতি, ভোট, বা রাজনৈতিক দলাদলির দ্বারা নির্ধারিত হইতে পারে না এবং হওয়া উচিত নহে। কেহ বলিবেন না যে গণতন্ত্র ও ভোটপ্রথা আদর্শ হইলেও তাহা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষায়তনে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তন করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ মানের দ্বারা ঠিক করিবেন কি পড়ান হইবে, কিভাবে পড়ান হইবে এবং কে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। সেখানে রাজনৈতিক ভোট ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র ও দলাদলি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ-মান নিয়োগ করিলে শিক্ষার পক্ষে কল্যাণ হইবে না। তদ্রূপ রাষ্ট্রপরিচালনা ও সামাজিক নীতি ও সামাজিক বিধানের উপায়, মাধ্যম, প্রকৃতি ও পরিচালনা বিভিন্ন। বঙ্কিমের বহু সামাজিক সমস্যার উপর বিভিন্ন অভিমত বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার সমাজতত্ত্বের ভিত্তি রাষ্ট্র ও সমাজের পৃথকীকরণ। ইহাই ভারতীয় আদর্শ ও বঙ্কিমের সমাজ-তত্ত্বের মূল কথা।

আর একটি প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে বঙ্কিমের সমাজ কেবলমাত্র ভারতীয় সমাজ, না সে সমাজের কোন আন্তর্জাতিক আদর্শ ছিল। বঙ্কিমের যুগকে আন্তর্জাতিক যুগ বলা যায় না। তখনকার সময়ে বিভিন্ন দেশ তাহাদের স্বার্থের জন্য অন্যদেশে ব্যবসা, উপনিবেশ বা দখল স্থাপন করিতে ব্যস্ত। এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার প্রায় সকল মহাদেশেই এই ভাবধারা সেই যুগে প্রবল। বঙ্কিমের যুগে তাই স্বজাতি, স্বদেশ ও দেশের সমাজ গঠন লইয়াই মানুষ ব্যস্ত ছিল। মানবজাতির ও সমাজের সমগ্র পরিধি দর্শন করার কাল তাহা ছিল না। কিন্তু তথাপি বঙ্কিমের সার্বভৌম সমাজে আন্তর্জাতিক দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ভারতীয় সমাজ 'ধরণীম্ ভরনীম্'। সমস্ত ধরণীকে ভরণ করিবে ও তাহার আশ্রয় হইবে। বঙ্কিমের সমাজ কূপমণ্ডূপের সমাজ নহে। সেখানে আসিয়া দেশ বিদেশের লোক তৃপ্ত হইবে

এবং নৈবেদ্য ও অর্ঘ আনিবে। এই সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টি বঙ্কিমের সাহিত্যে ও রচনায়ই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে আন্তর্জাতিক কথা প্রায় বিলাসে দাঁড়াইয়াছে। সকল জায়গায়, কারণে অকারণে এক জগতের কথা সমারোহের সহিত আলোচিত হয়। এই ধরনের আন্তর্জাতিকতা বঙ্কিমের সমাজতত্ত্বে নাই। প্রত্যেক সমাজের বৈশিষ্ট্য ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়া সার্বজনীন সমাজ স্থাপন ছিল বঙ্কিমের আদর্শ। আহার, বিহার ও পরিচ্ছদে এক হওয়াকে বা দেশ কাল পাত্রভেদকে লোপ করাকে বঙ্কিম আন্তর্জাতিকতা বলিতেন না এবং তাঁহার সার্বভৌম সমাজ এইরূপ দৃষ্টি স্বীকার করে নাই।

১৫

॥ বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা ॥

বঙ্কিমের জীবনে, সাহিত্যে ও সাধনায় ধর্মের এক বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সাহিত্যে ও বাংলাগদ্যে ধর্ম আলোচনা ও ধর্মের আদর্শ প্রচার ও ব্যাখ্যা এবং বিস্মৃত ধর্মকে জীবনের, কালের ও যুগের উপযোগী করিবার পন্থা বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যে বিভিন্নভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কিন্তু বাংলায় ধর্মসাহিত্যের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপনা ছিল বঙ্কিমের সাধনা। 'অনুশীলনে' গুরুশিষ্যের কথোপকথনে বঙ্কিমের নিজের উক্তিতেই ইহার আভাস মিলিবে :

> এ জীবন লইয়া কি করিব? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি—জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছি।

জীবন লইয়া কি করিব, ইহাই ধর্মের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহাই বঙ্কিমেরও প্রশ্ন এবং প্রধান ধর্মজিজ্ঞাসা। বঙ্কিমের ধর্মসাহিত্যে বিশেষ করিয়া তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে', 'ধর্মতত্ত্বে', 'অনুশীলনে' ও 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' ইহা পরিলক্ষিত হয়। অনুশীলনে যাহা তত্ত্বমাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহ ও অবয়ব-বিশিষ্ট। অনুশীলনে ধর্মের আদর্শ নিরূপণ, কৃষ্ণচরিত্রে সেই আদর্শের জীবন্ত উদাহরণ।

কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম ভাগ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এবং ইহা প্রথমে 'প্রচার' পত্রিকায় বাহির হয়। 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'অনুশীলন' কৃষ্ণচরিত্রের দুই বৎসর পরে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ইহার কিয়দংশ 'নবজীবন' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' বঙ্কিম নিজে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যান নাই। ইহার কিয়দংশ 'প্রচার' পত্রিকায়, শ্রাবণ-পৌষ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ ও বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৫ বঙ্গাব্দের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'প্রচারে' যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে সংগৃহীত করিয়া দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা 'সংগ্রহকারের নিবেদন'-সহ

বঙ্কিমের মৃত্যুর পর ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত করেন। ইহা হইতে দেখা যায় বঙ্কিম চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক অবধি গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সম্পূর্ণ করেন স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়।

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে তাঁহার ধর্মবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। তিনি হিন্দুধর্মের যাহা শাশ্বত বৈশিষ্ট্য তাহা সমর্থন করিয়াছেন, শুধু শাস্ত্রের সাহায্যে নহে, সময়োপযোগী যুক্তির দ্বারা। সেই দিক দিয়া তাঁহাকে সনাতন ধর্মের উপাসক ও প্রচারক বলিতে হইবে। ইহার জন্য তিনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন নাই এবং অন্য ধর্ম সৃষ্টি করেন নাই। নিজের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই ধর্মের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা বঙ্কিমের কর্মসাধনা ও আদর্শ। ধর্মসাহিত্যে বঙ্কিমের এই বৈশিষ্ট্য মনে রাখিতে হইবে, বিশেষ করিয়া বঙ্কিমের যুগে যখন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ আক্রমণ হিন্দুধর্মের উপর তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবে সেই ধর্মে যে সকল কুসংস্কার ও আবর্জনা, কালের ও সমাজের গতিতে বাধাস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার সংস্কারের জন্য বঙ্কিম বদ্ধপরিকর ছিলেন। যেমন কথাসাহিত্যে তেমনি ধর্মসাহিত্যে ও ধর্ম-ক্ষেত্রে বঙ্কিম যথার্থই সব্যসাচী। কিন্তু এই সংস্কারের রীতি ও পদ্ধতি ছিল বঙ্কিমের নিজস্ব। ইহার ফলে বঙ্কিমকে দুই দিকেই সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। একদিকে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত যাঁহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম সৃষ্টির জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা হিন্দুধর্মকে কেবল কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচারের ও পৌত্তলিকতার আশ্রয় বলিয়া মনে করিতেন। অন্যদিকে তাঁহার সংগ্রাম ছিল তাঁহাদের সহিত যাঁহারা গোঁড়া, সকল পরিবর্তনের বিরোধী এবং আচার-পদ্ধতির উপর অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া প্রকৃত হিন্দুধর্মকে তাঁহাদের মনগড়া ধর্মে পরিণত করিতে ব্যস্ত। বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গীর আর এক বিশেষত্ব এই ছিল যে, সকল ধর্ম-বিভাগের ও ভেদের পশ্চাতে যে সাধারণ মানবধর্ম আছে, যাহা বিশ্বধর্ম, যাহা সনাতন ধর্মের মূল কেন্দ্র, যাহা সকল কালে সকল দেশে সত্য, তাহা লক্ষ্য করা এবং তাহা প্রকাশ করা।

ধর্মের বিষয়বস্তু হইল জীবন ও জীবনাতীত সত্য, গতিশীল জগত ও জগত অতিক্রমকারী যে স্থিতি। ইহার কেন্দ্র যেমন নিগূঢ়, ইহার পরিধি তেমনি সীমাহীন। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে প্রথম অধ্যায়, চিরন্তন প্রশ্ন, দুঃখ কি? দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রশ্ন, সুখ কি? ধর্ম জানিতে হইলে সুখ দুঃখ কি তাহা

জানিতে হইবে। বঙ্কিম ইহার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে উভয়ই মনের অবস্থামাত্র, সুতরাং চঞ্চল ও অস্থায়ী; তবে সুখ ও দুঃখের অতীত অবস্থা আনন্দ, যে আনন্দ শুধু সুখে নহে দুঃখেও বর্তমান। তাঁহার উপন্যাস-সাহিত্যে এই প্রশ্নের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত আমরা দেখিয়াছি। বঙ্কিমের ধর্মে সামঞ্জস্যই সুখ। প্রবৃত্তির সম্যক অনুশীলন এবং মনের পরিপূর্ণ বিকাশ হইল মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বই বঙ্কিমের ধর্ম। বঙ্কিমের ধর্মে যেমন ব্যক্তিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত তেমনি সেই ধর্মের ভিত্তি ঈশ্বর-বিশ্বাস। সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত নৈবেদ্য হইবে। সকল কর্ম ঈশ্বর-পূজা হইবে—এই হইল বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের মূল কথা। যে ঈশ্বর মেঘে বা আকাশে থাকেন, যাঁহার সহিত মানবমনের ও জীবনের আদান-প্রদান নাই, তিনি বঙ্কিমের ঈশ্বর নহেন। তিনি যেমন অন্তরে ও অন্তরীক্ষে তেমনি তিনি বাহিরে সর্বত্র উপস্থিত ও সক্রিয়। ঈশ্বরে এই বিশ্বাস থাকিলে বা অর্জন করিলে বঙ্কিমের মতে সকল সৃষ্টির প্রতি প্রীতি, দেশকল্যাণ ও জীবনকল্যাণ সার্থক হয়।

ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম, এই ত্রিধারার সঙ্গম হইল বঙ্কিমের ধর্ম। কর্ম ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান ব্যতিরেকে ভক্তি হয় না। ইহার বিপরীতও তদ্রূপ সত্য। অর্থাৎ ভক্তি বিনা জ্ঞান সম্ভব হয় না এবং জ্ঞান বিনা কর্ম সম্ভব হয় না। বঙ্কিম গীতার মর্মকথা এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার' ভূমিকায় বঙ্কিম এই সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন—'যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক, এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।' গীতার ধর্মব্যাখ্যা করিতে গিয়া বঙ্কিম বলিয়াছেন যে পূর্বগামী ভাষ্যকারের প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি নহেন কিন্তু সেই সকল ভাষ্য অন্ধবিশ্বাস লইয়া তিনি তাঁহাদের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করেন নাই। প্রয়োজন মতন এবং তাঁহার বিবেচনায় তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র মতও দিয়াছেন। শঙ্কর ভাষ্য, রামাণুজ ভাষ্য, শ্রীধর স্বামীর ভাষ্য, মধুসূদন ভাষ্য, আনন্দগিরির ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা প্রভৃতি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্কিম ভাষ্যের বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁহার নিজের কথায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভূমিকায় বলিয়াছেন : 'পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্যভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাঁহাদিগকে (অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে) বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।' বর্তমান সমাজের আধুনিক লোককে গীতার বাণী যুগোপযোগী

ভাষায়, ভাবে ও যুক্তিতে পরিবেশন করা বঙ্কিমের সাধনা। তিনি বুঝিয়াছিলেন প্রাচীন ভাষ্য রীতি, ভাব ও ভাষার দ্বারা এই উদ্দেশ্য এই যুগে সাধিত হইবে না। যাঁহারা বঙ্কিমের গীতাভাষ্য এবং তাঁহার স্বকীয় ব্যাখ্যা চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক অবধি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন বঙ্কিম কিভাবে গীতার আলোকে ও আদর্শে পাশ্চাত্য দার্শনিক, মনীষী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমালোচনা করিয়াছেন। এই যুগোপযোগী পন্থার পথপ্রদর্শক বঙ্কিম। অন্য কোন গীতাভাষ্যে এই পদ্ধতি ও রীতি বঙ্কিমের পূর্বে কেহ অবলম্বন করেন নাই। পূর্বজন্ম ও তাহার স্মৃতি আলোচনা করিতে করিতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় কার্পেণ্টর সাহেবের 'মেণ্টল ফিজিওলজি' গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন স্মৃতির প্রকৃত উৎস কোথায়। এই রকম বহু উদাহরণ বঙ্কিমের গীতাভাষ্যে আছে।

নিষ্কাম কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উভয়ের সামঞ্জস্য ও সমতা রক্ষা করা যায় এবং তাহাতেই পূর্ণ মানবত্ব এবং বঙ্কিমের মতে তাহাই সুস্থ মানবধর্ম। বঙ্কিমের ধর্মে ইন্দ্রিয়ের স্থান কোথায়, ইহা লইয়া অনেক সমালোচনা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় সুখ বা আনন্দ নাই, তাহা আছে ইন্দ্রিয় সংযমে ও ইন্দ্রিয় জয়ে, ইহাই বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসার শিক্ষা ও তাঁহার ধর্মসাহিত্যের এবং বিভিন্ন উপন্যাস-চরিত্রের মূল কথা।

বঙ্কিম সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিয়া এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমের পূর্বে ও পরে সাংখ্য লইয়া বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিমের সাংখ্যদর্শন সমালোচনার বিশেষত্ব আছে। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী কিনা, ইহার উপর বঙ্কিমের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অভিমত ও সিদ্ধান্ত আছে। এই প্রশ্ন বিশ্লেষণ করিবার সময় বঙ্কিম কোম্‌তের (Auguste Comte) মতবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে কোম্‌তে ও তাঁহার মতাবলম্বীরা প্রকৃতপক্ষে নিরীশ্বরবাদী নহেন, সন্দিগ্ধবাদী। অর্থাৎ ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন কিন্তু আছেন এমন প্রমাণ নাই। বঙ্কিম নিরীশ্বরবাদীগণকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, নাস্তিক ও সন্দিগ্ধবাদী। ইহার পর বঙ্কিম উল্লেখ করেন যে অনেকের মতে কপিলদর্শন নিরীশ্বরবাদী নহে। কারণ সাংখ্য-দর্শনে এই কথাদুটি আছে—'ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃসিদ্ধা' এবং 'সহি সর্ববিৎ সর্বকর্তা'। ইহাতে ঈশ্বরের উল্লেখ থাকায় বলা হইয়াছে যে সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। কিন্তু বঙ্কিম এই মতবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ কথা ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই এবং সাংখ্যকার বলেন যে জ্ঞানেই মুক্তি,

অন্য কিছুতে মুক্তি নাই। বঙ্কিম 'সর্বকর্তা'র অর্থ করিয়াছেন, সর্বশক্তিমান, সর্বসৃষ্টিকারক নহেন। দ্রষ্টব্য বঙ্গদর্শন ২য় খণ্ড ১লা বৈশাখ ১২৮০ বঙ্গাব্দ ১ম সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা, 'সাংখ্যদর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ। ইহা কতদূর সঙ্গত তাহা সন্দেহজনক কারণ যিনি সর্বশক্তিমান তিনি যে কেন সর্বসৃষ্টিকারক হইতে পারেন না, তাহা মনে করা কঠিন, কেন না সৃষ্টি করা সর্বশক্তির মধ্যে একটি অন্যতম শক্তি।

এই যুক্তির জন্য এবং ইহার পূর্বেও বঙ্কিমকে অনেক সমালোচক নাস্তিক পর্যায়ের মধ্যে ফেলিয়াছেন। ঐ সময়ে ও যুগে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতামত তাঁহার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি পরে 'ইউটিলিটেরিয়া-নিস্‌ম্'-এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং নিজে তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি অগাষ্ট কোম্‌তের প্রামাণিক দর্শনের (Positivist Philosophy) প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু মিল বা কোম্‌তে কেহই বঙ্কিমের মন ও বুদ্ধি জয় করিতে পারে নাই। রজনীতে আমরা দেখি বঙ্কিম ঈশ্বরকে খুঁজিতেছেন এবং অমরনাথের মুখ দিয়া এই প্রশ্ন করিতেছেন :

> প্রভু, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কৈ তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফুটনোন্মুখ হৃদ্‌পদ্মই তোমার প্রমাণ, ইহাতে তুমি আরোহণ কর। তুমি সুখ দুঃখের অতীত, তোমারই চরণে সকল সমর্পন করিব।

রজনীতে যাহা ইঙ্গিত, কৃষ্ণকান্তের উইলে তাহা সিদ্ধান্ত ও প্রাপ্তি। সেখানে বঙ্কিম গোবিন্দলালের মুখ দিয়া বলিলেন—'ভগবৎ-পদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার উপায় নাই।'

বঙ্কিমের ধর্মসাহিত্যের শিক্ষা এই যে ধর্ম সমাজের, রাষ্ট্রের ও সংসারের ভিত্তি। তাঁহার বহু উপন্যাসে ও ধর্মালোচনায় অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত ও পরা-প্রকৃতির জগতের পরিচয় আছে। যুগযুগান্তর হইতে ধর্মের একটি মূল কথা এই যে দেহের অবসানেই সব শেষ নহে। তাহার পরেও আছে। উপনিষদের সেই চিরন্তন প্রশ্ন—'ততঃ কিম্'। যথার্থ ধর্ম মৃত্যুকে আত্যন্তিক বিনাশ বলিয়া স্বীকার করে না, বিশেষ করিয়া হিন্দুধর্ম। বঙ্কিম সেই ধর্মের মূল-কথার প্রকাশ তাঁহার ধর্ম আলোচনায় ও সাহিত্যে করিয়াছেন। তাঁহার

সাহিত্যে, ধর্মে ও উপন্যাসে, সেই সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আছে, যাহা প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়াও নিত্য ও বাস্তব। সেই কারণে তিনি বলিয়াছেন, 'বহিঃপ্রকৃতি প্রত্যক্ষ কিন্তু তাই বলিয়া অন্তঃপ্রকৃতি সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে, তবে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষেত্র হইল মনোবিজ্ঞান ও দর্শন।' পুনরায় সেই জিজ্ঞাসাই তিনি করিতেছেন যখন তিনি তাঁহার 'উত্তরচরিতে' কবির যথার্থ সৃষ্টি ও কল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে বলিতেছেন, 'প্রকৃত সৃষ্টি স্বভাবকে অনুকরণ করিতে পারে; কিন্তু তাহার প্রধান কাজ সত্যকে অতিক্রম করিয়া অরূপকে রূপ দান করা।' বঙ্কিমের উপন্যাসে যে সন্ন্যাসী চরিত্রসকল আছে তাহারা এই বার্তাই বহন করে।

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসায় একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন অদৃষ্ট ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব। ধর্মজগতে ইহা লইয়া বহু তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্মের সমাধান হইল কর্মফলের মাধ্যমে। গত জন্মের কর্ম বর্তমান জীবনের অদৃষ্ট এবং বর্তমান জীবনের কর্ম আগামী জন্মের অদৃষ্ট নিরূপণ করিয়াছে। সুতরাং কর্মই শ্রেষ্ঠ ও প্রবল এবং প্রকারান্তরে অদৃষ্ট বলিয়া যথার্থ কিছুই নাই, কর্মই সব এবং পুরুষকারই প্রকৃতরূপে শাশ্বত ও চূড়ান্ত। যোগবশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে এই সিদ্ধান্তের কথা নানাভাবে নানা উপাখ্যানে বুঝাইয়াছেন। বঙ্কিম তাঁহার সাহিত্যে এই প্রশ্নের একটা ব্যবহারিক সামঞ্জস্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ, দেবী চৌধুরাণীতে বঙ্কিম বলিতেছেন, 'সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ, অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা।' আবার এই কর্মফল সমর্থন করিয়া বঙ্কিম তাঁহার কৃষ্ণকান্তের উইলে, রোহিণী ও ভ্রমরের উক্তিতে পাপ, পুণ্য, প্রায়শ্চিত্ত ও কর্মফলের কথা বলিয়াছেন।

এই ব্যবহারিক দৃষ্টি বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য। ইহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসার আর একটি ক্ষেত্রে যেখানে তিনি বস্তুতান্ত্রিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিভেদ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য যেমন পরমার্থিক সত্য, প্রাতিভাসিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য বিশ্লেষণ করিয়া নূতন সমন্বয়ের পথ দেখাইয়াছিলেন, বঙ্কিমও তেমনি একটি নূতন দৃষ্টির ও নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছেন। বিজাতীয় সমালোচকগণ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বকে, জগতকে উপেক্ষা করিবার দোষে দোষী করিয়াছেন। এরূপ সমালোচনা করা হইয়াছে যে ভারতীয় দর্শনের মায়াবাদ ভারতবাসীকে জগতের প্রতি উদাসীন করিয়াছে এবং জাগতিক উন্নতির প্রতি নিশ্চেষ্ট করিয়াছে। কৃষ্ণ চরিত্রে বঙ্কিম এই যুক্তি খন্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহা আমাদের আদর্শ নহে।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গই হিন্দুধর্মের আদর্শ। বঙ্কিম গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে জগতকে উপেক্ষা করা হিন্দুধর্মের বাণী নহে, এবং বেদ, বেদান্তর মায়াবাদ ভুল করিয়া বোঝান হইয়াছে। বেদ বলিয়াছেন, 'যদ বাহ্যং তদন্তরং'—বাহির ভিতর আলাদা নহে। বস্তু ও অবস্তু প্রকৃতদৃষ্টিতে ভিন্ন নহে। সুতরাং বস্তু-তান্ত্রিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় কোন মৌলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসায় ইহা একটি বিশিষ্ট অবদান এবং আগামী যুগে ধর্ম ও বিজ্ঞান লইয়া যে সংঘর্ষ আসিবে ইহাতে তাহার সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। ইহার আরও সুন্দর ভাষ্য ও উদাহরণ পাওয়া যায় 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দের প্রতি চিকিৎসকের উক্তিতে যেখানে বঙ্কিম বলিতেছেন :

সত্যানন্দ কাতর হইও না। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে। সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম। তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক—কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে, অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে। কাজে কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে, আগে বহির্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই,—শিখায় এমন লোক নাই। আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে।......ইংরাজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিতর্ত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তর্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না।

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসায় জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের বাধক না হইয়া সাধক ও প্রতিপাদক হইয়াছে।

অতি অল্পকথায় এবং সহজ সরল ভাষায় বঙ্কিম ধর্মের মূলতত্ত্ব এই ক্ষেত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ভিতর তাঁহার স্বতন্ত্র ধর্মদৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথম, বঙ্কিম যথার্থ সনাতন ধর্মাবলম্বী। কিন্তু সেই সনাতন ধর্ম কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-বিড়ম্বিত গোঁড়ামীর ধর্ম নহে। বঙ্কিমের সনাতন ধর্ম, অসাম্প্রদায়িক, সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন মানবধর্ম।

দ্বিতীয় জড় বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য ব্যবহারিক কৌশল সম্বন্ধে তাঁহার সহৃদয় উদারতা এবং তাহা যে সনাতন ধর্মের পরিপন্থী নহে, বরং সহায়ক ও পোষক তাহা প্রমাণ করা। সেই বাণীই পরে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম লইয়া যে নানাবিধ অন্ধ কুসংস্কার তাহার প্রকৃত সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন এই ভাষায়—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ। জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্মবিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্মবিহিত করিয়াছেন, আর সকলকে ধর্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম কি হিন্দুর জন্যই, ম্লেচ্ছ কি তাঁহার সন্তান নহে?

ইহাই বঙ্কিমের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মহামন্ত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর সনাতন ধর্ম বিশ্বাসপন্থীদের সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বাণীর বঙ্কিমই প্রথম উদ্গাতা।

যখন ধর্ম সমন্বয় ও ধর্মভাবে উদারতা সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে, তখন এই বিষয়ে আর এক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক তো হইবেই না পরন্তু প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মুসলমান ধর্মের প্রতি বঙ্কিমের উদারতার অভাব এই অভিযোগ কতিপয় সমালোচক করিয়াছেন। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক ও ভিত্তিহীন। তাহার প্রমাণ শুধু বঙ্কিমের বর্ণাশ্রমের উপরোদ্ধৃত উক্তি নহে। তাহার অন্য প্রমাণ এই স্থলে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিব। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বঙ্কিম এই বিষয়ে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজসিংহ উপন্যাস হইতে উদাহরণ দিতেছি এই কারণে যে তাহাই বঙ্কিমের প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজসিংহে বঙ্কিম বলিতেছেন :

হিন্দু হইলেই ভাল হয় না। মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না। অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়েই তুল্যরূপে আছে এবং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল তখন রাজকীয় গুণে সমসাময়িক হিন্দুদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহা সত্য নহে যে মুসলমান রাজাগণ হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক গুণের সহিত যাহার

ধর্ম আছে, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিলেও যাহার ধর্ম নাই, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সে নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাহার সময় হইতে মোগলরাজ্যের অধঃপতন সম্ভব হইল। রাজসিংহ ধার্মিক এইজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়াও মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিয়াছিলেন।

এই উক্তি হইতে বঙ্কিমের হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতা প্রমাণিত হয়। ধর্মজিজ্ঞাসায় এই উদারতার পথপ্রদর্শক বঙ্কিম। সংকীর্ণতা তো দূরের কথা, এই সমন্বয়ী ও উদার দৃষ্টি তখনকার যুগে বিরল এবং প্রায় অসম্ভব ছিল। তিনি সেই যুগে ধর্ম সমন্বয়ের নূতন যুগ ও ভিত্তি স্থাপনা করিতেছিলেন। এই হিন্দু-মুসলমান ধর্মে সমদৃষ্টি ব্যক্ত করিয়া বঙ্কিম অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছেন—'পলাশীক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সেনার কাপুরুষতার অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা।' ইহা উল্লেখযোগ্য যে বঙ্কিম উপন্যাসে বহু আদর্শ চরিত্র মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা চরিত্র সৃজনে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন মুসলমান রমণীর গরীয়সী মহিমা। চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম আদর্শ পতিব্রতা রমণী। রাজসিংহে সম্রাটকন্যা জেবুন্নিসার চরিত্র ও স্বার্থত্যাগ সাহিত্যজগতে অতুলনীয়। মোবারক ও দরিয়ার চরিত্রের আদর্শনিষ্ঠা মহিমান্বিত। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমের সৃষ্ট চাঁদশা ফকিরের চরিত্র, যাহাতে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতার জীবন্ত বিগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বর্তমান যুগে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা লইয়া নানা কূট-তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। বহুদিন পূর্বে বঙ্কিম কোন ধারায় এই বিষয় লইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন তাহা দেখা যায় বঙ্কিম বর্ণিত সীতারাম ও চাঁদশা ফকিরের কথোপকথনে। সেই বাক্যবিনিময়ে আছে বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা ও তাহার চূড়ান্ত উত্তর।

সীতারাম লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরদ্বারে দেখিলেন এক মুসলমান ফকির বসিয়া আছেন। তখন নিম্নোক্ত বাক্যবিনিময় হইল যাহা সীতারামের প্রথম সংস্করণে ১০৫-৯ পৃষ্ঠায় আছে এবং যাহার অপূর্ব কথাগুলি এইরূপ :

সীতারাম : ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর মুসলমান।

ফকির : দোষ কি বাবা। ঠাকুর কি তাতে অপবিত্র হইলেন?

সীতারাম : হইলেন বৈকি। তোমার যেমন দুর্বুদ্ধি।

ফকির : তোমাদের এ ঠাকুর, কি ঠাকুর? ইনি করেন কি?

সীতারাম : ইনি নারায়ণ, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় কর্তা।

ফকির : তোমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে।

সীতারাম : ইনিই।

ফকির : আমাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে?

সীতারাম : ইনিই, যিনি জগদীশ্বর তিনি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

ফকির : মুসলমানকে সৃষ্টি করিয়া ইনি অপবিত্র হন নাই। কেবল মুসলমান ইঁহার মন্দির দ্বারে বসিলেই ইনি অপবিত্র হইলেন? এই বুদ্ধিতে, বাবা, তুমি হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছ? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ইনি থাকেন কোথা? শুধু এই মন্দিরের ভিতর থাকিয়াই কি ইনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন? না আর থাকিবার স্থান আছে?

সীতারাম : ইনি সর্বব্যাপী, সর্বঘটে, সর্বভূতে আছেন।

ফকির : তবে তিনি আমাতে আছেন। বাবা, তিনি আমাতে অহরহ আছেন, তাহাতে তিনি অপবিত্র হইলেন না। আমি উহার মন্দির দ্বারে বসিলাম, ইহাতে তিনি অপবিত্র হইলেন?

আমার জানা নাই, জগতের কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এইরূপ সহজ, সরল ও অকাট্য যুক্তির দ্বারা সকল ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টির বাণী প্রকাশ করিয়াছেন কিনা। জগতের কোন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে সকল ধর্মের প্রতি এই উদারতা কোন চরিত্রে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে সীতারাম শুধু পরাস্ত হইলেন না তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার ধর্ম অনুভূতিতে ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা ছিল। মুসলমান চাঁদশা ফকির যথার্থ ধর্মোপদেষ্টা হইয়া হিন্দুরাজা সীতা-রামকে এই মর্মে শিক্ষা দিতেছেন :

ফকির : সেই একজনই হিন্দুমুসলমানকে সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয়ই তাঁহার সন্তান। উভয়ই তোমার প্রজা হইবে। দেশাচারের বশীভূত হইয়া প্রভেদ করিও না। প্রজায় প্রজায় প্রভেদ পাপ। পাপের রাজ্য থাকে না।

সীতারাম : মুসলমান রাজা প্রভেদ করিতেছে নাকি?

ফকির : করিতেছে। তাই মুসলমানরাজ্য ছারখারে যাইতেছে। সেই পাপে মুসলমান রাজ্য যাইবে, তুমি রাজ্য লইতে পার ভাল,নাহিলে অন্যে লইবে। আর তুমি যখন বলিতেছ, ঈশ্বর হিন্দুতেও আছেন, মুসলমানেও আছেন, তখন তুমি কেন প্রভেদ করিবে? আমি মুসলমান হইয়াও হিন্দু

> মুসলমানে কোন প্রভেদ দেখি না। এক্ষণে তোমরা দেবতার পূজা কর, আমি অন্যত্র যাইতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে বল, যাইবার সময় আবার আসিয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া যাইব।

বিদায়কালে সীতারাম বলিলেন—'আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা ন্যায়-সঙ্গত। আমি তাহা সাধ্য অনুসারে পালন করিব। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আমার নূতন রাজধানীতে আপনি বাস করেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি আমার নিকট থাকিলে রাজ্যের বিশেষ মঙ্গল হইবে এবং যদি কখনও আমি আপনার উপদেশের বিপরীতাচরণ করি, তাহা হইলে আপনি তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন।' তখন ফকির বলিলেন :

ফকির : তুমি একটি কথা আমার নিকট স্বীকৃত হইলে, আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি। তুমি রাজধানীর কি নাম দিবে।

সীতারাম : শ্যামাপুর নাম আছে, সেই নামই থাকিবে।

ফকির : যদি উহার 'মহম্মদপুর' নাম দিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমার কথায় স্বীকৃত হইতে পারি।

সীতারাম : এ নাম কেন?

ফকির : তাহা হইলে আমি খাতির-জমা থাকিব যে তুমি হিন্দুমুসলমানে সমান দেখিবে।

সীতারাম কিয়ৎকালের জন্য নীরব রহিলেন এবং তাহার পর স্বীকৃত হইলেন। ফকির তখন বলিলেন :

> আমি থাকিব, কোন গৃহে বাস করিব না। কিন্তু তোমার নিকটেই থাকিব। যখন যেখানে থাকি তোমাকে জানাইব। তুমি খুঁজিলেই আমাকে পাইবে।

গমনকালে ফকির সীতারামকে এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন, 'তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হউক।'

বর্তমান যুগে স্বাধীন ভারতবর্ষ যে আদর্শ রাষ্ট্রতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্রসাধন করিতেছে তাহার প্রথম প্রবর্তক বঙ্কিম। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও প্রীতি এবং তাহাকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রগঠনের আদর্শ সমগ্র

ভারতবর্ষে বঙ্কিম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বে কোন ভারতীয় রাষ্ট্র-নেতা বা সাহিত্যিক বঙ্কিমের ন্যায় সমদর্শী ছিলেন না। হিন্দুর প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব বা মুসলমানের তোষামোদ কোনটাই বঙ্কিমের ধর্ম নহে। ১২৮৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম লিখিতেছেন :

বাংলা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক, পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাংলার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাংলা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাংলা লিখিবেন না বা বাংলা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফার্সীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কারণ জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।

ইহাই হইল বঙ্কিমের বলিষ্ঠ ধর্মনীতি এবং তাঁহার হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সমন্বয়ের মহামন্ত্র। ইহাতে দুর্বলতা নাই, কাতরতা নাই, খোসামুদী নাই, কিন্তু আছে বিপুল উদারতা। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, বঙ্কিমের কষ্ঠিপাথর হইল যে সে বাংলার কল্যাণ-কামী কি না। মুসলমানকে তিনি হিন্দু হইতে বলেন নাই, তাহাকে বাঙ্গালী হইতে বলিয়াছেন। বঙ্কিম জাতি বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন মুসলমান হিন্দুর সহিত সেই এক জাতির অন্তর্গত। সেই কারণেই তিনি তাঁহার উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তাহাদের উচ্চতম ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের বাহন করিয়াছিলেন।

বঙ্কিম ধর্মজিজ্ঞাসার মূল কথা আলোচিত হইয়াছে বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্বে ও চিত্তশুদ্ধির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে। তাহার মূলকথা হইল মানবধর্ম ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ধর্মতত্ত্বে গুরুশিষ্য সংবাদে বঙ্কিমের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকৃত ধর্ম কি এবং তাহার বিশ্লেষণ। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন—

কিন্তু 'রিলিজন্'-এর ভিতর এমন কি নিত্যবস্তু কিছু নাই, যাহা সকল 'রিলিজনে' পাওয়া যায়। গুরু উত্তর দিলেন—আছে কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে 'রিলিজন্' বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহাকে ধর্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ নাই। তখন প্রশ্ন হইল—'মনুষ্যের ধর্ম কি?' প্রশ্নোত্তর এই ভাবে চলিল :

গুরু : যাহা থাকিলে মানুষ মানুষ হয়, না থাকিলে মানুষ মানুষ নয়, তাহাই মানুষের ধর্ম।

শিষ্য : তাহার নাম কি?

গুরু : মনুষ্যত্ব।

ইহার বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্কিম তাঁহার অণুশীলনে ও ধর্মতত্ত্বে বলিয়াছেন—'আমি ধর্মতত্ত্বে বলিয়াছি যে মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিক, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিনী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।' এই মনুষ্যত্ব বঙ্কিমের ধর্মনীতি। সকল ধর্মের সার হইল এই কৃষ্টি সাধন। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন দ্বারা প্রকাশ এবং তাহাদের অবস্থানুযায়ী প্রয়োগ ইহাই প্রকৃত ধর্ম। এই অনুশীলন বঙ্কিমের মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ ও প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব। ইহাই বিশ্বজনীন মানবধর্ম এবং বঙ্কিমের নববেদান্ত। ইহাতে জগতকে মায়া বলিয়া উপেক্ষা নাই, আবার তাহাকে আত্যন্তিক সত্য বলিয়াও মোহ নাই।

এই নববেদান্ত বঙ্কিমের মূল ধর্মতত্ত্ব। ইহা বহুভাবে তিনি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহার ভিতর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমের গভীর সুচিন্তিত মতামত আছে। এই বিষয়ে তাঁহার কতিপয় বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। ১২৯১ বঙ্গাব্দের ১৫ই শ্রাবণ তারিখের 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিম 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং সেখানে এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনায় বঙ্কিমের তিনটি সিদ্ধান্ত আছে :

প্রথম : 'হিন্দুধর্ম কি আচারে নিহিত? হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না। টিকটিকি ডাকিলে সত্য সত্য বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়। এসকল কি হিন্দু ধর্ম, না মূর্খের আচার? সত্য বটে হিন্দুর নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে, যেমন একাদশীর ব্রত স্বাস্থ্য রক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরীর রক্ষার ব্রতই কি হিন্দুধর্ম?'

ইহাতে বঙ্কিম বলিতেছেন যে আচার ও ধর্মে সম্বন্ধ থকিতে পারে, কিন্তু যখন আচার প্রাণহীন তখন তাহার সহিত ধর্মের সংশ্রব থাকে না, তাহা কুসংস্কারে পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয়: 'যখন ধর্মশূন্যে সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, আর যদি হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি অন্য কোন ধর্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দুসমাজের আর কি গতি আছে।'

উপরোক্ত প্রশ্নের দ্বারা বঙ্কিম এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, হিন্দু-ধর্ম সংস্কার ও সংরক্ষণ ইহাই ধর্মনীতি ও কর্তব্য। যাহা আবর্জনা তাহা দূর করিতে হইবে। যাহা শাশ্বত সারাংশ তাহা কায়মনোবাক্যে পালন ও রক্ষা করিতে হইবে। সুতরাং তিনি এই স্থলে আবার বলিতেছেন :

যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম নহে, যাহা কেবল কলুষিত অপবিত্র দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম বলিয়া হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভন্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থ সাধনার্থ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্বোধ কর্তৃক হিন্দুধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল ভ্রান্ত ও মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস বা কল্পিত ইতিহাস,—কেবল ধর্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে,—সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

তৃতীয়: 'যাহাতে মনুষ্যের উন্নতি, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও সর্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, অন্য ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মেই প্রবল। হিন্দুধর্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্মে যেরূপ আছে এইরূপ আর কোন ধর্মে নাই। সেইটুকু সারভাগ। সেইটুকু হিন্দুধর্ম, সেইটুকু ছাড়া, আর যাহা থাকে, শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক তাহা অধর্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবুও অসত্য অধর্ম বলিয়া পরিহার্য।

আধুনিক যুগে এই বলিষ্ঠ ধর্মতত্ত্বের প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র। ইহা যেমন যুক্তিসংগত, তেমনি নির্ভীক, কঠোর ও তেজস্বিতাপূর্ণ। ইহাতে অন্ধবিশ্বাস নাই, আছে যুক্তি-সমন্বিত দৃষ্টিভংগী যাহার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এই নব-বেদান্তের বৈশিষ্ট্য।

এই তিনটি সিদ্ধান্ত দেখাইয়াই বঙ্কিম ক্ষান্ত হন নাই। হিন্দুধর্মের যাহা সারমর্ম তাহাও সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রে, ধর্মসাহিত্যে, প্রবন্ধে, কৃষ্ণচরিত্রে, গীতার ব্যাখ্যায় অনুশীলন তত্ত্বে হিন্দুধর্মের অন্তরের কথা বলিয়াছেন। বঙ্কিমের এই সকল লেখা পর্যালোচনা করিলে কয়েকটি বিশিষ্ট ভাবধারা সুস্পষ্ট হয়। ইহার সম্যক সঙ্কলন আজিও হয় নাই। তবে যতদূর বঙ্কিম-সাহিত্য দেখিবার সুযোগ

হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি এই স্থলে এইভাবে লিপিবন্ধ করা যাইতে পারে :

প্রথম : যাহা সত্য তাহা ধর্ম। বঙ্কিম ১২৯২ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় 'প্রচার' পত্রিকায় 'সাহিত্য ও ধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় : চিত্তশুদ্ধি বঙ্কিমের মতে শুধু ধর্মের অংগ নহে, তাহাই ধর্ম। এই চিত্তশুদ্ধির উপর বঙ্কিম বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহার 'চিত্তশুদ্ধি' নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে, যাহা হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিলাম—'যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি কোন ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ধার্মিক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি নাই তিনি হিন্দু নহেন। ইন্দ্রিয় সংযম চিত্তশুদ্ধির প্রধান লক্ষ্মণ। কার্যক্ষেত্রেই, সংসারধর্মেই ইন্দ্রিয়-সংযম লাভ করা যায়; যোগে বা তপস্যায় পাওয়া যায় না। বিশ্বামিত্র বা পরাশর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারেন নাই। ভীষ্ম বা লক্ষ্মণ পারিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের এই একটি নিগূঢ় কথা কহিলাম। এই লক্ষ্মণেই শান্তি। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। আপনি যেমন, পর তেমন—এই ভাবই পরার্থপরতা। সংসার পরিত্যাগ করিলেই, কৌপীন ধারণ করিলেই, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া হরিনাম করিলেই চিত্ত-শুদ্ধি হয় না। ভগবৎ-পাদপদ্মে গাঢ়ভক্তি চিত্তশুদ্ধির আর একটি প্রধান লক্ষণ। এই ভক্তিই চিত্তশুদ্ধির মূল ও ধর্মের মূল।'

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসায় ইহাই অনুশীলন। এই অনুশীলনই বঙ্কিমের ধর্ম এবং ইহাই বঙ্কিমের সিদ্ধান্তে মানবধর্ম। ইহাই বঙ্কিমের সনাতন ধর্ম যাহা যুগে যুগে সত্য ও অভ্রান্ত।

বঙ্কিম ধর্মসাহিত্যে দেখাইয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে সমস্ত বৃত্তিই সম্যক অনুশীলিত হইয়াছে এবং পূর্ণভাবে। যদিও বঙ্কিম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন তথাপি তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' সেই বিশ্বাস ও দৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের মানবচরিত্র উদ্ঘাটিত করাই বঙ্কিমের অনুশীলন-তত্ত্ব ও ধর্মজিজ্ঞাসার মূল উদ্দেশ্য। এক কথায় 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমের জীবন-

দর্শন কি তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিমের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ। যেভাবে ধর্মে ও দর্শনে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে, সেভাবে নহে, কিন্তু জীবনের কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব। দেবীচৌধুরাণীতে বঙ্কিম বলিয়াছেন—'ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।' বঙ্কিম দেখাইয়াছেন, পরাক্রমে, পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে ও বিনয়ে, শ্রী, ধৈর্যে ও সন্তোষে, শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। তিনি আচারে দক্ষ, কৌশলে অপরাজেয়, কর্মে, জ্ঞানে ও ভঙ্গিতে অনিন্দ্যনীয়। তিনি সন্ন্যাসে যথার্থ সন্ন্যাসী, গৃহে যথার্থ গৃহস্থ, রণক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধে তিনি যথার্থ যোদ্ধা ও সারথী, পরামর্শে যথার্থ পরামর্শ-দাতা, মন্ত্রণায় যথার্থ মন্ত্রী, রাজধর্মে আদর্শ রাজা। তিনি যোগে যোগী, কর্মে কর্মী, জ্ঞানে জ্ঞানী, ভক্তিতে ভক্ত, প্রেমে প্রেমাস্পদ ও প্রেমিক। সুতরাং বঙ্কিমের ধর্মে শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানব।

যখন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন সেই গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিম স্বয়ং লিখিয়াছেন :

> সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্মবিষয়ক। দ্বিতীয়টি দেবতাবিষয়ক। তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র।

অনুশীলন ও কৃষ্ণচরিত্র আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে এই স্থলে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। বঙ্কিম লিখিয়াছেন যে অগাধ হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্রে দেবতত্ত্ব একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। বেদ হিন্দু-শাস্ত্রের শিরোভাগ ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের মূল। বেদ সকল শাস্ত্রের আকর। বেদ ও বৈদিক ধর্মসম্বন্ধে বঙ্কিমের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল। প্রথম তাঁহার মতে বেদের চতুর্ভাগ, ঋক, যজু, সাম ও অথর্ব মন্ত্রভেদে হইয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্র—যথা, ইন্দ্রস্তোত্র, বরুণস্তোত্র ইত্যাদি। যর্জুবেদের মন্ত্র গদ্যে বিবৃত এবং তাহার উদ্দেশ্য যজ্ঞানুষ্ঠান। সামবেদের মন্ত্র গান। ঋগ্বেদের মন্ত্রও গীত হয় এবং যখন গীত হয় তখন তাহাকেও সামবেদ বলে। অন্য বেদ অপেক্ষা সামবেদেরই উৎকর্ষ এবং গীতায় বলা হইয়াছে 'বেদানাং সামবেদোস্মি'। বঙ্কিমের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে বেদের দেবতাদি যথা অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতিকে পাশ্চাত্যবাসীরা

ভুল করিয়া ভাবিয়াছিল যে তাহারা হিন্দুদের জড়োপসনার প্রতীক। এই সকল দেবতারা বঙ্কিমের মত জড় নহে, এক এক চেতনার স্ফূর্ত্তি এবং তাঁহারা সকলেই চৈতন্যময় ও চেতনাযুক্ত। বঙ্কিমের তৃতীয় মন্তব্য বেদের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে। বঙ্কিম এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বৈদিক মতে তত্ত্বজ্ঞান ত্রিবিধ, দেবতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব। বঙ্কিম বেদ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে বৈদিক দেবতত্ত্ব যথার্থভাবে বুঝিলে, ইহাই দেখা যায় যে হিন্দু একেশ্বরবাদী। বঙ্কিমের মতে বৈদিক ধর্মের প্রথম সোপান হইল চৈতন্য হইতে যে শরীর পৃথক তাহার বোধ। ইহার দ্বিতীয় সোপান হইল, জড়ে চৈতন্যের আরোপ। ইহার তৃতীয় সোপান হইল, এই চৈতন্যবিশিষ্ট বিভিন্ন শক্তি অগ্নি, বরুণ, সবিতা প্রভৃতিকে তুষ্ট করিয়া উপাসনা। ইহা আবার অনন্তশক্তিময় একেশ্বরের মহিমা বুঝিবার সোপান। এই উপাসনাতত্ত্ব বুঝাইয়া বঙ্কিম দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ড শক্তির দ্বারা পরিচালিত এবং সেই কারণে সকল দেবতাই সেই শক্তির আধার বলিয়া, তাহারাও নিয়মাধীন। এই নিয়মই নিয়তি যাহা সকলকে শাসন করিতেছে। সকলেই সেই নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই সেই নিয়মকে অতিক্রম করিতে পারে না। তবে ইহাদেরও কর্তা, শাসক, নিয়ামক, ও কারণস্বরূপ আর একজন আছেন, তিনিই বঙ্কিমের ঈশ্বর বা ধর্মের পরমেশ্বর। ইহাই বঙ্কিমের বৈদিক একেশ্বর-বাদীতার যুক্তি ও প্রমাণ। তবে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও জাতি মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। ইহাই লৌকিক হিন্দুধর্ম কারণ বিভিন্ন মানুষ লইয়া জাতি ও সমাজ এবং তাহাতে একই সময়ে বিভিন্ন স্তরভেদ থাকিবে। বঙ্কিমের চতুর্থ সিদ্ধান্ত এই যে বৈদিক ধর্মের চরম অবস্থা উপনিষদে। এইখানে আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্য ও ধ্যেয়। বৈদিক ধর্মের ইহা চতুর্থ ও শ্রেষ্ঠতম স্তর।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের শেষভাগে বঙ্কিম বৈদিক সাহিত্যের উপর ইংরাজীতে দুইটি ভাষণ দেন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে—(তখনকার নাম 'হাইয়ার ট্রেনিং একেডমী')। ইহাতে তিনি সুন্দর সরল ভাষায় বেদের মহিমার ও অমূল্য সম্পদের কথা বলিয়াছেন এবং এই বিষয়ে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেই ভাষণের উপসংহারে বঙ্কিম বলিয়াছেন :

I find myself lost in wonder and awe of the all enveloping

shadow that the lofty heights which the old vedic Rishis ascended, now cast upon our vaunted modern culture.

বঙ্কিম আরও বলিয়াছেন যে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান এবং সগুণ ব্রহ্মে ভক্তি হিন্দুধর্মকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। পুরাণাদি গীতা বা অন্যান্য ধর্মশাস্ত্র হিন্দুধর্মকে সর্বাঙ্গীন রূপ দিয়াছে। বঙ্কিমের ধর্মসাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার ব্যাপক ভূমিকা যাহার ভিতর আছে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ গীতা পুরাণাদি সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র।

ধর্ম লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক বঙ্কিমকে করিতে হইয়াছিল। সেই সকল তর্ক-সাহিত্য সমালোচনা করিলে বঙ্কিমের ধর্ম-জিজ্ঞাসার ও ধর্মদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের সহিত বঙ্কিমের তর্ক হয় তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, রেভারেণ্ড হেস্টি, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত শশধর তর্করত্ন, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোন শ্রাদ্ধসভায় গৃহবিগ্রহ দেখিয়া হিন্দুর শিব, কালী ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে হেষ্টি নানা রকমের কটূক্তি করেন, এবং হিন্দুধর্মের উপর ও তাহার পূজা-পদ্ধতির উপর বহু অপ্রিয় কথা বলেন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। ইহা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের কথা। বঙ্কিম 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাদানুবাদ করেন। এই মসী-যুদ্ধ বঙ্কিমের ধর্মসিজ্ঞাসার এক বিরাট অধ্যায়। ইহাতে তাঁহার তর্ক-যুক্তির তীক্ষ্ণতার, বিদ্যাবত্তার, জ্ঞানের ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই তর্ক তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। বঙ্কিমের এই প্রতিবাদ ও তর্ক দেশে আলোড়ন আনিয়াছিল এবং হিন্দুর চেতনা ও ধর্মবোধ সজাগ করিয়াছিল। এমন কি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় আন্দোলন আরম্ভ হইল যে ইংরাজ মিশনারী পরিচালিত কলেজ বর্জন করিতে হইবে। ছাত্র-সমাজে বিক্ষোভ ও উত্তেজনা এত বর্ধিত হইল, যে তাহারা ইংরাজ মিশনারী কলেজে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং হেষ্টি প্রহৃত হইলেন। সেই সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ হেষ্টি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিলেন—'যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

এই বাহ্যিক উত্তেজনা ও আন্দোলনের পশ্চাতে ছিল বঙ্কিমের কতিপয় সিদ্ধান্ত যাহাকে ধর্মব্যাখ্যা বলিয়া অভিহিত করা অসঙ্গত হইবে না। হেষ্টির সহিত বঙ্কিমের ধর্ম লইয়া যে তর্ক ও সমালোচনা হইয়াছিল তাহার স্থায়ী

তাৎপর্য এই যে ইহাতে বঙ্কিম যে ধর্মব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আজও অক্ষুণ্ণ। সুতরাং সেই তর্কযুদ্ধের বাদানুবাদ হইতে এইখানে বঙ্কিমের চারটি বিশিষ্ট ব্যাখ্যা বঙ্কিমের ভাষায় উদ্ধৃত করিব :—

প্রথম : 'প্রত্যেক বিশিষ্ট ধর্মের তিনটি অঙ্গ আছে। (১) মূলসূত্র বা ধর্মতত্ত্ব, (২) পূজাপদ্ধতি এবং (৩) তত্ত্বাবিম্বিত নীতিসূত্র। ইহার প্রথম অঙ্গের দুই ভাগ—প্রথম দর্শনাদি নিহিত নিয়মাদি, দ্বিতীয়, পুরাণ কাহিনী। দর্শনের তুলনায় পুরাণের মর্যাদা কম। দর্শনেই বর্তমান হিন্দুত্বের ভিত্তি প্রোথিত। বেদের পর দর্শনের উৎপত্তি এবং ষড়দর্শনই ভারতের প্রাচীন বেদোক্ত এবং পরবর্তী পুরাণোক্ত ধর্মাদির যোগ-সন্ধিস্থল। যদিচ প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলেন, কিন্তু সকল দর্শনের সিদ্ধান্ত প্রায় এক। তবে ভারতের ভাগ্য গঠনে যে দর্শনের প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী, তাহা কপিলের সাংখ্যদর্শন। কপিলই প্রথম, পুরুষ ও প্রকৃতির, জড় ও আত্মার পার্থক্য আবিষ্কার করেন। হিন্দুধর্মের যাঁহারা গঠনকর্তা এই প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বটি তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

দ্বিতীয় : 'হিন্দু উপাসনা পদ্ধতির কথা এখন বলা হউক। ইহার অনেক আচারই অর্থহীন মুখোস বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উহা মানিয়া চলেন না। মিশনারীগণ হিন্দুর পৌত্তলিক ধর্মকে হিন্দুধর্মের সর্বস্ব মনে করেন—ইহা তাহাদের বিষম ভ্রম। প্রতিমাপূজা হিন্দুধর্মের ক্ষুদ্র অংশমাত্র এবং উপাসনাপদ্ধতির ইহা নিম্নতর অঙ্গ। প্রতিমাপূজা ব্যতিরেকেও ঈশ্বরের পূজা সম্ভব। প্রতিমাপূজা ভিন্ন ঈশ্বরের পূজা হয় না এরূপ বিধি নিষেধ হিন্দুশাস্ত্রে নাই। স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু দেব-মন্দিরে প্রবেশ না করিয়াও গোঁড়া হিন্দু থাকিতে পারেন।

তৃতীয় : তবে কি প্রতিমা পূজার কোন সার্থকতা নাই? নিশ্চয়ই আছে। কেহ যেন মনে না করেন, পূজার জন্য দেবপ্রতিমা বালকের ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র।। মানুষ মনে যে আদর্শ পোষণ করে প্রতিমায় তাহারাই প্রতিরূপ দেখিতে পায়। কেহ যেন মনে না করেন যে প্রতিমাই ঈশ্বর। প্রত্যেক উপাসকই মূর্তিকে ভগবান হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখেন। প্রত্যক্ষ ও গোচরীভূত মূর্তির সহায়তায় অদৃশ্যমান ও অপ্রত্যক্ষ ভগবানকে আমরা ভক্তি-অর্ঘ্যপ্রদান করি'।

চতুর্থ : আমরা অবশেষে তৃতীয় অঙ্গ হিন্দুধর্মের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে আসিয়া উপস্থিত হই। অন্যান্য সুগঠিত ধর্মের নীতিতত্ত্বের ন্যায়, হিন্দুধর্মের নীতিসূত্রই সমাজের বা সমাজস্থ ব্যক্তিগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি চরিত্রনীতি এবং শাসনতন্ত্রেও ইহার অনুশাসন চলে। কোন জাতির, এমনকি খৃষ্টধর্মের ব্যক্তিগত চরিত্রনীতিও হিন্দুর চরিত্রনীতি অপেক্ষা

মহত্তর বা অধিকতর সুন্দর নহে। হিন্দু ক্ষাত্রশক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তি ও নৈতিক বলের উপর বেশী আস্থা স্থাপন করে। যুদ্ধ নহে, নৈতিক শক্তি ও প্রেম বিস্তার—ইহাই হিন্দুধর্ম।

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসায় এই চারিটি সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুধর্মের সমালোচকেরা সাধারণতঃ যেখানে ভুল করেন তাহা স্পষ্টভাবে বঙ্কিম দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম ভ্রান্তি হিন্দুধর্মের দর্শনের সহিত আচার অনুষ্ঠানের যে পার্থক্য তাহা লক্ষ্য না করা। তাই প্রথমে তিনি হিন্দুধর্মের দর্শনের উপর জোর দিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তিনি দেখাইয়াছেন আচার অনুষ্ঠানের যথার্থ স্থান। আচার অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য জীবনে সদভ্যাস সৃষ্টি করা এবং জীবনযাত্রায় তাহার গতিকে এমন এক সুঠামছন্দে লইয়া আসা যাহাতে সাধারণভাবে শারীরিক ও মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে। সেই স্বাচ্ছন্দ্য না থাকিলে কোন প্রকৃতধর্ম সাধন হইতে পারে না। তৃতীয় ব্যাখ্যায় বঙ্কিম হিন্দুধর্মের প্রতিমা উপাসনাতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। দেশী বিদেশী বহু সমালোচক এবিষয়ে অনেক সময়ে ধারণা করিয়াছেন যে হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতাই প্রধান ভিত্তি। ইহার চেয়ে বিরাট ভ্রান্তি কিছুই নাই। যে হিন্দুর বেদে ও উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্ব ও দর্শন চূড়ান্তভাবে বিকাশ লাভ করিল সেই হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিক বলা অজ্ঞতার ও সংকীর্ণতার পরিচায়ক। সেই কারণে যুক্তিসহকারে সরল ভাষায় বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে, প্রতিমা উপাসনার যুক্তি কি এবং তাহার প্রকৃত স্থান কোথায়। চতুর্থ সিদ্ধান্তে বঙ্কিম ধর্মের নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই নীতিই ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। এই চারিক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সমালোচনা অধিক হইত বলিয়া বঙ্কিম সরল যুক্তির সহিত তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন যাহাতে তাহা সকলের সহজবোধ্য হয়।

শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত বঙ্কিমের ধর্মমতের অনেক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও এক জায়গায় অনৈক্য হইয়াছিল। এই স্থলে ইহার উল্লেখ করিব। বঙ্কিম সনাতন ধর্মাবলম্বী হইয়াও তাহাকে যুগোপযোগী করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং এই ধর্মজিজ্ঞাসায় বঙ্কিম দেখাইয়াছেন যে সমাজের বর্তমান অবস্থায়, জাতিভেদ অনুসারে ভোজনাদি ব্যাপারে পার্থক্য, খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও সংসর্গ দোষ প্রয়োজনীয় হইলেও তাহা পালন না করিলে অধর্মাচরণের দোষ হয় না। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ও সদাচারের অনুমোদন করিতে গিয়া চূড়ামনি মহাশয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহায়তা গ্রহণ করেন এবং মালা, তিলক ও শিখা

যে বিজ্ঞান সম্মত তাহার যুক্তিও তিনি দেন। বঙ্কিম ইহার সমালোচনা করিয়া বলেন যে যুক্তি বিজ্ঞানসম্মত হইলেও বর্তমান সমাজে এই কঠোরতা চলিবে না। 'প্রচারে' এই মতদ্বৈধ প্রকাশিত হয়। এই তর্কযুদ্ধে বঙ্কিম প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আচারভ্রষ্ট হইলেও ধর্মভ্রষ্ট হয় না।' সেই যুক্তি অনুসারে বঙ্কিম বলিয়াছিলেন :

'সমুদ্রযাত্রায় হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না।' এই মর্মে তিনি শোভাবাজারের কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব মহাশয়কে তাঁহার লিখিত অভিমত দেন এবং বলেন যে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-শাস্ত্র কোথাও বলে নাই যে সমুদ্রযাত্রা করিলে হিন্দু আর হিন্দু থাকিবে না। ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে শ্রাবণের কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'র সংখ্যায়।

ইহা ব্যতীত আর একটি তর্কযুদ্ধের কথা এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'নবজীবনে' হিন্দুধর্ম সংস্কার লইয়া যে নূতন উদ্যম দেখা যায় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মধর্মের পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী'র সহিত এই তর্কযুদ্ধ হয়। 'নবজীবন' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে। ১২৯১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বলা হয় যে বঙ্কিম নিরীশ্বরবাদী এবং ইহার লেখক ছিলেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুও বঙ্কিমকে নাস্তিক বলেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে 'হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মধর্ম বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। ইহার পর আবার নূতন হিন্দুধর্ম সংস্কারের উদ্যম 'নবজীবন' ও 'প্রচারের' ধৃষ্টতার পরিচয় বটে'। এই স্ফুলিঙ্গ পরে আরও বৃহদাকার এক বিরাট তর্কযুদ্ধে দাঁড়াইয়া যায়। পত্রিকা-মাধ্যমে যখন এই বিতর্ক চলিতেছে তখন রবীন্দ্রনাথও ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের 'ভারতী' সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন। সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দেশের সমস্ত পাঠক তাহা নীরব নিস্তব্ধে শ্রবণ করিয়াছে। সাকার নিরাকার উপাসনা ভেদ লইয়া সকলে কোলাহল করিতেছেন। কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই

আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের 'মুখ্য' লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?

তিনি যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতে কৃষ্ণের উক্তি স্মরণপূর্বক বলা যায়—যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ মিথ্যাই যেখানে সত্য, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন কিন্তু কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।

বঙ্কিম তত্ত্ববোধিনীর তর্কে প্রথমে নীরব ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উক্তির তীব্রতা ও তীক্ষ্ণতা দেখিয়া তিনি আর নীরব রহিলেন না কারণ বঙ্কিম বলিলেন—'এই আক্রমণ সম্প্রদায় ঘটিত, ঠিক ব্যক্তিগত নহে'। বঙ্কিম অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন :

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্রনাথ যখন ক, খ, শেখেন নাই, তাহারও পূর্বে হইতে এইরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখনও উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত লেখক, মহৎস্বভাব এবং আমার প্রীতি, যত্ন ও প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুএকটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য। তবে রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। উহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথকে সতর্কবাণী দিয়া, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের যুক্তিকে এই ভাষায় খণ্ডন করেন :

আমি দুইটি পরিচিত হিন্দুর দোষগুণ বর্ণনা করিয়াছি। তারপর মিথ্যা কি সত্য হয় না? এইরূপ কৃষ্ণোক্তি কি নাই? কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির পলায়ন করিয়া শিবিরে শুইয়া আছেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর। এমন সময়ে অর্জুন আসিতে তিনি ভাবিলেন, অর্জুন কর্ণ বধ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন শুনিলেন তাহা হয় নাই তখন তিনি অর্জুনের গাণ্ডীবের নিন্দা করিলেন। অর্জুনের এক প্রতিজ্ঞা ছিল,

যে তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন। ইহাতে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা বা সত্য রক্ষণীয় নহে।

রবীন্দ্রবাবু সত্য এবং মিথ্যা এই দুইটি শব্দ ইংরাজী অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সত্য Truth, মিথ্যা Falsehood আমি ব্যবহার করিয়াছি প্রাচীন কাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সেই দেশী অর্থে সত্য Truth ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা ইহাও সত্য। সত্যরক্ষার্থে নিরপরাধী জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে বধ করা কি অর্জুনের উচিত ছিল। যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে হত্যা, দস্যুতা, পরদারগমন, পরপীড়ন সকলই সম্পাদন করিব—এইরূপ সত্য জিনিষটা কি রক্ষা করা উচিত? এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম, মিথ্যাই সত্য।

রবীন্দ্রবাবুকে আর একটি কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই। কিন্তু সত্যের ভানের প্রতি আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মতন মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এই জিনিষ এই দেশে বড় ছিল না। এখন ইংরাজীর সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানী হইয়াছে। মৌখিক Lie direct সম্বন্ধে তাহাদের যত আপত্তি, কার্যতঃ সমুদ্র প্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে এমন কথা বলিব না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জনা করিবেন। তাহার কাছে অনেক ভরসা করি, এইজন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাংলার উজ্জ্বল রত্ন। আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবি হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।

এই তর্ক দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে বঙ্কিমের সহিত ইহা লইয়া রবীন্দ্রনাথের কোন স্থায়ী বিরোধ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে ইহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন :

সেই লড়াইয়ের উত্তেজনায় বঙ্কিমবাবুর সহিত আমার একটা বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল। তখনকার 'ভারতী' ও 'প্রচার'তে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে। যদি থাকিত পাঠকেরা দেখিতে পারিতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত সেই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলাইয়াছিলেন।

এই তর্ক-বিতর্কে বঙ্কিমের সহিত রবীন্দ্রনাথের কোন ব্যক্তিগত বিরোধ হয় নাই। কিন্তু বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসায় বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্ক তাৎপর্যপূর্ণ। সেই তাৎপর্য কোথায় তাহা জানা প্রয়োজন। সে তাৎপর্য এই : বঙ্কিমের সিদ্ধান্তে ধর্মই সত্য এবং সত্যই ধর্ম। কিন্তু যদি সত্য ও ধর্মের কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ, মানুষের মনোবৃত্তির বা বুদ্ধিবৃত্তির জন্য ঘটে, তাহা হইলে বঙ্কিমের মতে ধর্মই রক্ষণীয়, ভুল বোঝা সত্য রক্ষণীয় নহে।

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসায় ইহা বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন যে একদিকে তিনি যেমন গোঁড়ামী ও যুক্তিহীন ও প্রাণহীন ধর্মাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন অন্যদিকে তেমনি সংস্কারকের আতিশয্য দমন করিয়াছিলেন। সেই কারণে দেখি তিনি যেমন সংস্কার বিরোধী প্রাচীনপন্থী গোঁড়া পণ্ডিত সমাজের বিরুদ্ধে গিয়া শশধর তর্কচূড়ামনির আচার ব্যাখ্যাকে প্রতিহত করিতেছেন, তেমনি সংস্কার পন্থীদের হিন্দুধর্মের মৌলিক সত্য সম্বন্ধেও বজ্রনির্ঘোষে সতর্ক ও সাবধান করিতেছেন। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের অনুপম ও সার্থক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বলিতে হয় বঙ্কিম ছিলেন যথার্থই সব্যসাচী।

গ্রন্থপঞ্জী

বর্তমান গ্রন্থে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে :

ক। **বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী ও রচনা।**

(১) বঙ্গদর্শন, (২) দুর্গেশনন্দিনী, (৩) রাজমোহনের স্ত্রী (ইংরাজী), (৪) কপালকুণ্ডলা, (৫) মৃণালিনী, (৬) বিষবৃক্ষ, (৭) ইন্দিরা, (৮) যুগলাঙ্গুরীয়, (৯) লোকরহস্য, (১০) চন্দ্রশেখর, (১১) রাধারাণী, (১২) কমলাকান্তের দপ্তর, (১৩) রজনী, (১৪) সাম্য, (১৫) আনন্দমঠ, (১৬) রাজসিংহ, (১৭) মুচীরাম গুড়ের জীবনচরিত, (১৮) দেবী চৌধুরানী, (১৯) কৃষ্ণচরিত্র, (২০) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (২১) ধর্মতত্ত্ব, (২২) অনুশীলন, (২৩) বিজ্ঞান রহস্য, (২৪) A popular literature for Bengal (Bengal Social Science Association 1870), (২৫) Buddhism and Sankhya Philosophy (Calcutta Review 1871), (২৬) Confessions of Young Bengal এবং Study of Hindu Philosophy (Mukherjee's Magazine 1872) ।

খ। **বঙ্কিম সম্পর্কীয় ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী।**

(১) কৃষ্ণকান্তের উইল—শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩৬১)
(২) বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স। ১৩৪৫)
(৩) বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করিম।
(৪) বঙ্কিম প্রতিভা—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত—বঙ্কিম শত বার্ষিকী মুদ্রণ।
(৫) বঙ্কিম সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৬) বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
(৭) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
(৮) বঙ্কিম বরণ—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। (বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৬)

(৯) আধুনিক বাংলা সাহিত্য—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
(১০) বঙ্কিম সাহিত্যের ধারা—শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম. এ. (দত্ত মুখাৰ্জী পাবলিসার্স, ১০, ডিক্সন্ লেন, কলিকাতা। ১৩৫০)
(১১) বঙ্কিম জীবনী—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩৮)
(১২) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত (১৯৬১)
(১৩) বঙ্কিম মানস—শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার
(১৪) বঙ্কিম প্রসঙ্গ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১৫) বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীমণি বাগচী
(১৬) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনী-কান্ত দাস—(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৪৯)
(১৭) অলৌকিক কাহিনী—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় (সাহিত্য সদন এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-১২। ১৩৬৮)
(১৮) ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য—শ্রীশশীভূষণ দাসগুপ্ত
(১৯) ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী (১৩৬১)
(২০) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসজনীকান্ত দাস (সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী, ১৩৫৩)
(২১) বাংলাদেশের ইতিহাস—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার। (১৩৫২)
(২২) ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যার বিকাশ—শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল। (কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস—১৯২৬)
(২৩) বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস—ডাঃ বিজিতকুমার দত্ত।
(২৪) বাংলা গদ্যের চারি যুগ—ডাঃ মনোমোহন ঘোষ।
(২৫) The Origin and Development of the Bengali Language—Dr. Suniti Kumar Chatterjee (1926).
(২৬) History of Bengali Literature—Ramesh Chandra Dutt.
(২৭) India's Past: a survey of her literatures, religions and antiquities—A. A. Macdonell, Oxford University Press, London.

(২৮) The Excavations at Pandu Raja's Dhibi by Paresh Chandra Dasgupta, M.A., Director of Archæology, West Bengal.
(২৯) জীবনস্মৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(৩০) রবীন্দ্র রচনাবলী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Mukharji : Bankim-Sahitya Samaj O Sadhana—Bengali

1967 Rs. 10.00